জুলফিকার
রচনাবলি
২৩

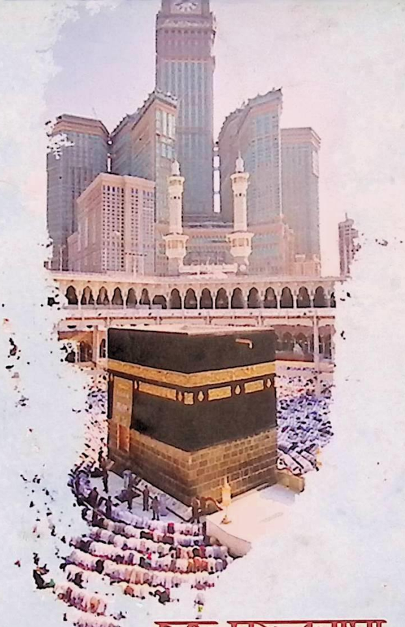

হজ সফরনামা

কাবার পথে

মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশ্‌বন্দি

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

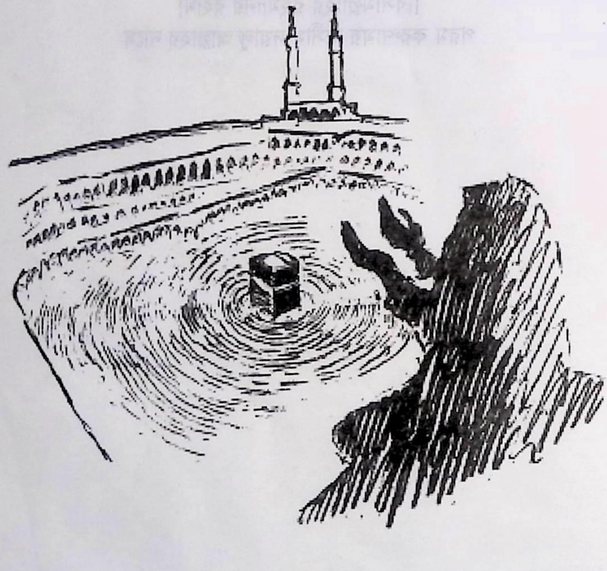

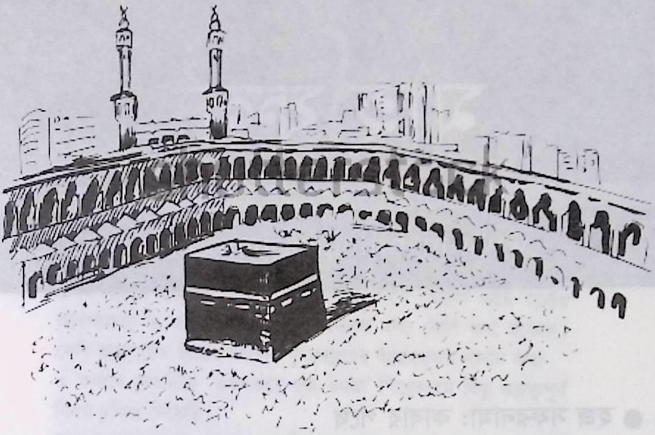

হজ সফরনামা

কাবার পথে

মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশাবন্দি

ভাষান্তর	আইয়ূব বিন মঈন
কাব্যানুবাদ	ইলিয়াছ জাবের
সম্পাদনা	ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার

মাহফিল

মাহফিল

লেখক সমাবেশ :: পাঠক সমাবেশ

www.mahfilprakashon.com

হজ সফরনামা: কাবার পথে

- লেখক :: মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশ্‌বন্দি
- গ্রন্থস্বত্ব :: ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার
- প্রকাশক :: শাকের হোসাইন শিবলি
- প্রথম প্রকাশ :: রবিউসসানি ১৪৩৯/জানুয়ারি ২০১৮
- প্রচ্ছদ, শব্দবিন্যাস ও অলঙ্করণ :: ক্রিয়েটিভিটি
- প্রকাশনায় :: মাহফিল
- মুদ্রণ :: শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা
- বিক্রয়কেন্দ্র :: বিশাল বুক কমপ্লেক্স [২য় তলা], ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
- যোগাযোগ :: [বিক্রয়] ০১৮৬৯৫১৪২২৩ [সম্পাদকীয়] ০১৮১৬৪২৮৭২৭
- দাম :: ৩৩০ [তিনশো ত্রিশ] টাকা মাত্র
- একমাত্র পরিবেশক সুবহে সাদিক দিলরুবা

mahfilprokashon@gmail.com/dilrubaprokashon@gmail.com/subhesadikprokashon@gmail.com

ঘরে বসে আমাদের বই পেতে চাইলে ভিজিট করুন

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com/mahfil prokashon
01912577988
www.kitabghor.com
01721999112

সংকলকের কথা

সালাহ উদ্দিন সাইফি নকশাবন্দি

'সুয়ে হরম' বইটি পির মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশাবন্দির বয়ান সংকলন। যেগুলো তিনি হজের সময়ে মক্কা-মদিনার নানান মজলিসে করেছেন।

একদিকে মক্কা-মদিনার পবিত্র মাটি, অন্যদিকে সেখানের অবারিত রহমতের ধারা। সব মিলিয়ে আলোচনার প্রভাব দ্বিগুণ করে দিয়েছে। এসব বয়ানে যেহেতু জায়গা ও সময়ের দিকে খেয়াল করে হজের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব বুঝাতে উৎসাহমূলক কথা বেশি বলা হয়েছে। বেশি আলোচিত হয়েছে আগের পুণ্যাত্মাদের আগ্রহমূলক নানান কথা।

এ কারণে শেষদিকে 'একনজরে হজ-ওমরা' শিরোনামে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছি।

কয়েক বছর ধরেই যেহেতু চলছিলো এসব বয়ান। তাই বয়ানগুলো আলাদা আলাদা শিরোনামের কয়েক খণ্ডের বই হয়ে যাবে। খুব শিগগিরই যাতে পরবর্তী খণ্ডগুলো পাঠকের হাতে আসে–পাঠকের কাছে দোয়া চাইছি। হজরত যাতে সুস্থ থাকেন। তাঁর কাজের ধারাবাহিকতা যাতে বজায় থাকে–সে দোয়াও চাইছি।

শেষ করার আগে বিশেষভাবে স্মরণ করছি রাইহান রাদাত ও ইউনুস সোলায়মানকে। আল্লাহ তাঁদের ভালো বদলা দিন। এছাড়াও যারা এ বইটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন, সবার মঙ্গল কামনা করছি। আল্লাহ সবাইকে ভালো বদলা দিন! আমিন!!

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ!
প্রিয়সুধী, 'কাবার পথে' নামের যে বইটি এখন আপনার হাতে, এটি জনাব জুলফিকার আহমাদ নকশাবন্দি সাহেবের 'সুয়েহরম' কিতাবের অনুবাদ।

এই পর্যায়ে এসে তাঁর ও তাঁর লেখা সম্পর্কে কিছু বলে পরিচয় করিয়ে দেয়ার চেষ্টা অনেকটা 'মায়ের কাছে মামা বাড়ির গল্প' বলার শামিল।
তবে মহান আল্লাহপাকের অশেষ কৃপায় দেড় দশক ধরে 'অনুবাদ প্রশিক্ষণের' সঙ্গে যুক্ত থাকা এবং এ নাগাদ তাঁর প্রায় কুড়িটি কিতাব অনুবাদ করতে পারার অভিজ্ঞতা থেকে আপাতত এতোটুকু বলতে পারি, তাঁর মতো একজন গ্রেট অল রাউন্ডার মনীষীর (লেখকের) লেখার প্রকৃত মর্ম তাঁর মতো করে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করার যোগ্যতা আমার নেই। তারপরও একটু বরকত নেয়ার সামান্য চেষ্টামাত্র।
প্রিয়সুধী, কিতাবটির (হাতে লেখা) অনুবাদের কাজ শেষ করেই প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দেয়ার পর তা আর দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ হয়নি। তাই এটি ছাপার হরফে কীভাবে এসেছে তা বলতে পারছি না। তবে প্রকাশকের ওপর আস্থা আছে, তিনি আপাতত চলনসই মানের করেই কেবল প্রকাশ করবেন।

আর হ্যাঁ, তার ভাষা ও বানানরীতির সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার দ্বিমত থাকতেই পারে।
সংশ্লিষ্ট সবার কল্যাণ কামনায়–
আবিম
১০/০১/১৭ ইং

চোখের পাতায় ভর দিয়ে আল্লাহর ঘরে হাজির! • ৪৯
হজরত রাবেয়া বসরিয়ার জবাব • ৪৯
এক শারীরিক প্রতিবন্ধীর প্রেমপূর্ণ হজ • ৫০
জীবনের দামি সময় • ৫২
আল্লাহর তাজাল্লির (জ্যোতির) তাওয়াফ • ৫৩
আমার পির সাহেবের কোরআন তেলাওয়াতের ধারা পদ্ধতি • ৫৪

কাবার পথে-৩

আল্লাহর ঘর!

ভালোবাসার দাবি • ৬০
যা লুকানো যায় না • ৬১
'কাবা' শব্দের ব্যাখ্যা • ৬২
একটি সূক্ষ্মবিষয় • ৬২
শাহিমহলের দাবি • ৬৩
জেদ্দা নগরী • ৬৮
মক্কা নগরী মর্যাদা লাভের কারণ • ৬৯
মহতের মহান দরবার • ৭১
কাবাশরিফ আর কালো রঙ • ৭১
হৃদয়ের আকাঙ্খা • ৭২
কাবা হৃদয়ের চুম্বক • ৭৩
দুঃখের কাহিনী কাকে শোনাবো? • ৭৪
চিন্তার বিষয় • ৭৫
সময় কীভাবে কাটাবো? • ৭৬
প্রতিজ্ঞায় অটল থাকুন • ৭৭
নবির তরেই কোরবান আমার প্রাণ • ৭৯

কাবার পথে-৪

কাবার গেলাফ আর হাজরে আসওয়াদ

এবাদতের প্রথম ঘর • ৮১
কাবাশরিফের গেলাফের ইতিহাস • ৮১
গেলাফ বদলের সময় • ৮২
গেলাফ কী? • ৮২
গেলাফ পরানোর রহস্য • ৮২
এক আজব ইতিহাস • ৮৪
আগত লোক কী দেখলেন? • ৮৫

সম্পর্কের কারণেই ব্যবধান • ৮৭
এই উম্মতের ওপর আল্লাহপাকের বড়ো অনুগ্রহ • ৮৭
একটি সূক্ষ্মবিষয় শুনুন! • ৮৮
জান্নাতিখাবার ও জান্নাতিপাথর • ৮৮
হাজরে আওয়াদের মর্যাদা • ৮৯
শাহ রফিউদ্দিন [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর উঁচু নজর • ৯১
কেমন বরকতময় গুরুত্বারোপ!! • ৯২
কাবাঘরের প্রতিবেশী কে? • ৯২
মাকামে ইবরাহিম • ৯৩
একটি ঘটনা • ৯৪
শেষকথা • ৯৬

কাবার পথে-৫
প্রেমিকদের ওমরা

হজ ও ওমরা কার জন্যে? • ১০০
কে কোন নিয়তে হজ করবে? • ১০০
জোবায়দা খাতুনের ঘটনা • ১০২
মূর্তিগুলো ছুড়ে ফেলো, চাই তা কল্পনার হোক বা পাথরের • ১০৩
তালবিয়া কীভাবে পড়বো • ১০৪
সর্বাবস্থায় রাজি থাকবে • ১০৪
তিন কাজ একদম করা যাবে না • ১০৫
ওমরা করা কখন ভালো • ১০৬
হারামশরিফের পাঁচ কাজ • ১০৬
ইমাম আবুহানিফার বলে দেয়া দোয়া • ১০৮
রমল • ১১০
তাওয়াফের ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা • ১১০
কোরআনিক দলিল • ১১২
কী চাইবো • ১১৩
সব কাজ শিখে শিখে করবে • ১১৪
জমজম পানের সময় কী দোয়া করবো? • ১১৫
সায়ি • ১১৭
সায়ি করার সময় কী চাইবে? • ১১৮
হাজ্জাজ বিন ইউসুফ • ১২০

সময় মতো দোয়া • ১২০
চুল কাটা • ১২৩
শিহরণ জাগানিয়া কথা • ১২৪
ওয়াশিং মেশিন • ১২৬

কাবার পথে-৬

আমি তাওয়াফের উদ্দেশ্যে কাবাশরিফ এলাম

ইবরাহিমি ডাকে আত্মাদের সাড়া– লাব্বাইক! • ১২৮
হজের সেঞ্চুরি! • ১২৮
খাজা সিরাজুদ্দিনের মক্কায় অবস্থান • ১২৯
একমহিলার কান্নাকাটি • ১২৯
রহমতের নালা থেকে কয়েক ফোঁটা • ১৩০
ঘরে কাম হারামশরিফে এনাম! • ১৩১
হজের জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুতি • ১৩২
গ্রহণীয় জায়গায় তওবা • ১৩৩
উইন্ডো অপারেশন • ১৩৪
নাস্তিকের দোয়াও কবুল হয়েছে • ১৩৪
দোয়া কেনো প্রভাবহীন হয়ে পরেছে? • ১৪১
ইসমেআজম কী? • ১৪২
আমেরিকান এক তরুণীর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী • ১৪২

কাবার পথে-৭

আল্লাহর পুরস্কার

হজের উদ্দেশ্য • ১৪৯
মোমিনের পরীক্ষা • ১৪৯
পুরস্কারের মাস • ১৫০
প্রেম-উন্মাদনার সফর • ১৫০
প্রেমপূর্ণ আমল • ১৫১
শরিয়তের সৌন্দর্য • ১৫২
একটি সূক্ষ্মদিক • ১৫৩
সাক্ষাতকেন্দ্র • ১৫৩
দোয়া কবুলের সোনালি সুযোগ • ১৫৪
দোয়া কীভাবে কবুল হবে? • ১৫৫

ভালো জনপদে আল্লাহর রহমত! • ১৫৮
আস্থা নিয়ে দোয়া করতে হবে • ১৫৯
প্রভুর সাথে সম্পর্ক কেমন হবে? • ১৬১
আল্লাহঅলারা হজ কীভাবে করেন? • ১৬৩
হজরত মালেক বিন দিনারের ঘটনা • ১৬৫
তওবার প্রয়োজনীয়তা • ১৬৮
একটি ঘটনা • ১৬৯
হাজিদের জন্যে সুসংবাদ • ১৬৯
মনে রাখুন! • ১৭০

কাবার পথে-৮
হজ কবুলের চেষ্টা

কষ্ট মাফিক কেষ্ট মিলে • ১৭৪
শয়তানের চেষ্টা • ১৭৪
কিছু সহজ আমল • ১৭৪
এস্তেগফারের বরকত • ১৭৭
প্রত্যেকের বাসনা • ১৭৭
ধৈর্য • ১৭৯
ধৈর্যের সংজ্ঞা • ১৮০
শুকরিয়া আদায়ের দু'টি পন্থা • ১৮২
অনুগ্রহ পাওয়ায় আল্লাহর ভয় • ১৮২
সূক্ষ্মকথা • ১৮৪
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা • ১৮৫

কাবার পথে-৯
মদিনা জেয়ারতের আদব

দু'টি পবিত্র শহর • ১৮৯
দু'টি সম্মানিত আঙ্গিনা • ১৯১
আমলের সোয়াব • ১৯১
বাইরের গোসলের সাথে আত্মিক গোসলও • ১৯৭
স্থানকাল মতো দোয়া • ১৯৯
প্রিয়তমের উপহার • ২০০
সাবধান! • ২০০
অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকবো • ২০২
মদিনাবাসীর দাওয়াত • ২০৪
রওজাশরিফে উপস্থিতি • ২০৪

উপস্থিতির আগে দান করা • ২০৫
সেখানে কতোক্ষণ দাঁড়াবে? • ২০৬
একটি সূক্ষ্মবিষয় • ২০৬
হুজ্জাতুলইসলাম কাসেম নানুতভির উপস্থিতি • ২০৭
অন্তর কেমন হবে? • ২০৯

কাবার পথে-১০
লাজবাব মনোনয়ন

মানুষকে অনুগ্রহ দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন • ২১৬
মহাঅনুগ্রহ • ২১৭
একটি সূক্ষ্মবিষয় • ২২৬
নবিদের জনকের পরীক্ষা • ২২৭
ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর দোয়া • ২২৮
ভাষা মনোনয়ন • ২২৯
শহর নির্বাচন • ২৩০
বংশ নির্বাচন • ২৩১
অন্যএক অনুদান • ২৩১
সম্মানিত বাবা নির্বাচন • ২৩৪
সৃষ্টিগতোভাবে সৎচরিত্র • ২৩৪
মা নির্বাচন • ২৩৫
নাম নির্বাচন • ২৩৭
দুধ মা নির্বাচন • ২৩৭
স্ত্রীদের নির্বাচন • ২৩৮
চারিত্রিক সনদপত্র • ২৩৯
পবিত্র সন্তান • ২৩৯
কোরআন নির্বাচন • ২৪০
দীন মনোনয়ন • ২৪১

কাবার পথে-১১
একনজরে হজ-ওমরা
ওমরার নিয়ম

এহরামের প্রস্তুতি • ২৪৭
গোসল • ২৪৭
এহরামের চাদর • ২৪৭
নফল নামাজ • ২৪৭

পরামর্শ • ২৪৭
নিয়ত • ২৪৭
তালবিয়া • ২৪৭
দোয়া • ২৪৮
এহরামের বিধি-বিষেধ • ২৪৮
কাবাশরিফ প্রথম দেখা • ২৪৮
তাওয়াফের প্রস্তুতি • ২৪৮
তাওয়াফের নিয়ত • ২৪৮
এস্তেলাম • ২৪৮
তাওয়াফ শুরু করবে • ২৪৯
নির্দেশনা • ২৪৯
সতর্কতা • ২৪৯
রমল • ২৪৯
এস্তেলাম • ২৪৯
তাওয়াফ সমাপ্তি • ২৪৯
ওয়াজিবুত তাওয়াফ • ২৪৯
জমজম • ২৫০
সায়ি • ২৫০
মারোয়ার দিকে রওয়ানা • ২৫০
মারোয়ায় পৌঁছে • ২৫০
সায়ি সমাপ্তি • ২৫০
নফল শুকরানা • ২৫০
হলক বা কসর • ২৫০
ওমরার পূর্ণতা • ২৫১

একনজরে হজের পাঁচদিন

হজের প্রথম দিন • ২৫২
হজের ২য় দিন • ২৫২
হজের ৩য় দিন • ২৫২
হজের ৪র্থ দিন • ২৫৩
হজের ৫ম দিন • ২৫৩
হজ এবং ওমরার কাজগুলোর বিস্তারিত নকশা বা ছক • ২৫৪
হজ্জেএফরাদ ও কেরানের আমল • ২৫৪
হজ্জেতামাত্তু ও ওমরার আমল • ২৫৬

আল্লাহর কাছে উপস্থিতি

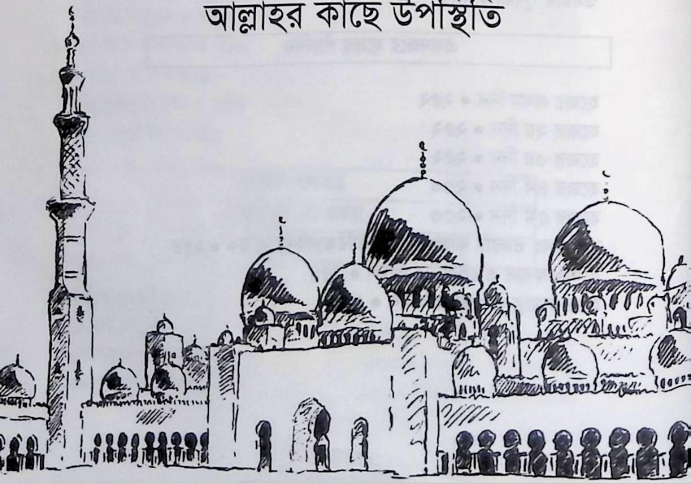

ভালোবাসা ও পাগলামির সফর/ভ্রমণ

আল্লাহপাকের পবিত্র ঘরে আগমনকারী প্রতিটি লোকই একবিশেষ ধরনের অবস্থায় আগমন করে। কারণ, এটি হচ্ছে প্রেম ও উন্মাদনার সফর/ভ্রমণ। দুনিয়ার অন্য সব ভ্রমণ হয় ব্যবসা-বাণিজ্য বা নিছক নানান এলাকা ঘুরে দেখার জন্যে বা দুনিয়ার আনন্দ উপভোগ করার জন্যে। যেগুলোর সম্পর্ক শরীর বা দেহের সাথে; কিন্তু পবিত্র হজ ও ওমরার সফরের সম্পর্ক শুধুই আত্মার সাথে। এটি শুধু প্রেম ও পাগলামির সফর। যাতে আগমনকারীরা আল্লাহপ্রেমের উত্তাল সাগরে ডুব দিয়ে আসে, মগ্ন হয়ে আসে। যে কারণে এহরাম বাঁধা জরুরি করা হয়েছে। কারণ, তুমি যখন তোমার প্রিয়তমার সান্নিধ্যেই আসছো, তখন দুনিয়ার সাজ-সৌন্দর্যের কী প্রয়োজন আছে? এধরনের বড়ো-ছোটোর ব্যবধান খতম করো। এখানে তোমরা সবাই শুধু আল্লাহপাকের দাস, কোনো ভেদাভেদ নেই যেখানে।

آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز

[আ গিয়া আইনে লড়াঈ মেঁ আগার ওয়াকতে নামায]

قبلہ رخ ہوکے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز

[কিবলাহ রোখ হোকে যমী বূস হোয়ী কওমে হিযায]

ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و ایاز

[এক হী সফ মেঁ খাড়ে হো গায়ে মাহমূদ ওয়া আয়ায]

نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز

[নাহ কোঈ বান্দাহ রাহা নাহ কোঈ বান্দাহ নাওয়ায]

بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے

[বান্দাহ ওয়া সাহেব ওয়া মোহতাজ ওয়া গনী এক হোয়ে]

تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

[তেরী সরকার মেঁ পহচেঁ তো সভী এক হোয়ে]

যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড রূপ
আজান ভেসে এলো
যুদ্ধ রেখে হেজাজবাসী
কেবলামুখো হলো

এককাতারে দাঁড়িয়ে গেলো
মাহমুদ ও আয়াজ
আজকে দেখো বান্দা সবাই
নয় কেহ বান্দা নওয়াজ।

গোলাম, মালিক, ধনী, গরিব
হলো একাকার

এসব দেখে হলেন খুশি
করুণার আঁধার।

আল্লাহপাকের পবিত্র ঘরটি এমন, যেখানে হাজির হলে সবাই এক সমান। সবাইকে এক করিয়ে দেয়। তোমাদের মাঝে যেসব পোশাক-আশাক, স্ট্যাটাস, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ রয়েছে (তোমরা যেসব মনে করে থাকো), এসব কিছুকে পেছনে ছুড়ে মারো, সবাই এহরামের একই চাদর পরে নাও, আরেক চাদর জড়িয়ে নাও। এটি হচ্ছে পুরুষের এহরাম।

এহরাম অবস্থায় চেহেরার পর্দা

এজন্যে নারীদের বলা হয়েছে, তোমরা যে পোশাক পরে আছো, সেগুলোই তোমাদের এহরাম। তবে শুধু এতোটুকু চেষ্টা রাখবে, যেনো কাপড় চেহেরার সাথে জড়িয়ে না যায়।

কিন্তু একথার অর্থ এমন নয়, চেহেরার পর্দা করতে হবে না, মুখ খোলা রাখতে হবে। নির্দেশনা এমন, যেনো সরাসরি মুখের সাথে কাপড় জড়িয়ে লেপ্টে না থাকে, আবার পর্দাও সঠিকভাবে রক্ষা হয়। মহিলা সাহাবিরা বলেন, যে কারণে আমরা খেজুর পাতার তৈরি পাখার মতো একটি জিনিস আমাদের মাথায় রেখে দিতাম, যাতে করে আমাদের চাদর মুখের সাথে লেপ্টে না গিয়ে একটু আলগা (পৃথক) থাকে। পরে পর্দার কোনো ব্যাঘাত ঘটতো না। যে আল্লাহপাক নারীদেরকে তাদের নিজ বাড়িতে পর্দায় আবৃত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, সেই আল্লাহপাক তাঁর নিজ ঘরে (কাবাশরিফে) আসার জন্যে তাঁর বান্দিদেরকে মুখের পর্দা উঠিয়ে ফেলতে বলবেন সেটি কীভাবে শোভা পায়? এখানে তো আরও বেশি পর্দা রক্ষা করা জরুরি। তাই পুরুষের এহরাম হচ্ছে দুটি চাদর।

খোশবু বা সুগন্ধি ব্যবহারেও নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এগুলোও সাজ-সজ্জার ভেতরে পরে। হাত পায়ের নখ কাটা, ময়লা দূর করা, শিকার ধরা, এসব কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, খোদার প্রেমিকদের এসবে কী এসে যায়? এগুলোর কী প্রয়োজন রয়েছে?

مرغ دل را گلشن بہتر ز کوئے یار نیست
[মুরগে দিল রা গোলশান বেহতরায কূয়ে ইয়ার নীস্ত]

طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست
[তালেবে দীদার রা যওকে গুল ওয়া গুলযারে নীস্ত]

প্রেমিক জানে প্রিয়াই সেরা
নয় বাগানের ফুল
প্রিয়ার মিলন চাইতে বড়ো
নয় বাগানের ফুল।

তালবিয়া আল্লাহপাকের একান্ত প্রিয়

ব্যস, তোমরা সবাই আল্লাহপাকের সেই ঘরের দিকে এগিয়ে চলো। আর তোমাদের মুখে মুখে শুধু একই কথা (জিনিস) ধ্বনিত হবে–লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক (হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার দরবারে হাজির হয়েছি। হাজির হয়েছি)। কী চমৎকার মধুময় ও প্রিয় মোলায়েম বাক্য!! নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বিদায় হজে গমনকালে হজরত জিবরাইল [আলায়হিসসালাম] আকাশ থেকে নেমে এসে বলেন, হে রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]! মহান আল্লাহপাক বিশেষভাবে পয়গাম পাঠিয়েছেন, আপনি সাহাবাদেরকে আদেশ দেবেন, তাঁরা যেনো উঁচুকণ্ঠে তালবিয়া পড়ে। এটি আল্লাহপাকের খুবই পছন্দনীয় বস্তু।

তবে নারীরা নিচু করে আস্তে আস্তে পড়বে। সাহাবায়েকেরাম বলতেন, আমরা এতো বেশি তালবিয়া পড়তাম, যার কারণে আমাদের মুখ ও গলা শুকিয়ে আসতো। মহান আল্লাহপাকের এই বাক্যগুলো একান্ত প্রিয়, খুবই পছন্দের।

একহাদিসে এসেছে, চার শ্রেণীর মানুষ এমন, যাদের মুখে উচ্চারিত বাক্যের কারণে দয়াময় আল্লাহপাক সে জনপদে আসা বহু বিপদাপদ হটিয়ে দেন। যেমন–

১. মোয়াজ্জিন সাহেব যখন আজান দেয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলেন, তখন তার এই 'আল্লাহু আকবার' বলা আল্লাহপাকের কাছে এতোই পছন্দনীয়, যাতে করে জনপদে আসা সম্ভাব্য বিপদাপদ দূর করে দেন।

২. মুজাহিদরা যখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে গিয়ে 'নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার' বলে স্লোগান দেন, তখন সেটি আল্লাহপাকের কাছে এতোটাই মাহাত্ম্য বহন করে যে, সেই মুজাহিদের স্লোগানের কারণে সেই এলাকায় আসতে পারতো এমন সব বালা-মসিবত দূর করে দেন।

৩. কোনো শিশু অথবা যেকেউ প্রথম কোরআনমাজিদ পড়ার (শেখার) জন্যে 'বিসমিল্লাহ হিররহমানির রহিম' পড়ে, তখন আল্লাহপাকের একান্ত প্রিয় তাসমিয়া বা বিসমিল্লাহ পড়ার বরকতে তিনি সে অঞ্চলে আসা বিপদাপদ হটিয়ে দেন।

৪. কেউ যখন হজের উদ্দেশ্যে এহরাম বেঁধে لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ বলে, তখন আল্লাহপাকের কাছে এটা এতো প্রিয় মনে হয়, যার কারণে তিনি সে জনপদে আসা বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা দান করেন, হেফাজত করেন।

আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, বাক্যটি কতো প্রিয়। যা আল্লাহপাক আমাদেরকে দান করেছেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হাজির! হে খোদা আমি হাজির!! এরপর এখানে এসে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে, সায়ি করে, হজ ও ওমরার অন্যসব অনুসঙ্গ পালন করে।

তাওয়াফ একটি সহজাত আমল

আল্লাহপাকের ঘর তাওয়াফ করার দৃশ্য খুবই দৃষ্টিনন্দন আর মনোরম। ব্যাপারটি এমন, যেনো কোথাও বাতি জ্বালিয়ে তার চারপাশে পতঙ্গ এসে জড়ো হয়ে ঘুরতে থাকে। আপনি একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন এবং মনে হবে যেনো সব সৃষ্টিজীব তাওয়াফে রতো রয়েছে। শুধু মানুষই নয়; সব সৃষ্টি। আপনি আকাশের সৃষ্টিকর্তার দিকে তাকালে দেখবেন যতোগুলো চলমান (গ্রহ) আছে, সেগুলো সূর্যের চারপাশ দিয়ে ঘুরে চলছে। আমাদের সৌরজগতের নিয়মের দিকে তাকালে দেখা যায় সব গ্রহ-উপগ্রহ যেমন, পৃথিবী, মঙ্গলগ্রহ সবকিছু সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। তার মানে এগুলো তাওয়াফ করে চলেছে। যদি অণুবিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে দেখা যাবে, এই পৃথিবী বিশেষ পর্দাথ দিয়ে তৈরি আর পদার্থের মৌলিক উপাদান হচ্ছে এ্যাটম। আর এ্যাটমকে যদি আপনি খেয়াল করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, তার মাঝেও একধরনেরর নিউক্লিয়াস রয়েছে। আর নিউক্লিয়াসের পাশ দিয়ে ঘুরছে ইলিকট্রোন। তার মানে অণু-পরমাণুর চলাচলেও তাওয়াফের উপস্থিতি রয়েছে। আর সেই এ্যাটম এর সাথে মিলেই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, জগৎ তৈরি হয়েছে। যা সবসময় তাওয়াফরতো ঘূর্ণয়মান রয়েছে।

আরও গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এই সূর্যও স্থির নয়। পৃথিবীর হিসাব দেখলে সূর্যকে স্থির বলে মনে হতে পারে; কিন্তু গ্যালাক্সির হিসাবে দেখলে দেখা যাবে, এটিও কোনো গ্লাকটিক কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরছে। আর যদি গ্যালিক্সিকে দেখেন, তাহলে সেটিও অন্যকোনো কেন্দ্রবিন্দুকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। তার মানে সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই তাওয়াফরতো আছে!!

নক্ষত্রপুঞ্জের তাওয়াফের ধরন

একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন, আমি আমেরিকায় অবস্থানকালে একবন্ধু আমাকে বলেন, আমেরিকায় একটি স্পেজ মিউজিয়াম বা মহাশূন্য জাদুঘর (নভোথিয়েটার) রয়েছে, যেখানে নানা ধরনের ডুকমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। আপনার অবসর সময় থাকলে আপনাকে তা দেখাতে নিয়ে যাবো। জিজ্ঞেস করি, সেখানে কী কী দেখানো হয়? তিনি বলেন, মহাশূন্যের নক্ষত্র সম্পর্কে নানান তথ্য ও প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। ভাবলাম, জ্ঞান শেখার উদ্দেশ্যে যাওয়া যেতে পারে। মাদরাসায় লেখাপড়াকালে উস্তাদরা তো এই মহাশূন্য বিষয়ে বহু কিছু পড়িয়েছেন, সেগুলো বিস্তর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভালোভাবে বোধগম্য করা যাবে। আর যেহেতু সেখানে কোনো ধরনের নাচগান আর নারী ঘটিত বা নারীদের নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান নেই, তাই শরিয়েতের দৃষ্টিতেও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আমার সাথে আরও দু'তিনজন আলেম ছিলেন।

বিজ্ঞানভিত্তিক এমন অনুষ্ঠান দেখলে অবশ্যই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রবৃদ্ধি ঘটবে। তাছাড়া ওলামায়েকেরাম লিখেছেন, মুসলমানদেরকে অবশ্যই সৌরজগতের জ্ঞান

শেখার পাশাপাশি চন্দ্র, নক্ষত্র সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করতে হবে। মহান আল্লাহপাক পবিত্রকোরআনে ঘোষণা করেছেন–

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

"আর তারা নক্ষত্র দেখে দেখে সময় নির্ণয় করে। সঠিক পথে চলে পথর্নির্দেশনা পায়।"

আমরা সেখানে গেলে তারা আমাদেরকে একটি ইম্পেরিয়ামের ভেতর আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ প্রদর্শন করান এবং প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরে বুঝিয়ে দেন। তারপর তারা বলেন, দেখুন এখান থেকে ধারণা পাওয়া যায় কোনো নবিকে বা সমুদ্রপথের যাত্রী দিক ভুলে যায়। যেহেতু চারদিকে শুধু পানি আর পানি থাকায় কিছুই বোঝা যায় না, সবাই কঠিন মুহূর্তে আকাশের তারা দেখে দিক নির্ণয় করে থাকে। সময় বুঝতে পারে। এই দুটি জিনিসই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অথবা কাউকে তার শত্রু গভীর জঙ্গলে নিয়ে ফেলে এলে বা কোনো মরুবিয়াবানে আটকা পরলে বা পথ হারিয়ে বসলে (এসব ক্ষেত্রেও) আকাশের তারা দেখে দিক নির্দেশনা পেতে পারে। সময় বুঝতে পারে।

আমি ছোটোবেলায় খেয়াল করেছি, আমার আব্বাজান শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামাজের জন্যে ওঠে বার বার আকাশের তারার দিকে তাকাতেন। সে যুগে খুব কম নামুষের কাছেই ঘড়ি ছিলো, বিশেষ করে প্রবীণ আর অশিক্ষিত লোকদের কাছে ঘড়িতো থাকতোই না। তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখে সময় আর দিক নির্ণয় করতেন। বুঝতে পারতেন, এখন সুবহেকাজিব চলছে, এতোক্ষণ পর সুবহেসাদিক হবে। তখন আমার আব্বাজানকে জিজ্ঞেস করতাম, কীভাবে আকাশের তারা দেখে তারা সময় বুঝতে পারেন। তিনি বলতেন, অমুক তারা এমন, অমুকটি এমন, এই তারা এখানে এলে তাহাজ্জুদের সময় শুরু হয়। এতোদূর নেমে গেলে শুরু হয় ফজরের সময়। তো আমাদের মুরুব্বিরা তারা দেখে দেখে যে কাজ করতেন, বিজ্ঞানীরাও আজ সেসব কাজই করছেন। ওগুলোর সব ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক নাম দিয়ে দিয়ে। শেষ পর্যায়ে আমার বন্ধু একটি আশ্চর্যকথা বলেন, অনেক মানুষ মনে করে থাকে আকাশের কিছু কিছু তারা চলমান আর কিছু কিছু তারা স্থির আছে। এটি একদম ভুল ধারণা। আসলে আকাশের সব তারাই চলমান, তবে সেগুলোর মাঝে কিছুটা ব্যবধান আছে। যেসব তারার স্পিড বা গতি খুব বেশি, সেগুলোকে দেখে চলমান মনে হয়। আর যেগুলোর গতি খুব কম বা অতি সম্থুক, সেগুলোকে দেখে মনে হয় এরা স্থিতিশীল। আমরা যদি লাগাতার একবছর পর্যন্ত সেগুলো সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণ করতে থাকি, তাহলে অবশ্যই উপলব্ধি করা যাবে, সেগুলো স্থান্তরিত হয়ে চলেছে। তবে একটিমাত্র তারা এমন আছে, যেটি গোটা সৃষ্টিজগতের একদম মাঝখানে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

এরপর সেসব লোক আমাদেরকে তারা চলার গতি বাড়িয়ে দিয়ে দেখায়, যেমনটি রেলগাড়ি চালানোর সময় তার গতি বাড়িয়ে দিয়ে থাকে, আমরা খেয়াল করি একটি তারা মূল কেন্দ্রে অবস্থান করছে আর তার চারপাশে কোটি কোটি তারা তাকে প্রদক্ষিণ করছে। সে সময় আমার মাথায় একটি বিষয় চলে আসে, আমি আমার পাশে বসে থাকা আলেম সাহেবকে বলি, দেখুন, হাদিসশরিফে এসেছে, পৃথিবীর এই কাবাশরিফের মতো আরেটি কাবা রয়েছে উর্ধাকাশেও। সেটির নাম 'বাইতুলমামুর।' ওটি হচ্ছে ফেরেশতাদের কাবাশরিফ। আকাশের ফেরেশতারা সবসময় তার তাওয়াফ করছে। এই দু'কাবার অবস্থান এমন পর্যায়ের যে, দু'টি ওপর নিচের দিক থেকে একদম বরাবর। এমনকি ওপরের কাবা তথা বাইতুলমামুর থেকে যদি নিচ দিকে কোনো পাথর ছোড়া হয়, তাহলে তা এসে একদম সোজা কাবাশরিফের ওপর এসে পড়বে।

তাই যে তাজাল্লি (দ্যুতি) কাবাশরিফের ওপর পড়ছে, তা যেনো সোজা বাইতুলমামুর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে আসছে। এটি একটি দ্যুতির (নুরের) খুঁটির মতো আরশ থেকে জমিনে এসে পড়েছে, এরপর তা একদম বরাবর তলদেশে (পাতালে) চলে গেছে।

আমি বললাম, এটা তো তেমন কোনো ব্যাপার নয়। আমরা যে তারাটি স্থির দেখছি, সেটি বাইতুলমামুর আর তার চারপাশ দিয়ে যেসব অগণিত তারা ঘুরতে দেখা যাচ্ছে, সেগুলো বাইতুলমামুরে সবসময় তাওয়াফরতো ফেরেশতাদের সারি আর পৃথিবীতে এসে যে তাজাল্লি (দ্যুতি) পড়ছে, আল্লাহর বান্দারা তারই তাওয়াফ করে চলেছে।

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے
[হাম হুয়ে তুম হুয়ে কেহ মীর হুয়ে]
اسکی زلفوں کے سب اسیر ہوئے
[উসকী যুলফূঁ কে সব আসীর হুয়ে]

আমি হই তুমি হও
কিংবা সেনাপতি
সবাই তারি বন্দি আজি
সত্যকথা অতি।

আল্লাহ প্রত্যাশী সব সৃষ্টিজীব তাঁর তাজাল্লির (দ্যুতির) তাওয়াফে রতো আছে। তাই বলছিলাম, পৃথিবী আর বিশ্বজগত সবসময় তাওয়াফরতো। আল্লাহপাক আমাদেরকেও তাদের অংশ বানিয়ে নিন!

খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবাদত

এখানকার (হজের) এবাদতগুলোর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত হচ্ছে আল্লাহপাকের ঘর তাওয়াফ করা। যেখানে আল্লাহপাকের একশো বিশ তাজাল্লি

নামে, সবসময় রহমত ঝরে থাকে, যেগুলোর সবচেয়ে বড়ো অংশ নামে বায়তুল্লাহশরিফ তাওয়াফকারীদের ওপর, এই তাওয়াফ এমন একটি আলাদা এবাদত, যা বিশ্বের আর অন্যকোথাও অনুষ্ঠিত হয় না। অথচো নামাজ, রোজা, জাকাতসহ সবধরনের এবাদত কোথাও না কোথাও সবসময় চলমান রয়েছেই। একলোক একবার কসম করে বলে বসে, আমি এমন একটি এবাদত করবো, যা সে সময় বিশ্বের কোনো মানুষ করবে না; কিন্তু কসম আবেগে করায় কসমের পর তার টনক নড়ে। সে আর এমন কোনো এবাদত খুঁজে বের করতে পারে না, যা কোথাও সবসময় চলছে না। তারপর সে ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর কাছে এর সমাধান জানতে যায়। ঘটনার বিবরণ শুনে ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, এর সমাধান একটি আছে, তবে সে জন্যে তোমাকে বেশ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সেটি হচ্ছে, কাবাশরিফের তাওয়াফের এবাদত আর তা এভাবে, তুমি সেখানে গিয়ে ওখানে তাওয়াফরতো লোকদের কাছে তোমার কসমের কথা জানিয়ে অনুরোধ করবে। তারা যেনো কিছুসময় তাওয়াফ করা থেকে বিরত থাকে আর সেই ফাঁকে তুমি তোমার তাওয়াফ সেরে নেবে। তাহলে তোমার কসম পুরো করা হয়ে যাবে। কারণ, কাবাশরিফের তাওয়াফের এবাদত সে সময় বিশ্বের কোথাও হওয়া সম্ভব নয়। যা গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায়। তাই বলা হয়, এই বায়তুল্লাহশরিফের তাওয়াফ করার এবাদতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর স্বতন্ত্র। যা অন্যকোনো এবাদতের সাথে তুলনীয় নয়।

পাখিদের তাওয়াফ

এই এবাদত শুধু মানুষেরাই করে না; আল্লাহপাকের অন্যসব সৃষ্টিও করে থাকে। আমি বেশ কয়েকবার নিজ চোখে দেখেছি, ছোটো ছোটো একপ্রজাতির পাখি দল বেঁধে কাবাশরিফের চারপাশে চক্কর দিয়ে (তাওয়াফ করে) চলেছে। আপনি নিজেও যদি দেখতে চান, সাঁঝের বেলা একটু সময় বসে খেয়াল করবেন, তারাও এসে বায়তুল্লাহশরিফের চারপাশে চক্কর দিয়ে চলেছে।

একবার আমি খেয়াল করি, দল বেঁধে একঝাঁক কবুতর এসে কাবাশরিফের চারপাশে (তাওয়াফ) প্রদক্ষিণ করে চলেছে। শুধু তাই নয়; একবার দেখি, মানুষের সাথে একটি বিড়ালও তাওয়াফ করে ঘুরে চলেছে নিয়মতান্ত্রিকভাবে। কেউ একজন বলে ওঠেন, দেখুন, বিড়ালও আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে চলেছে! বলি, তা অবশ্যই; তবে যেহেতু বিড়াল জাতি তাওয়াফ (এবাদত) করতে আদিষ্ট নয়, তাই হতে পারে কোনো জিন এসে বিড়ালের রূপ ধরে তাওয়াফ করে যাচ্ছে। কারণ, মানুষের সাথে জিনরাও আল্লাহর এবাদত করতে আদিষ্ট।

মোটকথা, প্রতিমুহূর্তে আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ চলমান রয়েছে। মানুষ, জিন ছাড়া অন্যসব প্রাণীও তাতে রতো রয়েছে। এমনকি প্রচণ্ড বৃষ্টির মাঝেও তা অব্যাহত থাকে। তবে শুধু নামাজের জামাতের সময় সাময়িক বিরতি থাকে। কারণ, ফরজ নামাজ সবধরনের এবাদতের মূল। যে কারণে সে সময় অন্যসব কিছু স্থগিত থাকে। এছাড়া কাবাশরিফে তারাবি নামাজ চলাকালেও তাওয়াফ অব্যাহত থাকে।

বাতির পাশে পতঙ্গ

দীন-রাত, সকাল-সন্ধা, সবসময় তাওয়াফ চলছে তো চলছেই, কোনো প্রতিবন্ধকতাই তাতে বাঁধ সাধতে পারে না। আপনি শুনে অবাক হয়ে যাবেন, একবার প্রচণ্ড পাহাড়ী বৃষ্টির ফলে মক্কার চারদিক পানিতে থৈ থৈ করতে থাকে। কাবাশরিফ অনেকটা নিচুভূমিতে অবস্থিত হওয়ার কারণে সেখানে জমে যাওয়া পানির পরিমাণটা খুব বেশি ছিলো। কাবা চত্তর যেনো পরিণত হয়েছিলো গভীর জলাশয়ে; কিন্তু তার মধ্যেও একমিনিটির জন্যে সেখানে তাওয়াফ বন্ধ থাকেনি। আল্লাহর প্রেমিক বান্দারা সাঁতরিয়ে সাঁতরিয়ে তাওয়াফ চালিয়ে গেছে। যতোদিন সেখানে পানি জমেছিলো, ততোদিন এভাবে সাঁতরিয়ে তাওয়াফ অব্যাহত রেখেছে।

সোবহানাল্লাহ! ওহ্ আমর মাওলা, কেমন তোমার এবাদত! তুমি এখানে একটি বাতি জ্বালিয়ে রেখেছো আর চারদিক থেকে পতঙ্গপাল ছুটে এসে তা প্রদক্ষিণ করে চলেছে, তাওয়াফে রতো আছে।

আফগানি বুজুর্গের বিরতিহীন তাওয়াফ

আমি এক আফগানি বুজুর্গকে দেখেছি। তিনি ছিলেন খুনখুনে বুড়ো, দুর্বল। হুইল চেয়ারে বসাছিলেন। মাথা নুয়ে পরেছিলো। তাঁর কাজই ছিলো বিরতিহীনভাবে সারাদিন তাওয়াফ চালিয়ে যাওয়া। তিনি সবসময় হুইল চেয়ারে বসে থাকতেন। কেউ না কেউ তা ঠেলে নিয়ে যেতেন। এভাবে কেউ তাঁকে তিন তাওয়াফ করাতেন, কেউ করাতেন চার তাওয়াফ। দুই তাওয়াফের জন্যে প্রয়োজন হয় চৌদ্দ চক্কর। তিন তাওয়াফের জন্যে একুশ চক্কর। একজন ক্লান্ত হয়ে গেলে আরেকজন স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতেন। ফলে অন্যদের তাওয়াফ শেষ হয়ে গেলেও তার তাওয়াফ শেষ হতো না, সবসময় চলমান থাকতো। এমন কি কোনো পুরুষ লোক না ধরলে নারীদেরকেও আল্লাহপাক পাঠিয়ে দিতেন। বোরকা পরা মহিলারাও তার হুইল চেয়ার ঠেলে নিয়ে যেতেন। অনেক সময় কিশোরদেরকেও দেখেছি, সোৎসাহে তাঁর চেয়ার ঠেলে নিয়ে যেতো।

আল্লাহু আকবার! কোনো সময় সাধারণ মানুষ তার চেয়ার ঠেলে নেয়ার মতো না থাকলে স্বয়ং দায়িত্বরতো পুশিলরাও তাঁর তাওয়াফ চালিয়ে নিতো ইউনিফর্ম পরা

অবস্থায়। এভাবে দিন-রাত সবসময় বিরতিহীনভাবে তাঁর তাওয়াফ চলতে থাকতো। এমনও দেখেছি, কোনো সময় তাঁকে সহযোগিতা করতে কেউ এগিয়ে না এলে (খুব অল্পসময়ই এমন হতো) তিনি একা একাই ঘষাট ঘষাট মাটিতে পা রেখে সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। দেখে তখন অন্যকেউ না কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। এভাবে সারাক্ষণ তাঁর তাওয়াফের এবাদত অব্যাহত থাকতো।

রোজ সত্তরবার তাওয়াফ

একবুজুর্গ সম্পর্কে জানা যায়, তিনি রোজ সত্তরবার তাওয়াফ করতেন। অথচো তখন বয়সও ছিলো তার সত্তর বছর। অর্থাৎ, সত্তর বছর বয়সে এসেও রোজ সত্তরবার তাওয়াফের আমল অব্যাহত রাখতেন। যার অর্থ রোজ বায়তুল্লাহশরিফের চারপাশে চারশো নব্বইবার প্রদক্ষিণ করতেন। যা প্রায় বারো-তেরো কি.মি পথ। একাধারে এই বার-তেরো কি.মি. পথ চলা কোনো চাট্টিখানি কথা নয়, সহজ কাজও নয়। কোনো গ্রামীণ (যারা হালচাষ করে) লোকের পক্ষে এটা কিছুটা স্বাভাবিক হলেও অন্যকোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অথচো তিনি এভাবেই তাওয়াফ চালিয়ে যেতেন।

শুধু তাই নয়, প্রতি তাওয়াফের মাঝে আবার দু'রাকাত করে নফল নামাজও আদায় করে নিতেন। যার অর্থ দাঁড়ায়, সত্তরবার তাওয়াফের সাথে একশো চল্লিশ রাকাত নফল নামাজও আদায় করতেন।

আল্লাহু আকবার! রোজ ফরজ, সুন্নত ছাড়াও শুধু একশো চল্লিশ রাকাত নামাজ! ভাবা যায়! আমরা তো দশ-বারো রাকাত অতিরিক্ত নামাজ পড়তে গেলেই প্রাণ যায় যায় অবস্থা।

তাছাড়া কেউ যদি সাহস করে শীতের লম্বা রাতে পঞ্চাশ রাকাত নামাজ পড়া শুরু করে, তাহলে তো তার বাসায় কারফিউ জারি হয়ে যাবে। স্ত্রী বলবে, সন্তানের দোহাই দিয়ে, আবার সন্তানরা কথা বলবে তাদের মায়ের দোহাই দিয়ে। আচ্ছা, কারও বাসায় যদি সমস্যা নাও থাকে, তবুও আমরা যদি একরাতে পঞ্চাশ রাকাত নফল নামাজ পড়তে শুরু করি, তাহলে দেখা যাবে, শেষের দিকে গিয়ে রুকু থেকে ওঠার সময় 'সামি আল্লাহু' বলার পরিবর্তে বলে বসবো 'আওলি আল্লাহ!!'

অথচো সেই বুজুর্গ রোজ (ফরজ, সুন্নত, নফল বাদেও) একশো চল্লিশ রাকাত নফল নামাজ আদায়সহ সত্তরবার তাওয়াফ করা রুটিন বানিয়ে নিয়েছিলেন। যা সহজ কোনো কাজ নয়; কিন্তু দয়াময় আল্লাহপাক যাদেরকে এমন শক্তি-সাহস দেন, তারাই শুধু এই অনুগ্রহে ধন্য হতে পারেন।

কাঁচা পথে পাকা মুসাফির

আমাদের আগেররা বহু কষ্ট করে হজব্রত পালন করতেন। এখন তো আমরা ওমরার কাজ পনেরো দিনেই সেরে ফেলি বা সারতে হয়। আগের যুগে একটি হজ শেষ করতে ছয় মাস করে সময় লাগতো। যার কারণে পবিত্র রমজানের আগেই সফর শুরু করতে হতো। সাগরের মাঝপথে রমজান এসে পরতো। ফলে সফরের কঠিন কাজ আরও কঠিনতর হয়ে যেতো। আজকাল মাত্র চার ঘণ্টায় জেদ্দায় (মক্কায়) পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হলেও তখন লেগে যেতো মাসের পর মাস। তাই দুই যুগের হজ আর হাজিদের মাঝে তুলনা করলে দেখা যায়, আগে ছিলো কাঁচাপথের পাকাযাত্রী (হাজি) আর এখন দেখা যায় পাকা পথের কাঁচাযাত্রী!!

বর্তমান যুগের সুবিধাদি

আমার শায়েখ [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলতেন, আমরা যখন নৌপথে হজে যেতাম, তখন জেদ্দা See Port (সি পোর্ট) বা সমুদ্রবন্দরে জাহাজ ভিড়লে যাত্রীদের তিনদিন পর্যন্ত জাহাজের ভেতরেই থাকতে হতো। নিচে নামতে দেয়া হতো না। এর একটি কারণ পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া, অন্যটি সবাইকে ডাক্তারি পরীক্ষা করে দেখা, নিজ নিজ দেশ থেকে কেউ কোনো ভয়ানক বা ক্ষতিকর জীবাণু বইয়ে নিয়ে এসেছে কী-না। আমরা নৌজাহাজে বসে বসে নিজ চোখে জেদ্দার মাটি, বাড়ি-ঘর সবকিছু দেখতে পেতাম; কিন্তু নিচে নামতে পারতাম না। তিনদিন পর্যন্ত তা নিষেধ ছিলো।

আর আজকের অবস্থা? মাশাআল্লাহ! জেদ্দা বিমান বন্দরে প্লেন নামার সাথে সাথে মাত্র এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সেখান থেকে বের হয়ে পরি। কোথাও কোনো কষ্ট নেই। এয়ারপোর্ট, অভ্যর্থনাকক্ষ, বিশ্রামগারসহ সবকিছুই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। অতো উন্নতমানের ঝকঝকে বাথরুম, ওয়াশরুম, কফিহাউজ। তাছাড়া সবখানেই শীতল ও কোমল পানীয়র পর্যাপ্ততা। কোথাও কোনো কিছুর ঘাটতি নেই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুও সবসময় হাতের মুঠোয়। তারপরও আমাদের অভিযোগ অনুযোগ লেগেই থাকে। বলে থাকি, অনেক সময় লেগে গেলো, বহু ধকল সইতে হলো!

কিন্তু শান্তভাবে ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করে দেখুন, আজ জেদ্দা থেকে পবিত্র মক্কা নগরীতে পৌঁছতে লাগে মাত্র দুই-সোয়া দুই ঘণ্টা সময়। অথচো আগের যুগে এতোটুকু পথ উটে চড়ে পাড়ি দিতে লেগে যেতো তিনদিন তিন রাত। এবড়ো থেবড়ো উঁচু-নিচু পাহাড়িপথ পেরিয়ে আসতে হতো। খুবই সতর্কতার সাথে ধীর গতিতে উঁচুপাহাড়ের চূড়ায় উঠতে অনেক সময় লেগে যেতো, তেমনি আবার নিচে নেমে আসতে সময় লাগতো আরও বেশি। অথচো আজ সেসব

পাহাড় কেটে কেটে সুন্দর মসৃণ রাস্তা করে দিয়েছে সে দেশের সরকার তথা সড়ক ও জনপথ বিভাগ।

আমার শায়েখ বলতেন, আমরা উট ভাড়া নিয়ে যেতাম; কিন্তু যাদের সামর্থ্য কম, তারা দু'তিনজন মিলে একটি উট ভাড়া নিয়ে তাতে অতিরিক্ত ভাড়ী সামানাপত্র চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা পায়ে চলতেন। যা ছিলো খুবই কষ্টকর কাজ। মাঝপথে কোনো কিছুর ব্যবস্থা না থাকার কারণে তিনদিনের প্রয়োজীয় (উটেরসহ) খাদ্যসামগ্রী ও পানির মশক সাথে নিতে হতো। হিসাব করলে দেখা যাবে, পানি ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ওজনই তো একটন পার হয়ে যাওয়ার কথা। এতো কষ্ট করে তারা বায়তুল্লাহশরিফ হাজির হতেন; কিন্তু যেহেতু খোদাপ্রেমে গোটা অন্তর টইটুম্বর, খোদাভীতিতে ভরা জীবন, তাই এমন কষ্টের পরও বায়তুল্লাহশরিফে হাজির হতে পারাটা তাদের কাছে মনে হতো ইদের চেয়েও মহানন্দের বিষয়।

কাবা দেখাই আমাদের ইদ

কেউ একজন একবুজুর্গকে জিজ্ঞেস করে, হুজুর, ইদ কবে হবে? জবাবে বজুর্গ বলেন, 'যেদিন দিদ হবে, সেদিন ইদ হবে।' অর্থাৎ, যখন প্রিয় আল্লাহপাকের দিদার বা দেখা মিলবে, সেদিন আমাদের ইদ হবে। আর দুনিয়াতে আল্লাহপাকের রূপক দর্শন বলা হয়ে থাকে তাঁর পবিত্রকাবা দেখাকে। তাই কাবাশরিফ দেখার মাধ্যমে ইদের আনন্দ-খুশি উপভোগ হয়ে থাকে।

ষোলো দিনে ষোলো খতম কোরআন!

আমার মুর্শিদ (পির সাহেব) বলেন, ১৯৩০ সালের আগে (যখন) ব্যাপকভাবে তেল আবিষ্কার উৎপাদন শুরু হয় নি, অবস্থা খুব করুণ ছিলো, অনুন্নত পথে মক্কামোকাররমা থেকে পবিত্র মদিনাশরিফে পৌঁছতে ষোলো দিন লেগে যেতো, এখনতো মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই (ঘুমের ভেতরেই) পৌঁছা যায়।

ইমাম শাফেয়ি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, আমি একবার এককাফেলার সাথে উটে চড়ে মাদিনা সফর করছিলাম, মক্কা থেকে সেখানে পৌঁছতে ষোলোদিন সময় লেগে যায়। এই সময়কে কাজে লাগিয়ে আমি পবিত্রকোরআন ষোলোটি খতম দিয়ে ফেলি!

সোবহানাল্লাহ! আজকাল তো মক্কা থেকে মদিনায় পৌঁছার পথে সামান্য সুরা ইয়াসিনটিও অনেকে খতম করতে পারি না।

গেঁয়ো লোকের প্রচণ্ড খিদে

আমার মুর্শিদ (পির সাহেব) বলেন, একবার আমরা মক্কা থেকে মদিনায় যাচ্ছিলাম, পথে একজায়গায় যাত্রাবিরতি করি। তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকি। এমন সময় একগেঁয়ো লোক এসে ইশারায় বলে, আমার প্রচণ্ড

খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দিন। আমার স্ত্রীকে বলি, তাকে কিছু রুটি পাকিয়ে দাও। সে আটা ও পানি বের করে রুটি তৈরির প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছিলো, এমন সময় লোকটি ছো মেরে আটার পাত্রটি হাতে নিয়ে অন্যহাতে আরেকটি পাত্র নিয়ে তাতে কিছু আটা ঢেলে নেয়ে। এরপর তরিৎ তাতে সামান্য পানি ঢেলে একটু নাড়া দিয়েই তা দ্রুতো পান করে নেয়। এরপর আলহামদুলিল্লাহ পড়ে বলেন, এখন আমি রুটি তৈরি করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো... ।
ঘটনাটি ঘটে যায় একদম চোখের পলকেই, কোনো কিছু বুঝে উঠার আগেই। তবে এতোটুকু বুঝতে বাকি থাকে না, তার খিদের মাত্রাটা কেমন তীব্র ছিলো?

তরমুজের খোসার মূল্যায়ন

আমার মুর্শিদ (পির সাহেব) বলতেন, আমরা মক্কাশরিফে থাকাকালে তরমুজ খেয়ে তার খোসা ফেলে দিতাম, সেই খোসা সংগ্রহের জন্যে স্থানীয় গরিব শিশুদের মাঝে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেতো, কে কার আগে তা নিতে পারে। এগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তারা সেখানেই কামড়ে খেতো। কেউ কেউ আবার তা বাড়িতে নিয়ে গেলে তাদের দুখিনি মায়েরা সেগুলো কেটে রান্না করে দিতো। একদিন আমি দু'তিনটি বড়ো আকারের তরমুজ কিনে এনে তাদের মাঝে কেটে ভাগ করে দিই। তারা পরমানন্দে একান্ত তৃপ্তি ভরে তা খেতে থাকে। তাদের ভেতরকার একছেলে আমাকে বিস্মিত করে বলে ওঠে, আমরা নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞ যে, তিনি এখানে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি যদি এখানে না জন্মাতেন, তাহলে এখানে কেউ হজ-ওমরার জন্যে আসতোও না আর আমাদেরকে এভাবে তরমুজও খাওয়াতো না। ফলে কোনোদিন আমাদের ভাগ্যে তরমুজও জুটতো না। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কারণেই আজ আমরা তরমুজসহ বহুকিছু খেতে পারছি!!

শিশুমনে কাবাপ্রেম

হজরত বলেন, একহজের সময় একটি আরবশিশু কাবাশরিফের পাশে গাড়া আমাদের তাঁবুতে আসা-যাওয়া করতো। আমার স্ত্রী তাকে নানা কিছু খেতে দিতো। কখনও রুটি, কখনও তরকারি, কখনও বা ফলমূল, জেলি। মোটকথা, রোজ তাকে কিছু না কিছু খেতে দিতোই। সেও ভীষণ আগ্রহভরে ওগুলো খেয়ে নিতো। এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের পরিবারের সাথে তার একটা সখ্যতা গড়ে ওঠে। অনেকটা পরিবারের একজন ক্ষুদে সদস্যের মতো হয়ে যায় সে। আমাদের হজের সময় শেষ হয়ে আসতে থাকলে আমার স্ত্রী যখন তাকে বলে, আমরা আর কিছুদিন পর এখান থেকে চলে যাবো, তখন তার চেহেরা মলিন হয়ে যায়। কঁচি মুখে ভেসে ওঠে বিরহের ছায়া। এরপর বিদায়ের আগের দিন যখন তাকে বলে, আমরা আগামীকাল এখান থেকে চলে যাবো, তখন আর সেই কোমল শিশুটি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে

পারে না। তার চোখ বেয়ে গরিয়ে আসে গরম অশ্রু। আমার স্ত্রীও কেমন যেনো আনমনা হয়ে যায়। তারপর তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলে, দেখো, আমরা ইচ্ছে করলেও আর এখানে থাকতে পারবো না; কিন্তু বুঝতে পারছি, আমরা চলে গেলে তুমি খুব কষ্ট পাবে, আমাদেরও অনেক কষ্ট হবে। তাহলে এককাজ করা যাক, তুমি আমাদের সাথে চলে এসো। আমাদের ওখানে বহু কিছু আছে, বিজলি বাতি আছে, ফ্যান আছে, ঠাণ্ডা পানি আছে, এখানকার মতো এতো গরম নেই সেখানে। তুমি যদি আমাদের সাথে যাও, তাহলে তোমাকে আমাদের সন্তানের মতো করে রাখবো, আমাদের কাছে সুন্দর থাকার জায়গা পাবে, পোশাক-আশাক পাবে, সুন্দর সুন্দর খাবার পাবে। তোমার জীবন চলার জন্যে যা যা দরকার, তাই তাই পাবে। এমনকি সুন্দরভাবে পড়ালেখাও করতে পারবে...। যাবে আব্বু আমাদের সাথে? চলো...!

সে খুব মনোযোগের সাথে আমার স্ত্রীর সব কথা শুনে যায়। আমার স্ত্রী আবার যখন বলে, যাবে বাপু? দেখবে সেখানে অনেক আনন্দে বহু সুখে থাকতে পারবে। এমন সময় সেই ছোট্ট শিশুটি সজল চোখে কাবাশরিফের দিকে ইশারা করে বলে, কিন্তু আপনাদের ওখানে কি এই ঘর আছে? আচমকা এমন প্রশ্নে আমার স্ত্রী থতোমতো খেয়ে বলে, না, নেই, এই ঘর সেখানে নেই। তখন শিশুটি চঞ্চল হয়ে বলে ওঠে, যদি সেখানে এই ঘর না থাকে, তাহলে আমার সেখানে যাওয়ার কোনোই দরকার নেই। চাই সেখানে যতোকিছুই থাকুক না কেনো? সোবহানাল্লাহ!

বলছিলাম আগের যুগে রাস্তা কাঁচা ছিলো; কিন্তু মুসাফির/পথিক (হাজিরাই) ছিলো পাকা। আর এখন রাস্তাঘাট সবকিছু পাকা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু মুসাফির (হাজিরা) হয়ে গেছেন কাঁচা। তাই আমরাও এখানে এসে সেই যুগের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবো। আমরা যা কিছুই চাবো, আল্লাহর তরফ থেকে তা-ই পাবো। আমরা এখন জীবনের সেরা সময় কাটাচ্ছি। পার করে দিচ্ছি।

কীভাবে কাটছে আমাদের সময়?

হজরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] ছিলেন একজন বিশ্বখ্যাত বুজুর্গ। তিনি একবার পবিত্র কাবা তাওয়াফ করছিলেন, এমন সময় তৎকালীন শাসকের সাথে দেখা হয়ে যায়। শাসক মহোদয় তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, আচ্ছা হুজুর! আমি আপনার কী খেদমত করতে পারি? আপনার কিছু চাওয়ার থাকলে সঙ্কোচহীনভাবে বলতে পারেন, আপনার প্রত্যাশা পুরো করা হবে।

হজরত সালেম [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, দেখো! আমি এখন হারামশরিফে আছি। হারামশরিফে বসেও কি আপনার কাছে চাইবো? আমি তো এখন হারামের মালিকের কাছে চাইবো। فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ (তারা যেনো এই

ঘরের প্রভুর এবাদত করে); কিন্তু এখন যার নিজ ঘরে অবস্থান করছি, সেখানে থেকে অন্যকারও কাছে কোনো কিছু কীভাবে চাইতে যাবো? একজনের বাড়ি গিয়ে অন্যজনের কাছে চাওয়াটা কি শোভনীয়?

শাসক সাহেব আর কিছু না বলে চুপ হয়ে যান। এরপর তাওয়াফ শেষে তিনি বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন।

হজরত সালেম [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বাইরে এলে তিনি আবার বলেন, আচ্ছা, এখন তো আমরা আল্লাহপাকের ঘরের বাইরে চলে এসেছি, এখন বলুন, আমি আপনার কী উপকার করতে পারি? হজরত সালেম [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, আচ্ছা তার আগে আগে বলুন, আমি আপনার কাছে দীন সম্পর্কে কিছু চাইবো, না-কি দুনিয়া সম্পর্কে কিছু চাইবো?

তিনি দীনের বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন না। সেটি অবধারিত ছিলো। কারণ, সময়ের সেরা বুজুর্গকে তিনি কী আর বলবেন, এক্ষেত্রে তার উপমা তো তিনি নিজেই। তাই তিনি বলেন, না, দীনিবিষয়ে নয়; আপনি আমার কাছে দুনিয়ার কোনো কিছু চাইতে পারেন। তখন হজরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] খুবই শান্তভাবে বলেন, আপনার এমন সৎউদ্দেশ্যের জন্যে ধন্যবাদ, তবে শুনুন, যে মহান আল্লাহপাক এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহপাকের কাছেই আমি গোটা জীবনে কখনও দুনিয়ার কোনো কিছুই চাইনি, সেখানে আজ আমি আপনার কাছে দুনিয়ার ব্যাপারে কী চাইতে যাবো?

প্রিয়সুধী! দেখুন আমাদের আগের বুজুর্গানেকেরাম এভাবেই আসতেন, এসে বায়তুল্লাহশরিফে নিজের সময় কাটতেন এবং আল্লাহপাকের অনুগ্রহ আঁচলে ভরে নিতেন। ভাগ্যের ফয়সালা করিয়ে নিতেন। এজন্যে তারা যখন আসতেন, তখন তাদের এক একটি সফরের কারণে শতো শতো হাজার হাজার মানুষ কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যেতেন। অথচো আমরা আজ ওমরা করতে এসেও খাঁটি আর পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হয়ে ফিরতে পারি না!

کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا

[কা'বাহ ভী গায়ে পর নাহ গিয়া ইশক বুতোঁ কা]

زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی

[যমযম ভী পিয়া পর নাহ বুঝী আগ জিগার কী]

কাবায় যেয়ে হয়নি মলিন
ওই পাথরের প্রেম
কোন বা মুখে খোদার সনে
করবে তবে প্রেম!

জমজমের ওই অমৃত পিয়ে
মেটে না যার আশ

কেমন করে মনের আগুন
নেভার করে আশ!

অর্থাৎ, জমজমের পানিও পান করে, আবার পার্থিব প্রেমে জড়িয়ে পরার ফলে তার কলিজায় শয়তানি আগুন লেগে থাকে, যা কখনও নেভে না। এ কারণে রিপুর ওপর আবার ছড়ি ঘুরাতে হয়। এখানে এসে নিজের রিপুকে জবাই করে দিতে হয়। রিপু ও বাসনাকে জবাই করতে হয়। সেই সাথে অঙ্গীকার করতে হয় এই বলে, হে খোদা! আমি লাত মানাত ওজ্জাকে চূর্ণ করে দিয়েছি।

تَرَكْتُ الَّاتَ وَ الْعُزّٰى جَمِيْعًا

[তারাকতু ইল্লাতা ওয়ালয্‌যা জামীআন]

كَذَالِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيْرُ

[কাযালিকা ইয়াফআলুর রজুলুল বাসীরু]

লাত ও মানাত ত্যাগ করেছি
ত্যাগ করেছি ওজ্জাকেও
জ্ঞানের ভারে ঋদ্ধ যারা
ত্যাগ করেছে নফসটাকেও।

এমন সুন্দর অবস্থায় আমরা আল্লাহপাকের ঘর তাওয়াফ করবো, এরপর দু'হাত তুলে মোনাজাত করবো। তখন দেখতে পাবেন, দয়াময় আল্লাহ কীভাবে সব রাস্তা খুলে দেন। আমরা দিনে রাতে তাওয়াফ চালিয়েই যাবো।

এখন আরেকটি জিনিস মনে রাখবেন, তাওয়াফ ডান দিক থেকে শুরু করে বাঁ দিকে শেষ করতে হয়। আপনি যদি আরো খেয়াল করেন, তবে দেখতে পাবেন, সহজাত নিয়মও এমনই যে, জমিন তথা পৃথিবী যে ঘুরে চলেছে, সেটিও ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরে চলেছে, পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। যার কারণে সূর্য পূর্বদিক থেকে উদয় হয়।

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, প্রতিটি ভালোকাজই ডান দিক থেকে শুরু করবে। এ কারণে মজলিসে যদি অনেক মানুষ হাজির থাকে, তাহলে প্রথমে ডান দিকে যে থাকবে, তাকে আগে পানি পান করাবে, এরপর তার ডানের জনকে। এভাবে বাঁ দিকে এগিয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহপাক ডান পাশকে বেশি পছন্দ করেন।

তাওয়াফের ক্ষেত্রেও আমরা এভাবেই কাজ করবো। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে এগুতে থাকবো। তাই বলা হয়, এটি একটি সহজাত ব্যাপার! সেই সাথে আরো মনে রাখবে, তাওয়াফ চলাকালে আমরা আল্লাহপাকের কাছে বিশেষভাবে দোয়া করবো।

যে দোয়াই করা হোক, তা আল্লাহপাকের দরবারে পৌছে যাবে। বায়তুল্লাহশরিফের দরোজার কাছে গিয়ে মোনাজাত করবে–"হে আল্লাহ! আমি তোমার একজন ফকির, তোমার দরবারে হাজির হয়েছি! হে আমার মাওলা! অনেক দূর থেকে বহু আগেই হাজির হয়েছি! হে আল্লাহ! আমি অনেক দূর থেকে চলে এসেছি। অনেক দেরিতে এসেছি।"

گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کر اسے پایا
[গার পড় কে এহাঁ পঁহচা মর মর কর উসে পায়া]

چھوٹے نا الٰہی اب سنگ در جاناں نا
[ছূটে না ইলাহী আব সঙ্গে দর জানা না]

تمہیں سے مانگیں گے تمہیں دوگے
[তুমহেঁ মাঙ্গেঁ গে তুমহী দুগে]

تمہارے در سے ہی لو لگی ہے
[তুমহারে দর সে হী লও লাগী হায়]

হোচট খেয়ে কতোখানে
এলাম তাঁরি কাছে
জীবন দিতে তাঁর নামেতে
এলাম তাঁরি কাছে।

তোমার কাছেই চাই যে খোদা
দেবার মালিক তুমি
চাইলে কেউ তোমার দ্বারে
পূর্ণ করো তুমি।

হে আল্লাহ! সেই দরোজা ধরেছি। এখন আর তা ছাড়তে মনে চাচ্ছে না। এখন শুধু তোমার দরোজার দিকেই ঝুকে থাকবো। হে আল্লাহ! তোমার কাছেই চাইবো আর তুমিই আমাদেরকে দান করবে। তাই শুধু তোমার দরোজাতেই লেগে থাকবো।

মোটকথা, আমরা আল্লাহপাকের ঘরে হাজির হয়ে তাওয়াফ করবো এবং আল্লাহপাকের কাছে চাইবো। আর তাওয়াফের সময় চোখের হেফাজত করবো। দৃষ্টি নিচু রাখবো। এমন কি পর নারীর কাপড়ের দিকেও তাকাবো না। তাদের শরীর আর মুখের দিকে নজর দেয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার।

এভাবে একটি বিশেষ অবস্থায় দুনিয়ার সবকিছু থেকে নজর সরিয়ে একমাত্র আল্লাহপাকের দিকে মনোযোগী হয়ে তাওয়াফ করবো। আল্লাহপাকও পছন্দ করেন যে, আমার বান্দা এদিক ওদিক মনোনিবেশ করার পরিবর্তে আমার দিকেই আকৃষ্ট রয়েছে।

নারী-পুরুষ সম্মিলিত তাওয়াফ কেনো?

মাঝে মধ্যে একটি খেয়াল মাথায় এসে ভর করতো, শরিয়ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের মাঝে কিছু ব্যবধান রেখেছে, যে কারণে পুরুষের জায়গায় পুরুষ আর নারীর জায়গায় নারী থাকবে। নারী-পুরুষ শুধু তখনই একত্রে সমবেত হতে পারবে, যখন তাদের মাঝে রক্তের সম্পর্ক থাকবে। এ কারণেই নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে পর্দার ফরজ বিধান দান করা হয়েছে। এমন কি ফরজ নামাজের সময়ও নামাজের জামাতের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কাতারে ব্যবধান রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যার কারণে বলা হয়েছে, পুরুষদের কাতার থাকবে সামনে আর নারীদের কাতার হবে পেছনে। পবিত্রহাদিসে এসেছে, হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] নামাজ শেষ করে কিছুসময় জিকির-আজকার (তাসবি) করতেন। যাতে করে মহিলারা তাদের জন্যে নির্ধারিত পেছনের দরোজা দিয়ে ততোক্ষণে সবাই মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে পারেন, এরপর পুরুষেরা বের হয়ে যেতেন, নারী-পুরুষ একসাথে বের হওয়াটাও হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] পছন্দ করতেন না। মসজিদেনববিতে মহিলাদের জন্যে 'বাবুননিসা' (মহিলা গেট) তৈরি করার পর নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, পুরুষরা যদি (এই গেট বাদে) অন্যগেট দিয়ে যাতায়াত করতো? হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] একথা শোনার পর থেকে তিনি আর কোনোদিনই সেই মহিলা গেটে পা দেন নি। এমন কি সাধারণ সময়ে মহিলা না থাকা অবস্থাতেও নয়। যদিও সেই দরোজাটি বেশ কাছেই ছিলো। তাঁরা এসব ক্ষেত্রে এমন খেয়াল রাখতেন!

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, পথ চলার সময় পুরুষেরা মাঝপথ বেয়ে চলবেন আর নরীরা চলবেন পথের কিনারা ঘেষে, একদম পাশ দিয়ে।

মহিলা সাহাবিরা বলতেন, এই নির্দেশের পর আমরা এমনভাবে রাস্তার পাস ঘেষে চলতাম, যাতে করে মাঝে মধ্যেই পাশের দেয়ালের সাথে (বাঁ পাশের গাছের কাটা/ডালের সাথে) আমাদের কাপড় (বোরকা) বা পোশাক আটকে যেতো। তার মানে আমরা দেয়াল ঘেষে চলতাম, নারী-পুরুষরা আলাদা আলাদা হয়ে পথ চলতেন।

তো জীবনের অন্যসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের যেসব নিয়ম ও বিধান রয়েছে, সেই বিধান তাওয়াফের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়া দরকার ছিলো, যার সূত্র ধরে বলা হতো, নারী-পুরুষ সবাই আলাদাভাবে তাওয়াফ করবে। এজন্যে প্রয়োজনে পুরুষরা তাওয়াফ করবে দিনের বেলায় আর মহিলারা করবে রাতের বেলায়; কিন্তু না, প্রজ্ঞাময় আল্লাহপাক এভাবে সময় ভাগ করে দেননি, আবার কোনো

জায়গাও ভাগ করে দেননি। ব্যস, নামাজের সময় না হলে। যদি ফরজ নামাজ হয়, তাহলে নামাজ পড়া ভালো। তাছাড়া সবসময় নারীরা চাইলেও তাওয়াফ করতে পারেন, আবার পুরুষরাও পারেন। তবে ফেকাহবিদরা লিখেছেন, মহিলারা পাশ ঘেষে তাওয়াফ করবেন আর পুরুষরা তাওয়াফ করবেন মাঝখান দিয়ে; কিন্তু তাওয়াফ সবসময়ই চলতে পারে, তা মহিলারা করুক বা পুরুষরা করুক।

এই তাওয়াফের ক্ষেত্রে আল্লাহপাক সেই পার্থক্য কেনো করলেন না এই প্রশ্নটা আগে আমার মনের ভেতর বার বার ঘুরপাক খেতো; কিন্তু পরবর্তীতে এর রহস্য খুলে গেছে, বুঝে এসেছে এমন ব্যবস্থা রেখে দেয়ার গভীর ও সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য।

প্রথম ব্যাপার বা কারণ হচ্ছে, এটি হারামশরিফ, নিষিদ্ধ ও সংরক্ষিত এলাকা। যার কারণে এটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ সম্মানী এলাকা, তেমনি স্পর্শকাতরও বটে। অন্যযেকোনো জায়গায় কোনো পাপকাজের নিয়ত বা সংকল্প করলেও সেজন্যে পাপ হয় না, তা বাস্তবায়ন করার আগ পর্যন্ত; কিন্তু এই কাবাচত্তরে কেউ পাপ কাজের সংকল্প করলেই সাজা পাওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হয়ে যায় সে। আল্লাহপাক পবিত্রকোরআনে ঘোষণা করেছেন–

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

“আর যে এই হারামশরিফে কোনো পাপ-জুলুম কাজের ইচ্ছে করবে, আমি তাকে বেদনাদায়ক সাজা ভোগ করাবো।”

[যেহেতু অন্যসব জায়গায় পাপের সম্পর্ক দেহের সাথে তা বাস্তবায়ন করা না করার ওপর, তাই সেখানে দৈহিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আর হারামশরিফে পাপ হওয়া নির্ভর করে নিয়তের ওপর, তাই এখানে দৈহিক বিষয়টাকে গণ্য করা হয়নি। মনের ব্যাপারটাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বলে এমন একসাথে তাওয়াফ অনুমতি দেয়া হয়েছে।]–অনুবাদক

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, আসলে আল্লাহপাক এটা চাচ্ছিলেন, নারী-পুরুষ যে-ই হোক, তারা আমার ঘর তাওয়াফ করতে এসে আমার ভালোবাসার সাগরে এমনভাবে ডুবে যাবে, যার কারণে তাদের একে অন্যের দিকে খেয়ালই থাকবে না। সব আকর্ষণ আমার দিকেই নিবদ্ধ থাকায় তারা অন্যকিছুর আকর্ষণ অনুভবই করতে পারবে না।

رخ زیبا کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں

[রুখ যীবা কে আগে শামা' রাখ কর ওহ এহ কাহতে হেঁ]

ادھر آتا ہے یا دیکھیں ادھر جاتا ہے پروانہ

[ইধার আতা হায় ইয়া দেখেঁ উধার জাতা হায় পরওয়ানাহ]

জ্বালিয়ে বাতি করছো পরখ

পতঙ্গটার হাল
ওই অভাগা বুঝবে কী আর
তোমার ওসব চাল?

মহান আল্লাহপাকও এমনটিই করে রেখেছেন, তিনি একটু পরখ করে দেখতে চান, তাঁর বান্দা-বান্দির মন কোনদিকে যেতে চায়? সৃষ্টির দিকে? না-কি স্রষ্টার দিকে? তারা আমার ভালোবাসার দাবি করে এসছে, আমার ভালোবাসার সন্ধানে এসছে, এখন সেজন্যে একদম আমার বাড়িতেই, আমার ঘরেই চলে এসেছে, আমি এখন তাদেরকে টেস্ট (পরীক্ষা) করে দেখবো, এসো একটু তাওয়াফ করো আর দুই শ্রেণীই একসাথে তাওয়াফ করিয়ে দেখিয়ে দাও, তোমাদের একে অন্যের দিকে কোনো টান বা আকর্ষণ নেই, সব আকর্ষণ শুধু আমাকে কেন্দ্র করেই।

আসলে বাস্তবতাও এমনই। সাধারণভাবেই কাবাশরিফ দেখার পর সেখানে তাওয়াফ করতে গেলে পুরুষ তার পৌরুষত্ব ভুলে যায়। নারীরা ভুলে যায় তাদের নারিত্বের কথা, জৈবিক তাড়না। আমি দেখেছি, তাওয়াফ করার সময় পুরুষরা যেভাবে হেচকি দিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে, একই অবস্থা বিরাজ করে নারীদের মাঝেও। তারাও কান্নায় ঝার ঝার হয়ে যায় স্বভাবসুলভভাবে। চোখ দিয়ে বইতে থাকে অশ্রুধারা। পুরুষদেরও বুক ভেসে যায় কান্নার প্লাবনে। পুরুষরা বলতে থাকে–ইয়া রব! ইয়া রব!! নারীরাও বলতে থাকে–ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ!!

দু-ই যখন ছটফটিয়ে আল্লাহপাকের কাছে আবেদন জানায়, প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদেরকে এই দৃশ্য দেখিয়ে বলেন, তোমরা তো বলেছিলে এরা দুনিয়াতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে। রক্তপাত ঘটাবে। আজ একটু আমার সেই বান্দাদের দিকে খেয়াল করে দেখো, সেখানে নারীও আছে, পুরুষও আছে, তাদের দৈহিক জৈবিক সবধরনের চাহিদাও বিদ্যমান আছে, একজনের মন অন্যজনের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার সব উপকরণও রয়েই গেছে; কিন্তু না দেখো, এখানে পুরুষরা তাদের পৌরুষত্ব ভুলে গেছে আর নারীরা ভুলে গেছে তাদের নারিত্বের কথা, পুরুষদের আকৃষ্ট করার মানসিকতা, তাদের অন্তরে আমার ভালোবাসা এমনভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছে, যার কারণে সবাই শুধু আমার প্রেমে মগ্ন হয়ে শুধু আমাকেই ডেকে চলেছে–দেখো, পুরুষরা যেভাবে আমার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে কান্নাকাটি করছে, নারীরাও কান্নায় ভেঙ্গে পরছে আমার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে। এটি আমার প্রেমিকের মিলনমেলা, আশেকদের সমাবেশস্থল।

একে অন্যের দিকে মানবিক প্রেম-ভালোবাসা তো দূরের কথা, মূলত এরা আমার প্রেমে মগ্ন হয়ে আমার ভালোবাসার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, এরা এখানে এসে তার প্রমাণ দেখিয়ে দিচ্ছে।

আল্লাহপাক এই দৃশ্য হয়তো ফেরেশতাদের দেখিয়ে বলছেন, দেখো মানবজাতি এজন্যেই সৃষ্টির সেরা।

আমার সেই বান্দারা এমন যে, তারা চোখ তুলে অন্যের দিকে তাকাতে পারলেও তা না করে মাথা নুয়ে থাকে, দৃষ্টি নিচু রাখে আর তাদের হৃদয় জড়িয়ে রাখে আমার সাথে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে–

رَبِّ اغْفِرْ رَبِّ اغْفِرْ

"হে খোদা! আমাকে ক্ষমা করে দাও, হে প্রভু! আমাকে মাফ করে দাও।" তারা মনে করে, শুধু আমিই তাদের পালনকর্তা। এতে ভীষণ খুশি হয়ে আল্লাহপাক তাদেরকে এই তাওয়াফের কারণে নিজের ভালোবাসার চাদরে ঢেকে নেন আর সবার অতীতের সব পাপ মাফ করে দেন।

আত্মিক ওয়াশিং মেশিন

এই তাওয়াফের আমলটা এক আশ্চর্য আমল। আগের যুগে বিষয়টা স্পষ্টভাবে বুঝতে একটু কষ্ট হতো; কিন্তু আজকের এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে সবকিছু বোঝা অনেক সহজ হয়ে গেছে। আগে সবাই নিজ হাতে ময়লা কাপড় পরিষ্কার করতো, এখনও করে, তবে তার আরও সহজ প্রযুক্তি বের হয়েছে। এখন ময়লা কাপড়-চোপড় মেশিনের ভেতর দিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তা একদম ধবধবে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসে, যাকে বলে ওয়াশিং মেশিন। ঠিক এভাবে পবিত্র কাবাশরিফও একটি বিশাল ওয়াশিং মেশিনের মতো, পাপে জর্জরিত বান্দারা এসে সেখানে সাতটি চক্কর দেয়ার (তাওয়াফ করার) পর তার বরকতে আল্লাহপাক তাকে পরিষ্কার (পাপমুক্ত) করে বের করে দেন। অন্তরের জন্যে এটি একটি আত্মিক ওয়াশিং মেশিন তৈরি করে রেখেছেন। তিনি বলে দিয়েছেন, তোমাদের অন্তর অপরিষ্কার হয়ে গেলে এখানে এসে তা ওয়াশ করিয়ে নিয়ে যাবে আর সেই ওয়াশ করার নিয়ম হচ্ছে, আমার এই পবিত্র ঘরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে তাওয়াফ করা। সেজন্যে বেশি ওয়াশ করার দরকার নেই। মাত্র সাতবার ওয়াশ করলেই চলবে, যা কয়েক মিনিটেই সম্পন্ন করা সম্ভব।

মহান আল্লাহপাক আমাদেরকে খাঁটি ভালোবাসা দিয়ে সুন্দরভাবে তাওয়াফ করার সুযোগ দিন! আমিন!!

امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ

[উমীদেঁ লাখো হেঁ লেকীন বড়ী উমীদ হায় ইয়েহ্]

کہ ہو سگانِ مدینہ میں نام میرا شمار

[কেহ হো সেগানে মদীনাহ মেঁ নাম মেরা শুমার]

جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں

[জিয়োঁ তু সাত সেগানে হারাম কে তেরে ফেরোঁ]

مروں تو کھائیں مدینے کے مجھ کو مور و مار

[মুরোঁ তু খায়েঁ মদীনে কে মুঝ কো মূর ও মার]

اڑا کے باد مری مشت خاک کو پس مرگ

[উড়া কে বাদ মেরী মুশতে খাক কো পছ মুরগ]

اڑے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار

[উরে হুযূর কে রওজাহ কে আস পাস নেছার]

সবার মনে কতো আশা
একটি আশা মোর
ওই মদিনার মাটির কোলে
কাটবে আমার ভোর।

থাকলে জীবন ওই মদিনার
হাঁটবো কুকুর হয়ে
সাপ-বিচ্ছুর খোরাক হবো
মাটির নিচে শুয়ে।

ধূলো জ্ঞানে বাতাস তুমি
যাও মদিনা নিয়ে
প্রাণ হাদিয়া দেবে সেথা
এ অভাগা গিয়ে।[১]

---

১. হুজ্জাতুলইসলাম কাসেম নানুতভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর কবিতাংশ। শায়খুলহাদিস জাকারিয়া কান্ধলভি মোহাজিরেমাদানি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর 'ফাজায়েলে দরুদশরিফ' কিতাব থেকে নেয়া।

বায়তুল্লাহ দেখার আকাঙ্ক্ষা

কল্পনার চোখে বায়তুল্লাহ দেখা

আমার শৈশবের স্মৃতি আজও মনে পরে। শিশুকালে আমার সম্মানিত আম্মাকে খেয়াল করতাম, তিনি প্রতি নামাজ শেষে তাসবি-তাহলিল পড়ে হাতে থাকা তাসবিটির দিকে একচোখ বন্ধ করে তাকিয়ে থাকতেন। তার এমনভাবে তাকিয়ে থাকা দেখে আমিও বায়না ধরতাম আমাকেও তা দেখাতে, যা তিনি দেখেন। তিনি সেটি আমার চেখের সামনে এগিয়ে ধরে দেখাতেন। সেই তাসবিটির সাথে ছোট্ট, মানে অতিক্ষুদ্রাকৃতির কাবাশরিফের ছবি ছিলো। যা একচোখ বন্ধ করলেই শুধু দেখা যেতো। তাই আম্মা সেভাবেই দেখতেন। আমিও দেখতাম; কিন্তু সেটি কিসের ছবি? তা বোঝার মতো বয়স আমার ছিলো না। শুধু মা বলতেন, সেটি কাবাশরিফের ছবি। আমি তাই শুনে ক্ষান্ত থাকতাম, তবে এতোটুকু বুঝতাম, সেটি মসজিদের মতো কিছু একটা জিনিস।

আমার আম্মার হৃদয়ের একব্যাকুলতা ও তীব্র আকাঙ্খা ছিলো, তিনি তার কল্পনার চোখ দিয়ে বহুদূরে বসেও রোজ বায়তুল্লাহশরিফ দেখতেন আর দোয়া করতেন, যেনো আল্লাহপাক তাঁর ঘরে পৌছার সহজ উপায় করে দেন। সে সময় আমাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমনটি ছিলো না, যাতে করে তিনি কাবাশরিফ (হজে) যেতে পারেন। অবশেষে ভালোবাসা ও বায়তুল্লাহ প্রেমের টান অনেক কিছুর রঙ বদলিয়ে দেয়। দয়াময় আল্লাহপাক তাঁর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। যার জন্যে খুলে দেন তাঁর রাস্তা। যখন বায়তুল্লাহশরিফ সরেজমিনে দেখেন, তখন স্বার্থক হয়ে দেখা দেয় গোটা জীবন কল্পনার চোখে তা দেখার ব্যাকুলতা, অস্থিরতা ও তীব্র আকাঙ্খা। তাই যাদের কল্পনার চোখ কাবাশরিফ দেখায় যতো বেশি ব্যাকুল অস্থির আর আকাঙ্খা থাকবে, আল্লাহপাক তার জন্যে বাস্তবে দেখা পাবার দরোজা ততো দ্রুতো খুলে দেবেন, সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেবেন গায়েবিভাবে।

একগোয়ালার বায়তুল্লাহপ্রেম

হজরত মাওলানা ইদরিস কান্দলভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] ছিলেন জামেয়া আশরাফিয়া (মাদরাসার) শায়খুলহাদিস। সেই সাথে তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মোফাসসির বা তাফসিরকারক এবং খুবই আল্লাহঅলা বুজুর্গ।

তিনি একগোয়ালার বায়তুল্লাহপ্রেম নিয়ে একটি হৃদয়গ্রাহী মর্মস্পর্শী বিস্ময়কর কাহিনী শোনাতেন। গোয়ালা মানে গরু/মহিষের দুধ দোহন ও সংগ্রহকারী। কান্দলভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, লাহোরে একনওজোয়ান গোয়ালা ছিলো। তার মনে প্রচণ্ড আকাঙ্খা ছিলো সে বায়তুল্লাহশরিফ বা আল্লাহর ঘর দেখবে; কিন্তু তার কাছে সেখানে যাওয়ার মতো কোনো উসিলা বা মাধ্যম ছিলো

না। সবসময় সে কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হয়ে আল্লাহপাকের কাছে দোয়া করতো। হজের মৌসুম আসতো, আবার শেষ হয়ে যেতো; কিন্তু তার হৃদয়ের অস্থিরতা ব্যাকুলতা আর আকাঙ্খ্যা তীব্র করে তুলতো। প্রতিবছর তার আকাঙ্খা আরও বেড়ে যেতো আগের বছরের চেয়ে।

একবার সে দৃঢ় সংকল্প করে বসে, ছলে বলে কায়দা কৌশলে যেভাবেই হোক মক্কাশরিফে যাবেই যাবে; কিন্তু তার কাছে ভিসা পাসপোর্ট বা অন্যকোনো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কিছুই ছিলো না। তখনও আকাশপথে হজে যাওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়নি, নৌপথেই একমাত্র যানবাহন ছিলো। 'সাফিনাতুলহাজ্জাজ' নামে একটি নৌজাহাজ তখন করাচি থেকে জেদ্দা পর্যন্ত হাজিদের বয়ে নিয়ে যেতো। দেশের বেশিরভাগ লোকের জানা ছিলো না হজের জাহাজ কোথা থেকে ছেড়ে যায়। তারপরও সেই গোয়ালা যুবক যাকে সামনে পায়, তাকেই জিজ্ঞেস করে–কোথা থেকে কোন পথে হজে যাওয়া যায়? কিন্তু কেউই তাকে সঠিক উত্তর দিতে পারে না। তবুও সে নাছোড় বান্দা, যাকেই পায়, তাকেই জিজ্ঞেস করতেই থাকে। অনেকে না জানার কারণে বলে, জানি না। আবার অনেকে তাকে পাগল মনে করে ঝামেলা এড়ানোর জন্যে জানি না বলে দ্রুতো কেটে পরার চেষ্টা করে।

এভাবে একে ওকে তাকে জিজ্ঞেস করতে করতে একপর্যায়ে এসে একলোক বলে, মিয়া, লাহোর রেলস্টেশন থেকে করাচিতে ট্রেন যায়। তাতে ওঠে করাচি যেতে হবে। সেখান থেকে জেদ্দার নৌজাহাজ চলাচল করে। জেদ্দা থেকে মক্কা শহরে যেতে হবে স্থানীয় বাহনে করে।

একথা শোনামাত্রই সে ছুটে চলে লাহোর রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে; কিন্তু সেখানে এসে সে আরও বেশি বিপাকে পরে যায়; সবই শুধু অচেনা মুখ, অচেনা জায়গা। সবাই খুব ব্যস্ত; তবুও হাল না ছেড়ে একইভাবে একবার এ প্লাটফর্মে, আবার আরেক প্লাটফর্মে ছুটাছুটি করতে থাকে আর যাকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পায়, তাকেই বলে, ভাই, আমি করাচি যাবো কীভাবে? সবাই তাকে যে উত্তর দেয় তাতে তার কোনো কাজ হয় না। কারণ, তার কাছে যে টিকিট কাটার মতো কোনো টাকা নেই। এভাবে প্লাটফর্মেই কেটে যায় কয়েকদিন। কোনোই ব্যবস্থা করতে পারে না সে। প্রবাদ বলে, 'খালি হাতে তালি বাজে না।' তবে তার হাত খালি হলেও যেহেতু হৃদয় ছিলো কাবাপ্রেমে ভরা, তাই সেটিকে সম্বল করেই সে দৌড়ঝাঁপ করতে থাকে। একবার এদিক, আবার ওদিক। শুধু পাগলের মতো ছুটাছুটি করতে থাকে।

খুব গভীরভাবে খেয়াল করে একজন রেলওয়ে গার্ড তার প্রতি কিছুটা দয়া পরবশ হয়ে কাছে ডেকে তার এমন করার কারণ জানতে চায়, সে সবকিছু সংক্ষেপে

বলে দেয়। তাতে তার মন গলে যায়। এরপর বলে, দেখো, যেহেতু টিকিট নেই, তাই আমি তোমাকে যাত্রীবাহী বগিতে করে নিয়ে যেতে পারবো না, যদি আমার সাথে এই মাঝের ছোটো জায়গাটুকুতে কষ্ট করে যেতে পারো, তবে আমার সাথে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। 'খিদে পাওয়া লোকের আবার রুটিতে ঘি?' সে বলে, ঠিক আছে, যেভাবেই হোক, শুধু যেতে পারলেই হলো। তারপর অন্যের জন্যে খুবই কষ্টকর হলেও সে তা মনে না করে পৌঁছে যায় সাধের করাচিতে; কিন্তু এখানে এসে আরও বেশি বেকায়দায় পরে যায়। সবকিছু একেবারেই অদেখা, অচেনা, তবে চেনা শুধু হৃদয়ে আঁকা কাবার ছবিটি। এখানেও একই কায়দায় তার কিছুটা ইতস্ততভাবে যাকে মনে সায় দেয়, তাকে জিজ্ঞেস করে–আমি হজে যেতে চাই, কোন পথে কীভাবে যাওয়া যাবে? এখান থেকে অনেকেই তার চেহারাসুরত দেখে মনে করে, হয়তো মাথায় সমস্যা আছে, তা না হলে এভাবে বলবে কেনো? আস্তে করে কেটে যায়। এড়িয়ে চলে। এভাবে চলতে চলতে একভদ্রলোক তাকে জানায়, 'মদিনাতুলহুজ্জাজ' নামে একটি জায়গা আছে, সেখান থেকে সবাই হজ করতে যায়। সেখানেই হজের সব কাগজপত্রের ব্যবস্থা করতে হয়।

কিন্তু সেখানে যাবে কীভাবে? একে বলে, ওকে বলে সে কীভাবে ওখানে যাবে? সবাই যেসব উত্তর দেয়, সেগুলো এতোদিনে তার জানা হয়ে গেছে; কিন্তু তার যে সমস্যা, সেটা তো জানে না তারা। তবুও আশা না ছেড়ে সে চিন্তা করে, এতোদূর যখন আসতে পেরেছি, তখন বাকিটুকুর ব্যবস্থাও আল্লাহপাক করে দেবেন নিশ্চয়ই; সেই আশায় বুক বেঁধে সে ছুটাছুটি করতে থাকে। আল্লাহপাকের বিশেষ মেহেরবানিতে তার ওপর নজর পড়ে যায় কয়েকজন ভদ্রলোকের। তারা তাকে কাছে ডেকে সব শুনে বলেন, ঠিক আছে, দুঃশ্চিন্তা করো না, আমাদের গাড়িতে একটি সিট খালি আছে, আমরা ওদিক দিয়েই যাবো। তুমি গাড়িতে ওঠে বসো।

তারা তাদের নিজস্ব গাড়িতে করে তাকে 'মদিনাতুল হুজ্জাজ'-এর পাশে নামিয়ে দিয়ে যান। সেখানে লোকে লোকারণ্য। প্রায় সবার উদ্দেশ্য একই, হজে যাওয়া ও তার জন্যে কাগজপত্র তৈরি করা, প্রস্তুতি নেয়া। কারণ, পাসপোর্ট, ভিসা, টিকিটসহ সবকিছু সেখানেই পাওয়া যায়। সবকিছু সম্পন্ন হয়ে গেলে সোজা জাহাজে চড়ে বসে। সে সবাইকে বলতে থাকে, আমিও যাবো, আপনারা আমাকে সাথে নিয়ে যান। অনেকে যার যার মতো করে চলে যায়। কেউ আবার একটু দয়া পরবশ হয়ে বলে, ঠিক আছে, আমাদের সাথে যেতে পারবে, তবে কাগজপত্র চূড়ান্ত করেছো? পাসপোর্ট আছে? ভিসা আছে? টিকিট কেটেছো? কাগজপত্র করার টাকা আছে? না, কিছুই নেই। সামানপত্র? না, তাও নেই।

একদম খালি হাত, কিছুই নেই; তবে কোথায় যেতে চাও? আল্লাহর ঘর দেখতে যেতে চাই, সেও আস্তে করে কেটে পরে, পা বাড়ায় নিজ গন্তব্যে। তবে যারা তার কথা শুনে, তারা সবাই অবাক বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। চিন্তা করে, এই যুবক বলে কী? কীভাবে যাবে সে মক্কাশরিফে?

কিন্তু খোদার প্রেমে বিভোর নওজোয়ানের প্রবল আশা, সে যেভাবেই হোক আল্লাহর ঘর দেখতে যাবেই!

তারপর সে নৌবন্দরের ভেতরে চলে যায়। একপাশে দাঁড়িয়ে খেয়াল করে, সবাই অফিসারদের কাগজপত্র দেখিয়ে সোজা জাহাজে ওঠে যাচ্ছে। আর ইউনিফর্ম পরা কুলিরা তাদের মালপত্র নিয়ে জাহাজে তুলে দিয়ে আসছে; কিন্তু তাদের কেউ কিছুই জিজ্ঞেস করছে না, তারা মাল সামানা নিয়ে জাহাজে উঠছে নামছে। এটি দেখে তার মাথায় একটি পরিকল্পনা চলে আসে। একজন কুলির সাথে ধীরে ধীরে ভাব জমিয়ে তুলে। তাকে বলে, ভাই, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আপনার ইউনিফর্মটা আমাকে দিন, আমি আপনার তরফ থেকে মালপত্র জাহাজে তুলে দেয়ার ডিউটি পালন করি, আপনি এখানে বিশ্রাম করেন। সে ভাবে, প্রস্তাবটি মন্দ নয়, এতে করে গতরটা একটু বিরাম পাবে।

গোয়ালা ইউনিফর্ম পরে হয়ে যায় জবরদস্ত কুলি। মালপত্র নিয়ে চলতে থাকে। তার জাহাজে আসা যাওয়ার পালা। এতোক্ষণে খুব ভালোভাবে পরখ করে নেয় জাহাজের কোন এলাকা কতোটা নিরিবিলি, কোন এলাকায় কর্তৃপক্ষের লোকজনের কেমন আনা গোনা। একপর্যায়ে সে আসল কুলিকে বলে, ভাই, আমি যেহেতু এই জাহাজেই চলে যাবো, তাই তার আগে আমি যদি অন্যকারও মাধ্যমে আপনার ইউনিফর্মটা পাঠিয়ে দিই, তাহলে কি সমস্যা আছে? 'আরে না না, আপনি কী বলেন, সমস্যা হবে কেন? সেটি আমি পেলেই হলো, আপনি আজ আমার যে উপকার করলেন, তা-ই তো বেশি।' এরপর শেষ পর্যায়ে এসে জাহাজের ভেতর নিরাপদ এক এলাকায় ইউনিফর্মটি খুলে পোশাক বদলিয়ে ফেলে সে। কথামতো একছেলের হাতে কৌশলে সেটি তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর জাহাজ ছেড়ে দেয় গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। জাহাজের ভেতরটা যেনো একটি ঘনবসতিপূর্ণ ছোটো উপশহর। লোকে লোকারণ্য। যে যার মতো করে নিজ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, গোয়ালাও এতোদিনে অনেক চালাক চতুর হয়ে গেছে, সে বুঝতে পেরেছে, টিকিট, কাগজপত্র চেক যা করার তা জাহাজে ওঠার সময়ই করে নিয়েছে, ভেতরে আর ওসব ঝামেলা নেই। অবশ্য আবার চেক হবে সেই জাহাজ থেকে নামার সময় জেদ্দা নৌবন্দরে, তখনেরটা তখন দেখা যাবে, তবে কেউ যেনো বুঝতে না পারে আমি টিকিট ও কাগজপত্র ছাড়া হজযাত্রী। তাই একটু সতর্ক হয়ে চলতে হবে। তারই অংশ হিসেবে কোনো জায়গায় স্থির না থেকে কিছুক্ষণ এখানে, কিছুক্ষণ ওখানে করে সময় পার করে দিতে থাকে। আবার কখনও কারও সাথে একটু কথাবার্তা বলে, আবার কখনও চলে যায়

জাহাজের রেলিংএ, যেখানে দাঁড়িয়ে বাইরের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখা যায় এবং প্রায় সবাই পালা করে তা দেখে থাকে। এমন করার উদ্দেশ্য ওই একটাই, যেনো তাকে নিয়ে কেউ সন্দেহ করতে না পারে; বরং সবাই মনে করে, একজায়গায় বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেছে বলে হয়তো এভাবে ঘোরাফেরা করছে। এভাবে নিজেকে এড়িয়ে নিয়ে চলতে থাকে সে; কিন্তু কথায় বলে, মানুষ সামাজিক প্রাণী, যেখানেই থাক, তাদের মাঝে একটা সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবেই। অল্পকিছুদিনের মধ্যেই একভদ্র যাত্রীর সাথে তার (প্রকৃত পরিচয়হীন) সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে গড়িয়ে যায় তা বন্ধুত্বের পর্যায়ে। প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে সফরকালের বন্ধুত্বটা একটু তাড়াতাড়িই গড়ে ওঠে এবং ঘনিষ্ঠও হয় খুব দ্রুতো।

পথ ফুরিয়ে আসার আগে সে তার বন্ধুকে বলে, জেদ্দা বন্দর কাছাকাছি চলে এলে আমাকে একটু জানিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, সমস্যা নেই, আমি বলে দেবো। একটু পরই দূর থেকে জেদ্দা নৌবন্দরের আলো দেখা যেতে থাকে। তখন অবশ্য এতো বিশাল বড়ো বন্দর ছিলো না। বন্দর যতোই কাছাকাছি আসে, জাহাজের গতিও কমে আসে। জাহাজ বন্দরে নোঙ্গর করার আগমুহূর্তে তিনি গোয়ালাকে বলেন, এই যে আমরা এখন প্রায় বন্দরে চলে এসেছি। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজ নোঙ্গর করতে যাবে।

তখন ছিলো মধ্যরাত। সে বন্দরের আলো দেখে অনুমান করে, কোন দিকে কী আছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় জাহাজের কিনারায়। সাথে তার বন্ধুও; কিন্তু তিনি কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই আল্লাহু আকবার বলে অকস্মাৎ সে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হঠাৎ একী হয়ে গেলো? চিৎকার দিয়ে অন্যদের জানাতে যাবে ভাবতেই হঠাৎ তার মাথায় আসে, না, তা করা ঠিক হবে না, যদি উল্টো আমাকে বলা হয় তুমিই তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছো, তাহলে তো আমিই ফেঁসে যাবো। তাই দেখা যাক, কী হয়? সে আবার সাঁতরে ওঠে আসে কী-না? কিন্তু ঝাঁপ দেয়ার পর যে সে গায়েব হয়ে গেলো এরপর আর আবছা আঁধারে তাকে দেখা গেলো না। বিপদে জড়িয়ে পরার আশঙ্কায় কাউকে কিছু না জানালেও ভেতরে ভেতরে খুব অস্তস্তি বোধ করতে থাকে, চোখের সামনে থেকে এভাবে একটি প্রাণ ঝরে যাওয়া দেখে নিজেকে অপরাধী মনে হতে থাকে তার কাছে; কিন্তু কী আর করা? যা ঘটার তা ঘটেই গেছে। তবুও বহুক্ষণ জাহাজের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে, তবে কোনো লাভ হয় না। অবশেষে বিষণ্ন বদনে ভাঙ্গা মনে নেমে যায় জাহাজ থেকে। সাথে কিছু অনাকাঙ্খিত স্মৃতি আর অভিজ্ঞতা নিয়ে...।

এভাবে চলে যায় অনেক দিন, বদলে যায় বহুকিছু; কিন্তু তার স্মৃতির ক্যানভাস থেকে মুছে যায় না কয়েকদিনে গড়ে ওঠে একজন সহজ সরল পথিক বন্ধুর

স্মৃতিগুলো, মাঝে মধ্যেই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই মায়াবী মুখোচ্ছবিটি; কিন্তু কিছুই আর করার নেই।

একবার তিনি নামাজ পড়ছেন। পাশেই দাঁড়িয়েছেন আরেক লোক। লম্বা জুব্বা, মাথায় আরবি রুমাল। যেনো এক পুরোদস্তুর আরবি শায়েখ; কিন্তু নামাজ পড়ার ধরন আরবদের মতো নয়। কৌতূহলী হয়ে নামাজের ফাঁকে ফাঁকে তার দিকে তাকায়, দেখার চেষ্টা করে ভালো করে, কেমন যেনো মনে হয় লোকটি চেনা চেনা, কোথাও যেনো তাকে দেখেছেন তিনি, আবার ভাবেন, এই জীবনে কতো মানুষের সাথেই না পথে-ঘাটে দেখা হয়। মানুষের মতো মানুষ তো থাকতেই পারেন...।

কিন্তু সেই এরাবিয়ান জুব্বা আর রুমাল পরা ভদ্রলোক নামাজ শেষ করে চলে যাওয়ার সময় তার সামনে ভেসে ওঠে অন্যএকস্মৃতি। ভিন্ন একটা মুখাবয়ব। তিনি ছুটে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ান। সালাম মোসাফা করে তাকে গভীরভাবে পরখ করতে থাকেন। হঠাৎ আটকে যায় দু'জনের চোখ দু'জনের চোখের দিকে। মাঝে ক্ষণিকের নীরবতা...। স্যরি! আপনি আপনি....। আপন কি সেই...?

এতোক্ষণে তিনিও বুঝতে পারেন...। বলেন, আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি সেই বহুদিন আগে জাহাজে পরিচয় হওয়া সেই বন্ধুটি কী-না? আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, আমিই এখন আপনাকে চিনতে পেরেছি। এজন্যে আল্লাহর শুকরিয়া। লোকে বলে, বেঁচে থাকলে জীবনে একদিন দেখা হয়-ই!

তা বুঝলাম; কিন্তু কেনোই বা সেদিন হঠাৎ পানিতে ঝাঁপিয়ে পরলেন, সেখান থেকে কী করে উদ্ধার হয়ে এ পর্যায়ে পৌছলেন...?

এগুলো বিস্তারিত শুনতে হলে অনেক সময়ের দরকার, তাই আসুন আমার সাথে সবকিছুই জানতে পারবেন।

তিনি তার সাথে এগিয়ে যান। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখেন একটি বিখ্যাত ব্রান্ডের ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়ানো। চালকও বসে আছে তাতে। তিনি বন্ধুসহ গাড়িতে চেপে বসে গেলেন। তার বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে যেতে থাকে। ভাবেন, ব্যাপার কী? গাড়ি চলতে চলতে শহরের একটি প্রাসাদসম বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে বন্ধুর হাত ধরে নিয়ে ঢুকেন সেই প্রাসাদের ভেতর। অন্দর মহলের অবস্থা দেখে তার চোখ ছানাবড়া!! বিশাল ড্রয়িংরুম, উন্নত মানের ঝকঝকে তকতকে সোফাসেট বিছানো, নানা আসবাবপত্রে তা সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো, সেখানে তাকে বসতে দিয়ে ভেতর থেকে দ্রুতো নাস্তা-পানীয় এনে হাজির! নাস্তা সারতে সারতে চলতে থাকে তাদের আলাপচারিতা–

'এটি এখন আমার নিজ বাড়ি।'

কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না? কী ভাবে...?

'তা শুনুন'–

'জাহাজে আপনার সাথে অনেক কথা হলেও বহুকিছু বলা হয়নি তখনও। আমি ছিলাম লাহোরের একজন গরিব গোয়ালা। আমার প্রবল আকাঙ্খা ছিলো আল্লাহর ঘর দেখার; কিন্তু কোনো উপায় ছিলো না। একপর্যায়ে খালি হাতেই পাগলের মতো ছুটে বের হয়ে পরি..।'

এরপর তার সাথে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া না বলা কথাগুলো সবিস্তারে খুলে বলেন, তার বিস্ময়ের মাত্রা শুধু বেড়েই চলে...। তিনি আরও বলেন–

'যেহেতু আমার কাগজপত্র কিছুই ছিলো না আর জানতাম বন্দর থেকে বের হওয়ার সময় অবশ্যই ধরা পরে যাবো, তাই জীবনের ঝুকি নিয়ে আল্লাহর কাছে বলি, হে আল্লাহ! আমার সামর্থ্য রয়েছে শুধু সাগরে ঝাঁপ দেয়ার, তাই তোমার ওপর ভরসা করে তোমার নামে ঝাঁপ দিচ্ছি, বাকি দায়িত্ব তোমার ওপর...। এরপরই আল্লাহু আকবার বলে সাগরে ঝাঁপিয়ে পরি আপনাকে কোনো কিছু বুঝে উঠতে না দিয়েই। আপনি নিজের চোখে দেখেছেন, এরপর কিছুক্ষণ শুধু হাবুডুবু খেতে থাকি, আর হাত পা আছড়ে চেষ্টা করি তীরে ভেড়ার; কিন্তু প্রথম ঢেউ আমাকে ধাক্কিয়ে নিয়ে যেতে থাকে অন্যদিকে। এরপর বহুক্ষণ কী ঘটেছে তা আর মনে করতে পারি না। একপর্যায়ে মনে হয় আমার পায়ের নিচে শক্ত কী যেনো। এমন সময় আরেকটি ঢেউ আমাকে সজোড়ে ধাক্কা দিয়ে তীরে নিয়ে ফেলে দেয়। ততোক্ষণে পানি খেয়ে খেয়ে আমার পেট মোটা হয়ে গেছে, আমার দেহটাকে নড়ানোর ক্ষমতা আর বাকি নেই। এমন অবস্থায় আল্লাহর মেহেরবানিতে হঠাৎ করে বমি হতে শুরু করে। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ভেতর থেকে পানি বের হয়ে পেট পাতলা হয়ে আসে। জ্ঞানও ফিরে পাই পুরোপুরি। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি ফজরের সময় হয়ে গেছে। আস্তে করে ওঠে বসি। কিছুক্ষণ পর মনে হয় হয়তো এখন চলতে পারবো। ওঠে দাঁড়াই। আল্লাহর রহমতে শরীরে বেশ শক্তি অনুভূত হয়। চিন্তা করি, বেলা উঠার আগে আগেই এলাকা ছাড়তে না পারলে আবার ধরা পরে যেতে পারি, নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে আল্লাহর ঘর দেখার আকাঙ্খা। তীর বেয়ে এগিয়ে চলতে থাকি সামনে। কিছুক্ষণ পর আবিষ্কার করি আমি একলোহার গ্রিলের ভেতরে আটকা পড়েছি। তবুও সেই গ্রিলের পাশ দিয়ে চলতে থাকি এই প্রত্যাশায় যে, সামনে কোথাও গিয়ে হয়তো কোনো দরোজা পাওয়া যাবে। চলতে চলতে একটি বাসার সামনে এসে পরি। যার আঙ্গিনা এসে মিলেছে এই গ্রিলের দিকে। খেয়াল করি একটি গাভীর সাথে দু'জন পুরুষ যেনো কুস্তি লড়ছে। একজন চেষ্টা করছে গাভিটির পা বেঁধে

ফেলার, আরেকজন চেষ্টা করছে হাতে একটি গ্লাস নিয়ে তাতে দুধ দোয়াবার; কিন্তু দু'জন কাছাকাছি যাওয়ামাত্রই গাভিটি সজোরে লাথি মেরে তাদের দূরে সটকে দিচ্ছে। এমন দৃশ্য দেখে দুঃখের মাঝেও হাসি চেপে রাখতে কষ্ট হয়। বুঝতে পারি, দুধ দোয়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করলেও তারা এ কাজে একদম কাঁচা, পুরোপুরি অদক্ষ। যার কারণে গাভিটিকে তারা কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না...।

কথায় বলে, ঢোলের শব্দ শুনলে নাচুনের পা এমনিই নড়ে। বার বার গাভির পায়ের লাথি খাওয়া দেখে বেচারাদের প্রতি খুব মায়া লাগে। গ্রিলের বাইর থেকে ইশারা করে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করি আমি এ কাজ খুব ভালো পারি, অনুমতি দিলে আমি তোমাদের গাভিটি দুইয়ে দিতে পারি; কিন্তু লাথির পর লাথি খেয়ে তটস্ত থাকা বেচারারা আমার ইশারা বুঝতে পারে না। তারপর তাদেরকে কাছে এগিয়ে আসতে ইশারা করি। একজন এগিয়ে এলে বহু কষ্টে ইশারা-ইঙ্গিতে তাকে বুঝাতে সক্ষম হই, আমি তাদের কাজ করে দিতে পারবো। তারপর সে বাড়ির ভেতরে গৃহিনীকে সবকিছু খুলে বলে। বাড়িটি ছিলো জেদ্দা নৌবন্দরের প্রধান নির্বাহীর। আল্লাহপাক বহুদিন পর তাকে একটি ছেলেসন্তান দিয়েছেন; কিন্তু শিশুটি মায়ের দুধ মুখে দেয় না। সে যুগে আজকের মতো কৌটার শুকনো দুধ পাওয়া যেতো না, তাই মায়ের দুধের একমাত্র বিকল্প ছিলো গাভির দুধ। সে কারণে অফিসার সাহেব তার ছেলের দুধের ব্যবস্থা করতে গিয়ে একটি দুধাল গাভিই কিনে এনেছিলেন এবং তা দোয়াবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন বাড়ির কাজের লোককে; কিন্তু তারা এ কাজের লোক না হওয়ায় এই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলো। ফলে গাভিটির সাথে কুস্তি লড়া আর লাথি খাওয়া ছাড়া খুব বেশি কাজ হতো না। বড়োজোর আট দশ লাথির বিনিময়ে আধাগ্লাস দুধ সংগ্রহ...। যার কারণে মাঝে মধ্যেই শিশুটিকে অনাহারে অর্ধাহারে কাটাতে হতো। তারা ভেতরে গিয়ে গৃহকর্তীকে বুঝিয়ে বলে, এখানে একজন পথিক এসেছে, যে বলছে সে না-কি খুব ভালো করে গাভির দুধ দুইতে পারে, তার এ ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

প্রত্যেক মায়েরই চাওয়া থাকে তাদের সন্তানের সুখ। সব মায়ের কাছেই তাদের সন্তানের হাসির চেয়ে প্রিয় আর অন্যকিছু থাকতে পারে না। সেখানে যদি সন্তান থাকে আরও বিপদগ্রস্ত, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। তিনি বলেন, ঠিক আছে, তাকে আসতে বলো...।

গ্রিলের তালা খুলে তারা আমাকে ভেতরে নিয়ে যায়। আমি তাদেরকে একপাশে আরামে বসিয়ে রাখি, এরপর এগিয়ে গিয়ে গাভিটির পিঠের ওপর আলতো করে হাত বুলিয়ে নিই। প্রত্যেক পালিত প্রাণীই বুঝতে ও চিনতে পারে তাদের পিঠে

কে হাত বুলাচ্ছে এবং হাত বুলানির ধরন দেখেই তারা নিশ্চিত হয় সেই লোক কতোটা প্রাণীবান্ধব ও বিশেষজ্ঞ। আমি সুন্দরভাবে গাভিটির পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়ামাত্রই সেটি খুব শান্তভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুধ দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে যায় এবং পরোক্ষভাবে আহবান জানায়, দেরি না করে কাজ সেরে ফেলুন। আমি একটি বড়োপাত্র আনতে বলি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় চার-পাঁচ লিটার দুধ দুইয়ে নিই। আমার কাজ দেখে তাজ্জব বনে যাওয়া কাজের লোকদুটি দুধের ভরা বালতি ভেতরে নিয়ে গেলে গৃহকর্তী তা দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। ক্ষণকাল পরে বলেন, যে গাভি থেকে তোমরা দু'জন মানুষ দিনে আধাগ্লাস দুধ বের করতে পারো না, আজ সেই গাভি থেকে তিনি এতো পরিমাণ, মানে প্রায় একবালতি দুধ দুইয়ে দিলেন? কোনোভাবেই তাকে আর এখান থেকে যেতে দেয়া যাবে না। যেভাবেই হোক তাকে রেখে দেয়ার ব্যবস্থা করতেই হবে। আল্লাহপাকের এটা একবিরাট অনুগ্রহ। যাও, তাকে ভেতরে নিয়ে এসো...!

আমাকে একটি সুন্দর ঘরে বসিয়ে বিশেষভাবে নাস্তা করিয়ে বলেন, এখন একটু বিশ্রাম করুন, পরে কথা বলা যাবে। তার স্বামী ঘুম থেকে উঠলে তিনি বলেন, সত্যিকার খোদায়ি মদদে আমরা এমন একজন মানুষকে পেয়েছি, যার মাধ্যমে আল্লাহপাক আমাদের সন্তানের দুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তারপর সকালে ঘটে যাওয়া সবকিছু তাকে সবিস্তারে শুনিয়ে দেন। সেই সাথে কঠিনভাবে আবদার করে বলেন, কোনো অবস্থাতেই তাকে কিন্তু যেতে দেয়া যাবে না। এরপর সেই অফিসার এসে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আপনি এখান থেকে যেতে পারবেন না, আমার বাসাতেই থেকে যাবেন। আমি বলি, না, তা সম্ভব নয়, আমি আল্লাহর ঘরে যাবো। তিনি যতোই জোড়ালোভাবে বলেন আপনাকে এখানে থাকতেই হবে, আমি তারচেয়ে আরও দৃঢ়চিত্তে বলি, না, আমাকে আল্লাহর ঘরে যেতেই হবে! এভাবে বেশ কিছুক্ষণ থাকতে হবে, যেতে হবে, চলতে চলতে একপর্যায় তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ঠিক আছে, বায়তুল্লাহশরিফে যাওয়ার জন্যে যা যা করতে হয়, আমি তা করে দেবো, আপনি অবশ্যই সেখানে যেতে পারবেন, তবে আপাতত কিছুদিন এখানে অবস্থান করুন।

আমি ভাবি, প্রস্তাবটা খারাপ নয়; বরং আমার উদ্দেশ্য পূরণে আরও সহায়কই হবে বটে। তাই সেখানেই রয়ে যাই। দশ-পনেরোদিন পর স্ত্রী স্বামীকে ফোন করে জানান, আমার সন্তানের দুধের যে সমস্যা ছিলো, তা পুরোপুরি সামাধান হয়ে গেছে। কীভাবে সেই সমাধান হলো? এর জাবাবে তিনি আমাকে নিয়ে ঘটে যাওয়া সবকিছু তাকে খুলে বলেন এবং একটু বেশি করেই আমার প্রশংসা করেন। তার বাবারও একটি গরুর মাঝারি ফার্ম ছিলো। তিনিও এই দুধ দোয়াবার সমস্যায় ভুগছিলেন। যোগ্য অভিজ্ঞ গোয়ালা না পাওয়ার কারণে

বাড়ির চাকরবাকরদের দিয়ে এ কাজ চালিয়ে নেয়া অসম্ভব হয়ে পরেছিলো। তিনি বলেন, তোমার সমস্যা শুধু তোমার একশিশুর, মানে আমার নাতির দুধের ব্যবস্থা করা আর আমার সমস্যা গোটা ফার্মের গাভি দোয়াবার। তাই এককাজ করো, তুমি ওকে আমার এখানে পাঠিয়ে দাও আর তোমার বাচ্চার যে পরিমাণ দুধের প্রয়োজন হয়, তা আমি সররাহ করবো। এরপর আমাকে তার বাবার বাড়ি পবিত্র মক্কা নগরীতে পাঠিয়ে দেন। আমি আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা বলে তার গাভিগুলো থেকে বহুগুণ বেশি পরিমাণ দুধ দুইয়ে দিতে থাকলাম। এতে তিনি বিস্মিত, মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে বলেন, আপনাকে অন্যকোথাও যেতে দেবো না, এখানেই থেকে যাবেন। আমি বলি, না, তা হবে না। আমি আল্লাহর ঘর দেখতে যাবো। তিনি আমাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন; কিন্তু আমার ওই একই কথা–আমি আল্লাহর ঘরে যাবো। তারপর তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তা সেখানে অবশ্যই যাবেন, আমি আপনার যাওয়ার সবধরনের ব্যবস্থাও করে দেবো; কিন্তু আপনাকে থাকতে হবে এখানেই। আমার বাড়িতেই। এই যে আমার এই নতুন বাড়ি দেখছেন, এটি আপনাকেই এককালীন দিয়ে দেবো এবং এখনই দিয়ে দিচ্ছি, সেই সাথে এই গাড়িটিও দিয়ে দিচ্ছি একেবারে! এখন আপনি আপনার বাড়ির ঠিকানা বলুন, আমি সেখান থেকে আপনার গোটা পরিবারকেই এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি। আমি তাকে বাড়ির পুরো ঠিকানা জানিয়ে দিলে তিনি আমার স্ত্রী-সন্তানদেরও এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। তারপর থেকে আমি স্বপরিবারে এই বিশাল বাড়িতে অবস্থান করছি। আল্লাহর মেহেরবানিতে তাঁর ঘর দেখার আশা ও আকাঙ্খা আমার পুরো হয়ে গেছে, হজব্রত পালন করেছি, বাড়ি, গাড়ি, নারী সবই পেয়েছি। যখন ইচ্ছে তখনই এই গাড়িতে করে কাবাশরিফে গিয়ে নামাজ পড়ে আসি। আল্লাহপাক আমাকে এখানে সবধরনের ধন-ঐশ্বর্য দান করেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমি যে উদ্দেশ্যে সবকিছু ছেড়ে একদম শূন্য হাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে পরেছিলাম, সেই (আল্লাহর ঘর দেখার) প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহপাক আমাকে গায়েবি সাহায্যে সফল করে দিয়েছেন।

ইদরিস কান্দলভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] এই ঘটনা শুনিয়ে বলতেন, হায়! যদি লাহোরের সেই গোয়ালার হৃদয়ে আল্লাহর ঘর দেখার যে তীব্র বাসনা সৃষ্টি হয়েছিলো, সেই বাসনা যদি আমাদের হৃদয়েও জন্ম নিতো!!

কিসের ভিত্তিতে হজব্রত পালন সম্ভব হয়?

এই হজব্রত পালনের জন্যে আমাদের আগের বুজুর্গানেকেরাম বছরের পর বছর আল্লাহপাকের দরবারে কান্নাকাটি করে দোয়া করতেন। হজের সুযোগ কামনা করতেন। এরপর হজের জন্যে বাড়ির ঘটি বাটি পর্যন্ত বেচে দিতে হতো। তারপরই অনেক চেষ্টা-সাধনা আর ত্যাগ-কষ্টের পর দীর্ঘযন্ত্রণাদায়ক সফর করে

পবিত্র কাবাঘরে এসে হাজির হতেন। মহান আল্লাহপাক আমাদের মতো দুর্বলদের জন্যে এমন সুন্দর উন্নত সহজ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এগুলো তাঁর একান্ত দয়া ও করুণা। তাই অধম বলে থাকি, হজ করতে পারার সম্পর্ক নিয়ত-ইচ্ছা, এখলাস-নিষ্ঠা আর আমলের সাথে। শুধু ধনসম্পদের সাথে নয়। যদি সম্পদের জোড়ে কেউ হজ-ওমরা করতে পারতো, তাহলে দুনিয়ার সম্পদশালী ও ধনী লোকেরা সবাই হজ পালন করে 'হাজি' হয়ে যেতে পারতো; কিন্তু আসল বাস্তবতা এমনটি নয়।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার জীবনে নিজ চোখে খুব কাছে থেকে একটি ঘটনা দেখেছি। আল্লাহু আকবার! আজও সেই ঘটনার কথা মনে হলে বা চিন্তা করলে শরীরের লোম শিউরে ওঠে। অন্তরে কাঁপনি জাগে। আমেরিকা থেকে একটি শিক্ষিত দম্পতি হজে আসে। আধুনিককালে ভিআইপি হজের নামে যে মসিবত শুরু হয়েছে, রোগ দেখা দিয়েছে, সেই রোগে তারাও আক্রান্ত ছিলো। তারা ভিআইপি (সুবিধা নিয়ে) হজ পালন করতে চায়। তাদের অর্থসম্পদের ওপর প্রচণ্ড দম্ভ ছিলো। গর্ব ছিলো।

তারা চলে আসে। একই গ্রুপে আমরাও হজ পালন করছিলাম। আমি খেয়াল করছিলাম তাদের স্বভাব কোনোভাবেই হজ পালনের উপযোগী বা অনুকূলে ছিলোই না। যার কারণে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি লেগেই থাকতো। অভিযোগ-অনুযোগের কোনো সীমা-পরিসীমা বা শেষ ছিলো না। সবসময় শুধু বলতো, এটি ভালো নয়, ওটি সুন্দর নয়, এটি এমন, সেটি তেমন। মোটকথা, সেই দম্পতির একমাত্র কাজই যেনো ছিলো শুধু সবকিছুর সমালোচনা করা। ভুল ধরা, দাম্ভিকভাবে অকৃতজ্ঞতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা। তাদের কাজকাম হাবভাব দেখে মনে হতো (নাউজুবিল্লাহ) তারা মহান আল্লাহপাকের ওপর বিশেষ করুণা করার জন্যে এখানে এসেছে!

আল্লাহপাকের কী ইচ্ছা, হজের মূলকাজের শুরুতে জিলহজ মাসের ৫/৭ তারিখে হঠাৎ করে স্বামী অসুস্থ হয়ে পরে। জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নিয়ে চেকআপ করিয়ে দেখা যায় তার হার্টের সমস্যা হয়েছে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সাধারণ নিয়ম মতো হজ পালনকারী রোগীগুলো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজ দায়িত্বে এ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে নিয়ে গিয়ে উকুফে আরাফা বা আরাফার ময়দানে অবস্থান নেয়, (ফরজ) আমল করিয়ে নিয়ে আসেন। যে এ্যাম্বুলেন্সে ডাক্তারসহ ওষুধপাতির সব ব্যবস্থা থাকে, অন্যভাষায় যাকে বলা যায় 'ভ্রাম্যমাণ মিশন হাসপাতাল।'

তবে সে জন্যে রোগীকে একটি ফরম পূরণ করতে হয়, সামান্য সুস্থ হয়ে ওঠা তাকে সেই ফরম পূরণ করার কথা বলা হলে তাতে সে অসম্মতি জানিয়ে দম্ভভরে বলে, আল্লাহপাক তো দেখছেন আমরা তাঁর ঘরে হজ পালন করতে এসেছি,

তারপরও কেনো তিনি আমার হার্ট এ্যাটাক করালেন? আমি তাই আর তাঁর হজই পালন করবো না...!
ডাক্তার সাহেবরা খুবই মিনতিভরে অনুনয়-বিনয় করে বলতে থাকেন, প্লিজ ফয়মটা পূরণ করে হজের কাজটা সেরে ফেলুন, যা যা করার তা আমরাই করবো...; কিন্তু না, তার একই কথা–আমরা আল্লাহ ঘরে এসেছি, তারপরও কেনো তিনি আমাকে অসুস্থ করে দেবেন..? আমি আরাফায় যাবোই না। তারা ব্যর্থ হয়ে তার সমমনা স্ত্রীকে বলেন, আপনি তো এখানে পাঁচ তারা হোটেলের এসি রুমে হাই ফাই অবস্থায় আছেন, আপনি স্বাক্ষর করুন। আমরা আপনার উকুফে আরাফা বা আরাফার ময়দানে অবস্থানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি; কিন্তু না, স্ত্রীরও তার স্বামীর মতোই একই জবাব–আমি আরাফার ময়দানে যাবোই না! এভাবে সব মানুষ হজব্রত পালনে ধন্য হলেও সেই হতভাগা দম্পত্তি হজ পালন না করেই সেখান থেকে ফিরে যায়!
এজন্যেই বলা হয়, শুধু টাকা-পয়সার জোড়ে হজ করা যায় না। হজের সম্পর্ক আত্মা, নিয়ত ও আমলের সাথে।

حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر
[হাসরত হায় উস মুসাফিরে মুজতর কে হাল পর]
جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے
[জো থক কে রাহ গিয়া হো মানঝিল কে সামনে]
ক্লান্ত পথিক ব্যর্থ তুমি
বলবো কারণ কিরে
একটু হলেই মিলতো দেখা
এখন গেলো ফিরে।

গন্তব্য একেবারে সামনে, অথচো সেই অবস্থায় তাদের কাছ থেকে শক্তি-সাহস ছিনিয়ে নেয়া হয়। এমন দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখেছি। তাই যারা ধনসম্পদের ওপর গর্ব করে হজে আসে, আল্লাহপাক তাদেরকে খুব কাছে থেকে ফিরিয়ে দেন। কারণ, আবারও বলছি, এই হজের সম্পর্কে পুরোপুরি খাঁটি নিয়ত, নিষ্ঠা, দৃঢ়প্রত্যয়, তীব্র আকাঙ্খা আর আমলের সাথে। যার আকাঙ্খা যতো বেশি, আকাঙ্খা যতো তীব্র, নিয়ত যতো খাঁটি আর হৃদয় যতো স্বচ্ছ থাকবে, তার জন্যে আল্লাহপাক রাস্তা ততো সহজ ও চওড়া করে দেবেন। শুধু একবার নয়, বার বার হজ করার সুযোগ করে দেবেন। তাই আপনারা যদি ভালোভাবে ওমরা পালন করেন, সুন্দর করে সময় কাটান, তাহলে আল্লাহপাক বার বার আপনাদের জন্যে রাস্তা খুলে দেবেন।

কীভাবে বার বার হজ-ওমরা ভাগ্যে জুটবে?

অনেকেই এ প্রশ্ন করে থাকেন, বার বার হজ-ওমরা পালনের উপায় কী? ছোট্ট একটি উপমা শুনুন, কোনো স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বলা হয় ছাত্রদের ভেতর

থেকে একটি ভালো ক্রিকেট টিম গঠন করে দিতে, তাহলে এক্ষেত্রে যারা সবসময় ভালো খেলে সুন্দর পারফরমেন্স করে তাদের নাম লেখার জন্যে তাকে অন্যকারও পরামর্শ বা সহযোগিতা নেয়া প্রয়োজন পরবে না, পরামর্শ আর সহযোগিতা শুধু তখনই নিতে হবে, যখন ভালো কোনো খেলোয়াড়ের নাম তার জানা না থাকবে বা তাদের পারফরমেন্স সম্পর্কে তার কোনো ধারণা না থাকবে, যে ব্যাটিং এ বড়ো স্কোর গড়তে পারে, ভালো বোলিং করতে পারে, সুন্দর ফিল্ডিং দিতে পারে, তার ব্যাপারে কোনো পরামর্শের দরকার হয় না।
ঠিক তেমনি যে হারামশরিফে এসে তার দৃষ্টি হেফাজত করে আল্লাহকে স্মরণ করে সময় কাটায়, হারামশরিফের আদব সম্মানের দিকে খেয়াল রাখে, একমন একধ্যানে এবাদত-বন্দেগি করে নিজ প্রভুর সামনে বিনীতভাবে মাথা নুয়ে তাঁর কাছে আবার হজের সুযোগ চায়, পরবর্তী বছরে হজ-ওমরা পালনকারীদের মাঝে তার নাম প্রথম সারিতে লেখে দেন। তাই তেমনই আকাঙ্খা নিয়ে আমাদের এখানে সময় কাটাতে হবে।

চোখের পাতায় ভর দিয়ে আল্লাহর ঘরে হাজির!

আল্লাহর ঘরে আগমনকারীরা কতোভাবে কতো উপায়ে আর কী কী নিয়ত নিয়েই না সেখানে সমবেত হয় তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আগেরদের ইতিহাস ও ঘটনা পড়লে কতো বিচিত্র ধরনের তথ্যই না পাওয়া যায়। বলখের এককালে মহাপ্রতাপশালী সম্রাট বুজুর্গদের শিরোমণি হজরত ইবরাহিম বিন আদহাম [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] একবার বলখ থেকে মক্কা পর্যন্ত এমনভাবে এসে পৌছান, যার নমুনা একদম বিরল। তিনি বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর এককদম সামনে এগিয়ে জায়নামাজ বিছান, দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করে আরেক কদম এগিয়ে সেখানে দু'রাকাত নামাজ পড়ে আবার একপা সামনে এগিয়ে আরও দু'রাকাত নামাজ আদায় করেন। এভাবে এককদম পর পর দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করতে করতে মক্কাশরিফে হাজির হন। এতে দীর্ঘসময় লেগে যায়। তারপর তাওয়াফ শেষে মাকামেইবরাহিমে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করে মোনাজাত ধরে বলেন, হে আল্লাহ! লোকেরা পায়ের ওপর ভর করে এখানে হাজির হয় আর আমি হাজির হয়েছি আমার চোখের পাতার ওপর ভর দিয়ে।
আল্লাহু আকবার! হৃদয়ে কী পরিমাণ খোদাপ্রেম আর কাবাভক্তি থাকলে এভাবে চোখের পাতায় ভর দিয়ে সেখানে হাজির হওয়া যায় তা বলে বুঝানো যাবে না। যে প্রতি এককদম পর পর দু'রাকাত করে নামাজ পড়তে পড়তে সামনে আগায়, তাকে তো বলাই যায় তিনি চোখের পাতায় ভর দিয়ে কাবাশরিফ পৌছেছেন!

হজরত রাবেয়া বসরিয়ার জবাব

হজরত ইবরাহিম বিন আদহাম [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, ওমরা পালন শেষে খেয়াল করি একবুড়ির ওপর আকাশ থেকে এমনভাবে তাজাল্লি (দ্যুতি)

ঝরছে (নেমে আসছে), যেমন বায়তুলমামুর থেকে কাবাশরিফে নেমে আসে। আমি কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, ইনি কে? জানানো হয় ইনি হজরত রাবেয়া বসরি। আমি তাতে ভীষণ বিস্মিত হয়ে বলি, আমি প্রতি কদমে কদমে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়তে পড়তে দীর্ঘদিনের সাধনায় এখানে এসেছি, তবুও এমন মর্যাদা পেলাম না, অথচো আপনি এমন কী আমল করেছেন, যার কারণে আল্লাহপাক আপনাকে এমন মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন? শুনে মাত্র দু'টি বাক্যে জবাব দেন তিনি–"তুমি অবনত মস্তকে এখানে এসেছো আর আমি এসেছি অবনত হৃদয়ে ।"

তাই আল্লাহপাকের এই পবিত্র দরবারে যে যতো বিনয়ী অন্তরে হাজির হবে, তাকে সে অনুপাতে সম্মানিত করা হবে। কারণ, বান্দার জন্যে শুধু বন্দেগিই শোভা পায়। আল্লাহপাকের সামনে যে পরিমাণ অবনত হতে পারো হও, যেমন বিনত মস্তকে আনত হৃদয়ে হাজির হতেন আগের যুগের বুজুর্গানেকেরাম।

এক শারীরিক প্রতিবন্ধীর প্রেমপূর্ণ হজ

হজরত মালেক বিন দিনার [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর প্রসিদ্ধ ঘটনাটি আপনারা বহুবার শুনে থাকবেন। তিনি বলেন, গ্রীস্মের প্রচণ্ড তাবদাহ চলছে। ঠিক দুপুরবেলা আকাশ থেকে যেনো আগুন বৃষ্টি ঝরছে। তীব্র রোদের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পাখির দল গাছপালার নেতিয়ে পরা পাতার আড়ালে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছে। জন্তু-জানোয়ারেরা গাছগাছালির আড়ালে বা ঝোপঝাড়ে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। মাঠের কিষাণ-কিষানীরা কাজ ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে কোনো কিছুর আড়ালে আবডালে। বাইরে কোনো কিছুর নাম-নিশানা নেই। এমন অস্বাভাবিক দাবদাহ আর প্রচণ্ড রোদের মাঝেই একান্ত জরুরি একটি কাজে আমাকে বাড়ি থেকে বের হতে হয়। ওপর থেকে সূর্যের অগ্নিবৃষ্টির মাঝেই একটি বিজনপথ বেয়ে চলতে শুরু করি। কিছুদূর যাওয়ার পরই খেয়াল করি মাটির সাথে হামাগুড়ি দিয়ে একটুকরো কাঠের মতো কী যেনো এগিয়ে আসছে, বিষয়টি ভালো করে দেখার জন্যে সেখানে দাঁড়িয়ে যাই। কিছুক্ষণ পর সেটি কাছাকাছি চলে এলে বুঝতে পারি সেটি কোনো কাঠের টুকরো নয়, একজন জলজ্যান্ত মানুষ! তবে সুস্থ সবল পূর্ণাঙ্গ নয়। অর্ধেক মানুষ, অর্থাৎ, নিচের দিক থেকে দু'টি পা না থাকায় সে দু'হাতে ভর দিয়ে ঘষতে ঘষতে এগিয়ে আসছে অতি কষ্টে। প্রতিবন্ধী মানুষগুলোর যেমন অবস্থা হয়। কাছাকাছি চলে এলে খেয়াল করি, প্রচণ্ড রোদের তেজে তার অপূর্ণাঙ্গ শরীরটি ঘেমে নেয়ে একাকার। জীর্ণ কাপড়খণ্ডটি পুরোপুরি ভিজে শরীরের সাথে একদম লেপ্টে গেছে। প্রখর সূর্যের প্রচণ্ড তেজে তার গোটা শরীরের চামড়া যেনো পুড়ে তামা তামা হয়ে গেছে। মুখের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে। তবুও বিরামহীনভাবে সামনে এগিয়ে চলছে। আমি সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে তরুণ! তুমি এভাবে

রোদ মাথায় নিয়ে কোথায় চলেছো? সে শান্তভাবে জবাব দেয়, আমি পবিত্র হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাচ্ছি। বললাম, এই একটু দূরেই আমার বাসা, সেখানে গিয়ে সামান্য জিরিয়ে নিও, সূর্যের প্রখরতা কিছুটা কমে এলে তারপর আবার রওয়ানা দিও।

জবাবে তরুণ বলে, আপনাদের দু'টি করে পা রয়েছে, যার ওপর ভর দিয়ে খুব দ্রুতো হেঁটে যেতে পারেন; কিন্তু আমি একজন পাহীন পঙ্গু, পূর্ণপ্রতিবন্ধী। দু'হাতে ভর দিয়ে খুবই কষ্টে ঘষতে ঘষতে আর আস্তে আস্তে এগুতে হয়। সে জন্যে আমার অনেক সময় লেগে যাবে। তাই কোথাও দাঁড়িয়ে সময় ক্ষেপণের সুযোগ নেই। সবসময় ভেতরে একটা শঙ্কা কাজ করে–সময় মতো হারামশরিফে গিয়ে পৌঁছুতে পারবো কী-না। যদি মক্কায় যেতে যেতে হজ শুরু হয়ে যায়, তাহলে তো আমার সব চেষ্টাই বৃথা যাবে। এই ভয়ে আমি কোথাও একটু সময়ের জন্যেও থামছি না বা জিরাতও দিচ্ছি না।

তাকে বললাম, তা ঠিকই বলেছো, তবে একটু দাঁড়াও, আমি তোমার জন্যে একটি ভালো বাহনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তাতে চড়ে তুমি খুব দ্রুতো কাবাশরিফে পৌঁছে যেতে পারবে। কথা শেষ না হতেই আমার দিকে আগুনমূর্তি ধারণ করে যুবক বলে, আমি এতোদিন আপনাকে বেশ চালাকই মনে করে আসছিলাম হে মালেক বিন দিনার! মনে করেছিলাম আপনার মাথায় কিছু বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে; কিন্তু আজ আমার সেই ধারণা ভুল প্রমাণ করে দিচ্ছেন আপনি। এ কেমন কথা বলছেন? আচ্ছা, আপনিই বলুনতো, কোনো অপরাধী গোলাম তার মনিবকে তুষ্ট করতে যাওয়ার সময় অতি বিনয়ী হয়ে পায়ে হেঁটে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চায়? না-কি খুব জাকজমকভাবে আড়ম্বরতার সাথে কোনো বাহনে চড়ে তার কাছে হাজির হয়? যদি কোনো বোকা গোলাম এমনটি করেও, তবে এতে তার মনিব তাকে ক্ষমা করে দেবেন? না-কি দাম্ভিকতা আর বেয়াদবির কারণে তার ওপর আরো রুষ্ট হবেন?

সেই উদ্যোমী তরুণের কথা শুনে আমি প্রচণ্ডভাবে বিস্মিত হয়ে পড়ি। এরপর আর কিছু না বলে প্রতিবন্ধী তরুণ একই উপায়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। আল্লাহপাকের খাস মেহেরবানিতে সে বছরই পবিত্র হজ পালনের সুযোগ হয়ে যায় আমার। হজের প্রয়োজনীয় কাজ প্রায় শেষ করে এনে প্রতীকি শয়তানকে লক্ষ করে কঙ্কর ছোড়ার পর খেয়াল করি, সামনের দিকে একটি জটলা লেগে গেছে। বেশ কিছুলোক চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কী যেনো শুনে চলেছে। কৌতূহলী হয়ে আমিও সেদিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী? কেনো সবাই এখানে জটলা পাকিয়ে বসেছে? কেউ একজন জানালো, একতরুণ এখানে উঁচুশব্দে আবেগতাড়িত হয়ে আল্লাহপাকের কাছে ফরিয়াদ করছে আর কৌতূহলী জনতা তাকে ঘিরে ধরে তা উপভোগ করছে। এতে আমার কৌতুহলও আরো একটু বেড়ে গেলো।

এগিয়ে এসে বললাম, আপনারা দয়া করে আমাকে একটু রাস্তা করে দিন। লোকেরা একটু করে চেপে দাঁড়িয়ে আমাকে রাস্তা করে দিলো। ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখি, এ কী? এ যে সেই প্রতিবন্ধী যুবক! সে এহরাম বাঁধা অবস্থায় আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে ফরিয়াদ করে বলছে, "হে আল্লাহ! তোমার দেয়া একান্ত সুযোগে আমি তোমার পবিত্র ঘর দেখেছি। আমি বহু কষ্টে আরাফার ময়দানে অবস্থানও করেছি। আর এই মুহূর্তে শয়তানকে লক্ষ করে প্রতীকি পাথরও ছুড়লাম এই প্রতিবন্ধী অবস্থায়। এখন সামনে আছে কোরবানির আমল। সামর্থ্যবান লোকেরা তোমাকে খুশি করার জন্যে তোমার নামে কোরবানি করবে। পশু জবাই দিয়ে তোমার প্রিয় হবে; কিন্তু তুমি জানো হে খোদা! আমি একজন নিঃস্ব, অসহায় মানুষ, এই এহরামের কাপড়টুকু ছাড়া আমার কাছে আর অন্যকিছু নেই। যা দিয়ে তোমার নামে কোরবানি করবো। তবে হ্যাঁ, এ ছাড়া আর একটি জিনিস আছে আমার কাছে তোমার রাস্তায় কোরবানি দেয়ার মতো। আর সেটি হচ্ছে, আমার প্রাণ, জীবন, হে আল্লাহ! এখন আমার সেই প্রাণটিই তোমার দরবারে কোরবানি হিসেবে উপস্থাপন করছি, তুমি দয়া করে আমার এই কোরবানিটুকু কবুল করে নাও!

প্রতিবন্ধী তরুণ এতোটুকু বলে উঁচুস্বরে কালেমা তাইয়েবা পড়তে পড়তে আস্তে করে টলে পরে। সাথে সাথে তার কোরবানি কবুল করে নিয়ে তাকে কাছে টেনে নেন মহান রব্বুল আলামিন।

প্রিয়সুধী! আপনারা একটু ভেবে দেখুন, আমাদের অন্তরের অবস্থা কি তেমন রয়েছে? আমাদের হৃদয়ে কি তেমন খোদাপ্রেম রয়েছে? আমরা তো সময়ের মূল্যায়ন করতে পারি না, যেভাবে মূল্যায়ন করা দরকার ছিলো।

জীবনের দামি সময়

একথা সবসময় মনে রাখবেন, আমি এখন জীবনের সবচেয়ে দামি আর সেরা সময়টি পার করছি। কারণ, এই সময়টি কার কপালে জুটবে আর কপালে জুটবে না তা বলা মুশকিল। তাই এই (হজের) সময়টির খুব বেশি বেশি মূল্যায়ন করা দরকার। প্রতিটি মুহূর্তের মূল্যায়ন করা দরকার। কারণ, এটি এমন একমহামূল্যবান সময়, যার যেকোনো মুহূর্তের একটি দোয়া কবুল হয়ে গেলে মানুষকে ওলি বানানোর জন্যে তা যথেষ্ঠ। আমরা এমন জায়গায় অবস্থান করছি, যেখানে আপন প্রভুর কাছে খুব নিষ্ঠা-আন্তরিকতার সাথে দোয়া আর এবাদত করা দরকার। কারণ, আমরা আমাদের প্রিয়বন্ধুর ঘরের কাছে এসেছি, যেখানে দেখলে মনে হবে এটি একটি ঘরমাত্র এবং সেই ঘরেরই আমরা তাওয়াফ করে চলেছি; কিন্তু আসলে সেই ঘরের মালিকের ভালোবাসা আমাদের এখানে টেনে এনেছে। বিশ্বপ্রেমিক মজনু যেমন বলেছিলো (কবির ভাষায়)–

أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارَ لَيْلَى

[আমুররু আলদ্দিয়া-রি দিয়া-রা লাইলা]

أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارِ وَ ذَا الْجِدَارَا
[উকাব্বিলু যাল জিদা-রি ওয়া যাল জিদা-রা]
وَ مَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِيْ
[ওয়ামা হুব্বুদ দিয়া-রি শাগাফ্না ক্বলবী]
وَ لٰكِنَّ حُبَّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا
[ওয়ালা-কিন হুব্বা মান সাকানাদ দিয়া-রা]

ঘুরছি আমি এ ঘর ধরে
চুমছি এরি দ্বার
পাগল আমি লায়লা প্রেমে
ঘুরছি তারি দ্বার।

মনটা আমার নয়তো মাতাল
এরি কারুকাজে
এরি মাঝে বসত যাদের
তাদেরই প্রেম বাজে।

তাই বলছিলাম, আমরা যারা এখানে হাজির হয়েছি, আমাদেরকে এই পাথরের ঘরটি টেনে আনেনি। কারণ, বলা হয়েছে–

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ
"তারা যেনো এই ঘরের প্রভুর এবাদত করে... ।"

আল্লাহর তাজাল্লির (জ্যোতির) তাওয়াফ

হজরত হাসান বসরি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, আমি একবার কাবাশরিফের তাওয়াফ করছিলাম। দেখি, এক তরুণীও তাওয়াফ করছে আর উঁচুশব্দে প্রেমের কবিতা আবৃতি করে চলেছে। এমন ভঙ্গিতে, যেনো কোনো প্রমিক তার প্রেমিকার বিরহ বিচ্ছেদে বিলাপ করে কাঁদছে। যার মিলন ছাড়া তার প্রাণ বের হয়ে যাবে। একজন তরুণীর কণ্ঠে উঁচুস্বরে এমন প্রেমপূর্ণ কবিতা শুনে তাকে ডেকে একটু সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলি, তোমার মতো একজন তরুণীর কণ্ঠে উঁচুস্বরে এমন প্রেমের কবিতা আবৃতি করে যাওয়া শোভা পায় না। আমার কথা শুনে সে একটু তাচ্ছিল্যের স্বরে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা হাসান বসরি, বলুন, আপনি এই ঘরের (কাবাশরিফের) তাওয়াফ করছেন, না-কি এই ঘরের মালিকের তাজাল্লির (জ্যোতির) তাওয়াফ করছেন? বলি, আমি এই ঘরের তাওয়াফ করছি। আমার এমন জবাব শুনে সে তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলে, যাদের হৃদয় পাথরের মতো শক্ত, তারাই শুধু এই পাথুরে ঘরের তাওয়াফ করে। আর যাদের হৃদয় জীবিত, তারা এই ঘরের মালিকের তাজাল্লির (জ্যোতির) তাওয়াফ করে।

প্রিয়সুধী, এখানে আসা লোকেরা কোন প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে এসেছে আর কীভাবে সময় কাটাচ্ছে? এটি সেই বায়তুল্লাহশরিফ, সেই তাজাল্লি, তিনিই সবার প্রভু। আল্লাহপাক আমাদেরকে জীবনের নতুন সুযোগ দিয়েছেন। সেই সুযোগকে গনিমত মনে করে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের দাঁড়িয়ে আমরা আল্লাহপাকের কাছে প্রার্থনা করবো, নামাজের পরে চাইবো। তেলাওয়াতের পরে চাইবো।

আমার পির সাহেবের কোরআন তেলাওয়াতের ধারা পদ্ধতি

আমার পির সাহেব বিশ্বপথপ্রদর্শক বলতেন, আমি আমার জীবনের একটি হজ এভাবে আদায় করেছি, বায়তুল্লাহশরিফের সামনে বসে তেলাওয়াত করতাম, প্রতিটি আয়াত তেলাওয়াত করার পর সেই আয়াত অনুপাতে আল্লাহপাকের কাছে প্রার্থনা করতাম। যেমন, সুসংবাদদানকারী আয়াত তেলাওয়াতের পর আল্লাহপাকের কাছে জান্নাত প্রার্থনা, আবার ভীতির আয়াত চলে এলে জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া করতাম। এভাবেই সুরা ফাতেহা থেকে সুরা নাস পর্যন্ত তেলাওয়াত শেষ করি।

প্রিয়সুধী! আমাদের বুজুর্গানেদীন হারাম থেকে বিরত থেকে এভাবেই জীবন কাটিয়েছেন, আমাদেরও কিছু একটা চেষ্টা করে দেখা দরকার। এভাবে গোটা কোরআন যদি তেলাওয়াত করা সম্ভব না হয়, তাহলে কমপক্ষে একটি সুরা এভাবে তেলাওয়াত করবো। আল্লাহপাক আমাদেরকে সঠিক পদ্ধতিতে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ ভরে বায়তুল্লাহশরিফে হাজির হয়ে সময় কাটানোর সুযোগ দিন! আমিন!!

شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا
[শুকর হায় তেরা খোদায়া ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا
[তু নে আপনে ঘর বুলায়া ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[আপনা দীওয়ানাহ্ বানায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

گرد کعبہ کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[গেরদে কা'বাহ্ কে ফেরায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کردیا
[মুদ্দতোঁ কী পিয়াস কো সায়রাব তুনে করদিয়া]

جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[জামে যমযম কা পিলায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

ڈال دی ٹھنڈک مرے سینے میں تو ساقیا
[ডাল দী ঢান্ডাক মেরে সীনে মেঁ তু সাকিয়া]

اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[আপনে সীনে সে লাগায়, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

بھا گیا میری زبان کو ذکر الااللہ کا
[ভা গিয়া মেরী যবান কো যিকরু ইল্লাল্লাহ্ কা]

یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا
[এহ্ সবক কিস নে পড়হায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

خاص اپنے درکا رکھا تو نے اے مولی مجھے
[খাস আপনে দরকা রাক্‌খা তুনে আয় মাওলা মুঝে]

یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[য়্যোঁ নেহী দর দর ফেরায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا
[মেরী কোতাহী কেহ্ তেরী ইয়াদ সে গাফেল রাহা]

پر نہیں تو نے بھلایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[পর নেহী তুনে ভুলায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

میں کہ تھا بے راہ تونے دستگیری آپ کی
[ম্যায় কেহ থা বে রাহ তুনে দস্তগীরী আপ কী]

توہی مجھ کو رہ پہ لایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[তুহী মুঝ কো রাহ পে লায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

عہد جو روز ازل تجھ سے کیا تھا یاد ہے
[আহদ জো রুযে আযাল তুঝ সে কিয়া থা ইয়াদ হায়]

عہد وہ کس نے نبھایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[আহদ ওহ কিস নে নিভায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

تیری رحمت، تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب
[তেরী রহমত, তেরী শফকাত সে হোয়া মুঝ কো নসীব]

گنبد خضراء کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا
[গাম্বাদে খাযরা কা সায়াহ মেঁ ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

میں نے جو دیکھا سو دیکھا جلوہ گاہ قدس میں
[ম্যাঁয় নে জো দেখা সো দেখা জালওয়াহ গাহে কুদস মেঁ]

میں نے جو پایا سو پایا، میں تو اس قابل نہ تھا
ম্যাঁয়নে জো পায়া সো পায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

بار گاہ سید الکونین میں آکر نفیس
[বার গাহে সাইয়েদুল কাওনাইন মেঁ আকার নফীস]

سوچتاہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا
[সোচতা হোঁ ক্যয়সে আয়া ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

করছি শোকর তোমার খোদা
যোগ্য জানি নই
ডাকলে আমায় তোমার ঘরে
যোগ্য যেনো হই।

করলে আমার তোমার পাগল
যোগ্য জানি নই
তোমার ঘরে ঘুরে খানিক
যোগ্য যোগ্য হই।

তৃষ্ণা মনের মিটিয়ে দিলে
যোগ্য জানি নই

জমজমের ওই অমৃত পিয়ে
যোগ্য যেনো হই।

শান্তি দিলে মনে আমার
যোগ্য জানি নই
বুকের সাথে বুক মেশালে
যোগ্য যেনো হই।

থাকবে মনে তোমার জিকির
যোগ্য জানি নই
সত্য সবক শিখিয়ে দিলে
যোগ্য যেনো হই।

ছাড়লে নাতো হাজার দ্বারে
যোগ্য জানি নই
রাখলে আমায় তোমার দ্বারেই
যোগ্য যেনো হই।

তোমায় সদা রাখবো মনে
যোগ্য জানি নই
তোমার কথাই গাঁথলে মনে
যোগ্য যেনো হই।

ধরলে তুমি হাতটি আমার
যোগ্য জানি নই
আনলে আমায় সরল পথে
যোগ্য যেনো হই।

করবো পূরণ সব ওয়াদা
যোগ্য জানি নই
করলে পূরণ সেই ওয়াদা
যোগ্য যেনো হই।

দিলে আমায় তোমার দয়া
যোগ্য জানি নই
রাখলে আমায় সবুজ ছায়ে
যোগ্য যেনো হই।

যা দেখেছি বেশ দেখেছি
যোগ্য জানি নই

যা পেয়েছি বেশ পেয়েছি
যোগ্য যেনো হই।

বিশ্বনবির দ্বারে এখন
যোগ্য জানি নই
ভাবছি সবি তোমার দয়া
যোগ্য যেনো হই।

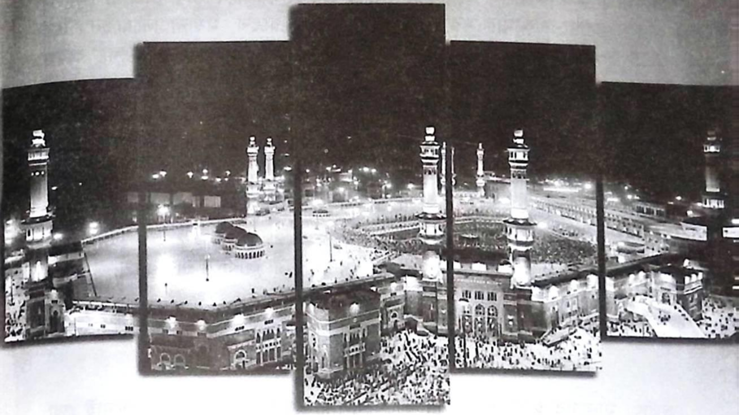

আল্লাহর ঘর!

কাবাশরিফের আরেক নাম বায়তুল্লাহ তথা আল্লাহর ঘর। তার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহপাকের সত্তার তাজাল্লি (দ্যুতি) এখানে এসে ঝরে। আল্লাহপাক সেই জায়গাটিকে তাঁর জন্যে মনোনীত করেছেন এবং সেখানে তাঁর তাজাল্লি (দ্যুতি) ঝরিয়ে সেটিকে আমার ঘর বলে আখ্যায়িত করেছেন, মর্যাদা দিয়েছেন। এর চেয়ে সম্মান আর মর্যাদার কিছু হতে পারে না। স্বাভাবিক নিয়ম হলো, কারও সাথে ভালোবাসা গড়ে উঠলে সর্বপ্রথম তার ভেতর যে আকাঙ্খা তৈরি হয়, সেটি তার ভালোবাসার মানুষের সাথে দেখা করার, তার সাথে কথা বলার। এজন্যেই একলোক বলেছেন–

کبھی اے حقیقتِ منتظر نظر آ لباسِ مجاز میں
[কভী আয় হাকীকতে মানযার নযর আ লিবাসে মাজায মেঁ]
کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں
[কেহ হাযারোঁ সাজদে তড়প রাহে হেঁ মেরী জাবীনে নায়ায মেঁ]
হঠাও যতো পর্দা মনে
তাকাও আমার দিকে
দেখো এথায় সেজদা হাজার
ব্যাকুল আমার দিকে।

অর্থাৎ, মানুষের হৃদয় চায় তার ভালোবাসার সত্তাকে দেখতে। এ জন্যেই তো হজরত মুসা [আলায়হিসসালাম] ব্যাকুল হয়ে আবেদন করেছিলেন, হে আমার প্রভু! আমাকে একটু দেখা দাও, তোমাকে আমি দেখতে চাই বলে; কিন্তু জবাবে মহান আল্লাহপাক বলেছিলেন, না, হে মুসা! (তুমি যেভাবে আমাকে দেখতে চাচ্ছো, সেভাবে) দেখতে পাবে না কখনই। কারণ, এই পৃথিবীটা এতোটাই ছোটো আর দুর্বল যে, সে আমার তাজাল্লির (দ্যুতির) ভার বইতে ও সইতে কোনোটিই পারবে না। তারপর প্রজ্ঞাময় আল্লাহপাক সত্তর হাজার পর্দার ভেতর থেকে তাঁর তাজাল্লির (দ্যুতির) সমান্য হালকা ঝিলিক দেখিয়েছেন, তাতেই বিশ্বের সেরা মজবুত তুর পাহাড়টি টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এর দ্বারা হালকা অনুমান করতে পারেন, আল্লাহপাকের তাজাল্লির (দ্যুতির) প্রভাব কেমন প্রখর? কতো প্রতিক্রিয়াশীল সেই তাজাল্লির (দ্যুতির) নুর (আলো) আল্লাহপাক বায়তুল্লাহশরিফে নামান এবং সেটিকে আমার ঘর বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

অগত্যা মানুষ যখন তার প্রিয়তমকে দেখতে ব্যর্থ হয়, তখন আপাতত তার নিদর্শন বা স্মৃতিজড়িত জিনিসপত্রগুলো দেখে কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করে। আপনারা দেখে থাকবেন, কোনো মায়ের যুবক সন্তান যদি অকালে মারা যায়, তখন সেই শোকাহত মা তার সন্তানের স্মৃতিবিজড়িত জিনিস বা ব্যবহৃত আসবাবপত্র দেখে নেড়ে ছুঁয়ে বা বুকে জড়িয়ে নিয়ে শান্তি খোঁজার চেষ্টা করে। সবকিছু দেখে বলে, এটি আমার বাবার প্রিয় জামা, এটি তার খেলার ব্যাট, এখানে, এই বিছানায় সে ঘুমাতো ইত্যাদি।

যা লুকানো যায় না

ঠিক এভাবে যেহেতু আমরা আল্লাহপাককে দেখতে পাবো না, তাই তাঁর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ কীভাবে ঘটাবো? কথায় বলে, দুনিয়ার বুকে দু'টি জিনিস কখনোই কোনোভাবেই লুকিয়ে রাখা যায় না; চাই যতোই চেষ্টা করা হোক না কেনো? আর সে দু'টি হলো, এশক ও মেশক (প্রেম-ভালোবাসা ও সুগন্ধি)। যেখানেই রাখা হোক না কেনো, মেশক বা সুগন্ধি তাকে প্রকাশ করবেই, চারপাশে তা ছড়িয়ে পরবেই। নিজেই বলে দেবে, সে কার কাছে আছে। তেমনি অবস্থা এশকেরও। এই এশক বা প্রেম-ভালোবাসা কখনই লুকিয়ে থাকে না। কারও হৃদয়ে তার আগমন ঘটলে তার প্রকাশ ঘটবেই ঘটবে; বরং চাপ দিয়ে তাকে যতোই গোপন রাখার চেষ্ট করা হবে, সে আরও প্রচণ্ড গতিতে ছড়িয়ে পরবে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি মোমিনের অন্তরে খোদাপ্রেম বিরাজ করে আর তা প্রকাশ পেতে ব্যাকুল থাকে; কিন্তু সেই প্রকাশের ধরন কেমন হবে? কীভাবে জানান দেবে তার ভালোবাসার? কারণ, আল্লাহপাক এমন একসত্তা, যা কোনো নির্দিষ্ট দিকে বা জায়গায় বিরাজমান নয়। আল্লাহপাক নিজেই বলেছেন–

أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

"তোমরা যেদিকেই মুখ করে দাঁড়াও, সেদিকেই আল্লাহপাক রয়েছেন।"

কোনো দিক নির্দিষ্ট না করে যদি ওপর থেকে এবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়, তাহলে তো মানুষ পাগল হয়ে যেতে পারে। কোন দিকে মুখ করে তারা এবাদত করবে? কেউ পুব দিকে মুখ করে, কেউ পশ্চিমে মুখ করে, কেউ আবার দক্ষিণে, কেউ বা উত্তরমুখী হয়ে। যে যার মতো করে বিশৃঙ্খলভাবে এবাদত-বন্দেগি করবে। ফলে সবার মাঝে কোনো একতা সংহতি গড়ে উঠবে না। তাই আল্লাহপাক তাঁর বান্দার প্রতি কৃপা করে একটি জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আর ঘোষণা করেছেন–এটি আমার ঘর। তারপর থেকে বিশ্বমুসলিমদের জন্যে একটি দিক নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। যে যেখানেই থাকুক না কেনো, সব জায়গা থেকে সবসময়ই একই মুখ করে এবাদত-বন্দেগি করবে। যার নাম বায়তুল্লাহ। যেখানে আল্লাহপাকের তাজাল্লি (দ্যুতি) নামে।

আপনি একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, বিশ্বের প্রতিটি মসজিদের একটি করে মেহরাব রয়েছে, যা দিয়ে কেবলা নির্ধারণ করা হয়। সেখানে ইমাম সাহেব দাঁড়ান; কিন্তু এখানে এই মসজিদেহারামের কোনো মেহবার নেই। কারণ, স্বয়ং এটিই কেবলা। এই কাবাশরিফের দিকে মুখ করেই নামাজ পড়তে হয়। তাই এখানে কোনো মেহরাব নেই। যে যে পাশেই দাঁড়াক না কেনো, শুধু কাবাশরিফের দিকে মুখ থাকলেই চলবে।

'কাবা' শব্দের ব্যাখ্যা
এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, এটাকে 'কাবা' বলা হয় কেনো? এর মানে কী? 'কাবা' শব্দটি 'মাকআব' শব্দ থেকে বেরিয়েছে। অর্থ, ছয় দিকের কাঠামো, যার ছয়টি দিক রয়েছে। চার কোণে চারটি, ওপরে (ছাদে) একটি আর নিচে একটি, এই মোট ছয়টি দিক রয়েছে, তাই এটিকে 'মাকআব' বা 'কাবা' বলা হয় এবং এ নামেই বেশি প্রসিদ্ধি পেয়ে যায়। এ ছাড়া এটিকে 'বায়তুল আতিক'ও বলা হয়ে থাকে। এটি আল্লাহপাকের নিদর্শনগুলোর সেরা একটি নিদর্শন। আল্লাহপাক সেটিকে তার 'নিজ ঘর' হিসেবে চয়ন করেছেন।

একটি সূক্ষ্মবিষয়
একটি সূক্ষবিষয়ের দিকে একটু খেয়াল করুন। আল্লাহপাক ইচ্ছে করলে বায়তুল্লাহ নির্মাণের জন্যে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর মনোরম সুবজ শ্যামলে ঘেরা, ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা দর্শনীয় কোনো জায়গা নির্বাচন করতে পারতেন। যেমন, ভূস্বর্গ কাশ্মিরের কোনো একটি জায়গা পছন্দ করতে পারতেন। হোক তা ফারান উপত্যকা বা নারান অথবা নিলম উপত্যকা, যা দেখে মানুষ বিস্মিত হয়ে যায়। অথবা নির্বাচন করতে পারতেন সিরিয়ার কোনো অঞ্চল, যেখানকার বাগ-বাগিচার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য যেকোনো পর্যটককে বিমুগ্ধ করে কিংবা নির্বাচন করতে পারতেন বিশ্ববিখ্যাত নীল নদের তীরের স্বাস্থ্যকর চিত্তাকর্ষণীয় কোনো এলাকা। অথবা বিশ্বের প্রাচীন কোনো সভ্য নগরী মনোনীত করতে আল্লাহপাকের কোনো সমস্যা ছিলো না; কিন্তু এতোকিছুর পরও এমন একটি জনমানবশূন্য অনুর্বর অঞ্চল বেছে নেয়ার পেছনে অবশ্যই কোনো সূক্ষ কারণ আর তাৎপর্য রয়েছে আর তার একটি কারণ হচ্ছে, এই হেজাজ অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান। আরবের এই ভূখণ্ডটি তিন দিক থেকে পানি দিয়ে বেষ্টিত। শুধু ওপরের একটি দিক গিয়ে সিরিয়ার স্থলভাগের সাথে লেগেছে। এটি অনেকটা মানুষের হৃৎপিণ্ডের মতোই। যেটি দেহের এমন জায়গায় অবস্থিত, যার নিচের তিন দিক থেকে ফাঁকা অবস্থায় শুধু ওপরের দিকে লটকে আছে। যেহেতু সেটি সবসময় স্পন্দিত হয়ে চলেছে আর তার স্পন্দন যতোক্ষণ চালু থাকে, ততোক্ষণ মানুষ বেঁচে থাকে, স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলেই সব শেষ হয়ে যায়। ঠিক তেমনি আল্লাহপাক কাবাশরিফকে বিশ্বের ভৌগলিক আত্মা বানিয়ে রেখেছেন, যতোদিন এই আত্মার স্পন্দন বাকি থাকবে (কাবাশরিফ বিদ্যমান থাকবে), ততোদিন এই পৃথিবী টিকে থাকবে।

হাদিসশরিফে যে কথা বলা হয়েছে, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, কেয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, একজন কৃষ্ণকায় হাবশি কাবাশরিফকে লক্ষ করে তীর (অস্ত্র) (আধুনিক কালের মিসাইল, তখন অন্যকোনো অস্ত্রও হতে পারে) ছুড়বে, যাতে বায়তুল্লাহশরিফ বিধ্বস্ত হয়ে

যাবে। তখন আল্লাহপাক গোটা সৃষ্টিজগতকে ভাজ করে রেখে দেবেন, যার অর্থ হচ্ছে, যতোদিন বায়তুল্লাহ থাকবে, ততোদিন দুনিয়া ঠিকে থাকবে। এজন্যেই কাবাশরিফকে قِيَامًا لِّلنَّاسِ (মানুষের টিকে থাকার কারণ ও মাধ্যম) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহপাকের এই ঘর আমাদের আত্মিকভাবে টিকে থাকার কারণ ও মাধ্যম, সেই সাথে এটি ভৌগলিকভাবে পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড, আল্লাহপাক এই হৃৎপিণ্ডকে খুব পছন্দ করেন।

শাহিমহলের দাবি

এখানে আরও একটি সূক্ষ্মবিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই এলাকার নাম হেজাজ। হেজাজ বলতে বুঝানো হয় বেড়িবাঁধ দিয়ে বেষ্টিত অঞ্চলকে। এখানে মানব তৈরি বেড়ি বাঁধ দেখা না গেলেও প্রকৃতপক্ষে বেড়িবাঁধ অবশ্যই আছে। এখানকার সাগরের দিকে এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন জেদ্দা নগরী। সেই জেদ্দার পর থেকেই দেখা যাবে, সাগরের তীর ঘেষে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের দল, যেগুলোর উচ্চতা গড়ে প্রায় তিনশো মিটার। খুব গভীরভাবে খেয়াল করলে মনে হবে, এগুলো পাহাড়ের সারি নয়, এ যেনো একটি পরিকল্পিতভাবে তৈরি সুদীর্ঘ বেড়ি বাঁধ। সেগুলোর কারণে সাগরের পানি যেমন সে এলাকায় ঢুকতে পারে না, আবার মোটামুটি উচ্চতা থাকার কারণে সাগরের জলভরা সতেজ হাওয়াও তা অতিক্রম করে ওই এলাকায় যেতে পারে না। যার কারণে মক্কানগরী পাতা পল্লবে ভরা সবুজ শ্যামলীমায় ঘেরা মনোরম বনাঞ্চল বা গাছ গাছালিপূর্ণ এলাকা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। অর্থাৎ, বেড়িবাঁধতুল্য এমন সারিবদ্ধ পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকায় সাগরের পানি যেমন সেখানে ঢুকতে পারে না, জলবাহী প্রাণসঞ্চারী হাওয়াও সেদিকে আসে না। যার কারণে এলাকাটি চির অনুর্বর বাগান বা ফসল উৎপাদনে অনুপোযোগী। এজন্যেই আল্লাহপাক পবিত্রকোরআনে এই এলাকার বর্ণনা দিয়েছেন–

بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

"শস্য-শ্যামলহীন অনুর্বর অঞ্চল হিসেবে।"

যার ফলে শুধু বায়তুল্লাহর চারপাশ নয়; বরং তার আশপাশ এলাকার পাহাড়গুলোর দিকে তাকালেও দেখা যায় সেগুলোতে কোনো সজীব গাছপালা নেই, একদম ন্যাড়া ও শুকনা পাহাড়। ছোটোখাটো যৎসামান্য কোনো গাছ দেখা গেলেও সেগুলো মূলত পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গাছপালাশূন্য এলাকা হওয়ায় সূর্যের তাপ প্রখর হলে সেখানে প্রচণ্ড গরম পরে। যার কারণে মক্কা নগরীর গরমের একটি খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি রয়েছে। প্রয়োজনীয় পানি না পাওয়া গেলে এলাকাটি কখনোই মানুষের বাস উপযোগী হতে পারতো না। যার কারণেই ইতিহাস বলে, প্রাচীনযুগে এই এলাকায় কোনো মানুষ বাস করতো না। তবে এটি ছিলো একটি চৌমহনী। ইয়েমেন যেতে হলে অন্যদিকে হিন্দুস্তানের দিকে যাওয়ার পথও এখানেই এসেছে মিলেছিলো।

যেখানে একরাস্তা অন্যরাস্তাকে অতিক্রম করে যায়, তাকে চৌরাস্তা বা চৌমহনী বলে। প্রাচীনকালে এখানে এসেই একরাস্তা আরেক রাস্তা ক্রস করতো। সে যুগে শীতকাল ও গ্রীস্মকালের সফর ভিন্ন ভিন্ন পথে অনুষ্ঠিত হতো। পবিত্রকোরআনে তার উল্লেখ রয়েছে–

رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ

"শীত ও গ্রীস্মকালে আলাদা আলাদা সফর করতো।

অনেক সময় কাফেলা এই চৌমহনীতে যাত্রাবিরতি দিতো; কিন্তু এখানের পানির বন্দবস্ত না থাকায় কোনো জনবসতি গড়ে উঠেনি কখনও। আল্লাহপাক সর্বপ্রথম সেখানে ফেরেশতার মাধ্যমে বায়তুল্লাহশরিফ তৈরি করেন। তারপর হজরত আদম [আলায়হিসসালাম] সেই ভিতের ওপরই তা পুনঃনির্মাণ করেন। এরপর হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর মাধ্যমে তিনি তা আবার নতুনভাবে গড়ে তোলেন। পবিত্রকোরআনে তার বর্ণনা এসেছে এভাবে–

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ

"আর স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন ইবরাহিম ভিত্তি গাড়েন আমার ঘরের আর ইসমাইলও" এই ভিত্তি ফের গাড়া আল্লাহপাকের কাছে খুবই প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিলো।

যার কারণে তার আলোচনা পবিত্রকোরআনে অংশ বানিয়ে নিয়েছেন। এভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া বায়তুল্লাহশরিফ পুনঃনির্মাণ করা হয়; কিন্তু ঘর নির্মাণ হওয়ার পর প্রয়োজন দেখা দেয় আবাদ করার। সেজন্যে হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] আল্লাহপাকের কাছে আবেদন করেন, দোয়া করেন। সাধারণ নিয়ম হলো, শ্রমিক কাজ শেষ করলে তার পরিশ্রমিক পেয়ে যায়। বখশিশও পায় অনেক সময়। তাই হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] বায়তুল্লাহশরিফ নির্মাণের কাজ শেষ করলে আল্লাহপাক তাঁকে পুরস্কার ও বখশিশ দেয়ার ইচ্ছে করেন। আমরা সাধারণত আমাদের সাধ্যমতো যৎসামান্য বখশিশ পুরস্কার বোনাস দিয়ে থাকি; কিন্তু মহান আল্লাহপাক যেহেতু রাজাধিরাজ, তাই তিনি তাঁর মতো করে ঘোষণা করেন, হে ইবরাহিম! তোমার চাওয়ার মতো যা আছে, আমার কাছে চাও! তুমি যা-ই চাইবে, আমি তা-ই দিয়ে দেবো। তারপর প্রার্থীও তার মতো করেই চেয়েছেন। তিনি দুনিয়ার কোনো ধনসম্পদ, রূপ-সৌন্দর্য, পদ-মর্যাদা না চেয়ে আবেদন জানালেন, হে আল্লাহ! আমি শুধু আপনার কাছে হজরত আমেনার 'মোতি' কামনা করি। আমি শুধু সেই অনুগ্রহ চাই, যা আপনার ভাণ্ডারে মাত্র একটিই রয়েছে। তিনি বলেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا

"হে আমার প্রভু! আপনি তাদের মাঝে শেষনবি হজরত মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে পঠিয়ে দিন।"

অর্থাৎ, হে খোদা! আমি আপনার ঘর বানিয়ে দিলাম, আপনি তা আবাদকারী পঠিয়ে দিন। আমি মসজিদ তৈরি করে দিলাম, তাতে যারা নামাজ পড়বে, সেই নামাজের প্রশিক্ষক পাঠিয়ে দিন। আপনার প্রিয়বান্দাকে পাঠিয়ে দিন। মাদরাসা বানিয়ে দিলাম, তার জন্যে ছাত্র শিক্ষকের ব্যবস্থা করুন। আল্লাহপাক তাঁর দোয়া কবুল করেন নেন। যেমনটি নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, আমি হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর দোয়া কবুলের ফসল হিসেবে দুনিয়াতে এসেছি। তারপর আল্লাহপাকের ঘর আবাদ করার জন্যে তিনি এই পন্থা ধরেন। তখন হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] বাস করছিলেন ইরাকে। আল্লাহপাকের তরফ থেকে তাঁর প্রতি নির্দেশ জারি হয়–"তুমি তোমার শিশুপুত্র ইসমাইলসহ স্ত্রীকে নিয়ে আমার ঘরের পাশে চলে যাও।" তারপর তিনি স্ত্রী হজরত হাজেরা ও শিশু ইসমাইলকে নিয়ে এসে কাবাশরিফের পাশে রেখে যান, ফিরে যাওয়ার সময় ধৈর্যশীল স্ত্রী হজরত হাজেরা [আলায়হাসসালাম] জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি আমাদের এখানে রেখে চলে যাচ্ছেন? কোনো জবাব দেন না হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]। তিনি আবার তাঁর পেছনে এগিয়ে এসে বলেন, আপনি কি আমাদেরকে এখানে একা রেখে চলে যাচ্ছেন? এবারও তিনি চুপ। তৃতীয়বার হজরত হাজেরা [আলায়হাসসালাম] বলেন, হে স্বামী! আপনি কি আল্লাহপাকের নির্দেশে আমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছেন? এবার তিনি শুধু সামান্য মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে বলেন, হ্যাঁ, তা-ই।

আল্লাহপাকের প্রতি অসামান্য আস্থাবান মহাধৈর্যশীল হজরত হাজেরা [আলায়হাসসালাম] বলেন, তাহলে চিন্তা নেই, আপনি যদি আমাদেরকে আল্লাহপাকের নির্দেশে এখানে এভাবে রেখে যান, তবে তিনি আমাদের ধ্বংস করবেন না। কথাটি ছিলো খুব সংক্ষেপ। বলতে অনেক সহজ; কিন্তু মা-বোনেরা একটু মন দিয়ে ভেবে দেখুন, আজকাল সুরক্ষিত বাসার এসি রুমেও একজন মহিলা একা থাকতে পারে না। উজ্জল বৈদ্যুতিক আলোর ভেতর বদ্ধঘরে থাকতেও ভয় পায়। স্বামী অফিস থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আতঙ্কে জড়সড় হয়ে থাকে। অথচো তার পাশের বাসা এমন কি রুমেও তার নিকটাত্মীয়-স্বজন সবাই থাকে; কিন্তু হজরত হাজেরার ক্ষেত্রে অবস্থা ও প্রেক্ষাপট কেমন ছিলো। একদম নির্জন এলাকা, বিজনভূমি। তারপরও চৌরাস্তার মোড়ে, যেদিক দিয়ে কতো ধরনের দস্যু ডাকাতদের আনাগোনা, আশপাশেও কোনো জনবসতি নেই। এমন বিপদজনক জায়গায় কলিজার টুকরা শিশুপুত্রসহ যুবতী স্ত্রীকে একা একা ছেড়ে যাওয়া সামান্য কোনো ব্যাপার ছিলো না, এটি ছিলো আল্লাহপাকের তরফ থেকে একমহাপরীক্ষা। দুধের শিশু ঠিক আছে, তার কোনো চিন্তা নেই। সে মায়ের বুকের দুধ খাবে, ঘুমাবে; কিন্তু মায়ের স্তনে সেই দুধ আসবেই বা কোত্থেকে? যদি মায়ের মুখে কোনো দানাপানি না পরে।

হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] এসব কিছু জেনেশুনেই এমন কঠিন ও অস্বাভাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। এটি ছিলো অসামান্য এক কোরবানি। একজন অসহায় মহিলা একাকি কীভাবে থাকবে? জীবনের আশঙ্কা, ইজ্জত-সম্মানের ভয়, তার ওপর জীবন ধারণের মতো কোনো ধরনের খাদ্যদ্রব্য নেই। না আটা রুটি আছে, না সবজি ডিম, না কোনো ফলমূল!!

হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর কাছেই কিছু ছিলো না তাদের জন্যে আবার কোত্থেকে ব্যবস্থা করবেন? খুবই সামান্য যা কিছু ছিলো, তা-ই তাঁদের কাছে রেখে তিনি চলে যান একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে। একেই বলে ইমান! একদম পাক্কা ইমান। বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করা এটি নবি-রাসুলদের সম্মান ও মাহাত্ম্য। তাকে ইমান বিল গায়েব বলে। আমাদের মতো দুর্বল লোকেরা এধরনের কেনো এর আশপাশের কোনো পরীক্ষার মুখোমুখি হলে নিশ্চিত ১০০% ফেল করে বসবো।

হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর প্রতি নির্দেশ আসে আর তিনি তা শতোভাগ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে দেখান। সেই সাথে হজরত হাজেরা [আলায়হাসসালাম]-এর সাহসটুকু একটু দেখুন! তিনি নিশ্চিন্তে পরম আস্থার সাথে বলেন, যদি আল্লাহর হুকুমে এভাবে রেখে যান, তাহলে আল্লাহপাক আমাদেরকে কখনোই ধ্বংস হতে দেবেন না। এই দৃঢ়বিশ্বাসকে সম্বল করেই তিনি শিশুসহ সেখানে রয়ে যান। তাদের কাছে যৎসামান্য কিছু খাদ্যদ্রব্য ছিলো। তা কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এমন কী পান করার মতো সামান্য পানিটুকুও নেই! অনাহারের কারণে তাঁর বুকের দুধও শুকিয়ে আসে। তিনি না খেয়ে কিছুসময় থাকতে পারলেও দুধের নিস্পাপ শিশু তো আর এভাবে না খেয়ে থাকতে পারে না। স্তনে শিশুর মুখ লাগিয়ে রাখেন; কিন্তু তা থেকে সামান্য পরিমাণ দুধও আর বের হয় না। দুধ বুকে একদম বন্ধ হয়ে যায়।

একটু চিন্তা করুন! সেই কঠিন মুহূর্তে মা হাজেরার অবস্থা কেমন ছিলো? তার ওপর দিয়ে কেমন টর্নেডো বয়ে যাচ্ছিলো? হৃদয় থেকে কেমন রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো? পেরেশান আর বিচলিত অবস্থায় শিশুটিকে একটি পাথরের পাশে শুইয়ে রেখে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে বের হয়ে পরেন একটু পানির খোঁজে। এক ভয় শিশুর কলিজা শুকিয়ে আত্মা ফেঁটে মরে যাওয়ার, আরেক আশঙ্কা কোনো হিংস্রপ্রাণী এসে শিশুটিকে খেয়ে ফেলার। যার কারণে তাঁকে রেখে বেশি দূরে যাওয়াও সম্ভব হচ্ছিলো না। যতোটুকু এগোন, শিশুকে দৃষ্টির আড়াল করতে চান না। সেখানে ছিলো টিলার মতো দু'টি ছোটো পাহাড়। তার একটির ওপর চড়ে আগে শিশুর দিকে তাকিয়ে দেখেন, এরপর অন্যদিকে তাকিয়ে চেষ্টা করেন কোনো পানির উৎস খুঁজে বের করার; কিন্তু তেমন কোনো আলামত দেখা গেলো না। সেখান থেকে নেমে আরেক পাহাড়ে যেতে থাকেন, মাঝামাঝি যাওয়ার পর

শিশু ইসমাইল দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। তখন আতঙ্কিত হয়ে জোড়ে দৌড়াতে শুরু করেন। হজরত হাজেরা [আলায়হাসসালাম]-এর এই দৌড় আল্লাহপাকের কাছে খুবই ভালো লাগে, পছন্দ হয়ে যায়। যার কারণে পরবর্তী উম্মতের জন্যে অতোটুকু জায়গা দৌড়ানোর নির্দেশ দিয়ে দেন এবং সেই জায়গাটুকু দু'টি সবুজ খুটি দ্বারা চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে, যাকে 'মিলাইনে আখজারাইনে' বলা হয়। সব হাজিকেই সায়ি করার সময় এই জায়গাটুকু দৌড়িয়ে পার হতে হয়। এটি হজরত হাজেরা [আলায়হাসসালাম]-এর প্রতি সহমর্মিতা ও সম্মান দেখানো। চাই সায়িকারী যতো বড়ো পির সাহেব, মুফতি সাহেব, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী বা অন্য যা কিছুই হোক না কেনো, তাকে এখানে দৌড়াতেই হবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

আল্লাহপাকের কাছে এই দৌড় খুব ভালো লাগে। হজরত হাজেরা সেই সাফা মারওয়ার মাঝে একাধারে দৌড়াতেই থাকেন। এদিকে প্রচণ্ড তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে শিশু ইসমাইল তাঁর পা আছড়া আছড়ি করতে থাকে, এমন অবস্থায় আল্লাহপাকের রহমতের দরোজা খুলে যায়। তাঁর পায়ের গোড়ালির আঘাতে আল্লাহপাক সেখান থেকে বরকতময় পানির ফোরারা চালু করে দেন। ওদিকে একের পর এক বিরতীহীন সাতবার দৌড়াদৌড়ির পর ক্লান্ত শ্রান্ত হাজেরা শিশুর দিকে তাকিয়ে দেখেন তাঁর পাশ দিয়ে পানির মতো কী যেনো বয়ে চলেছে। সাথে সাথে তিনি সেখানে ছুটে এসে কলিজার টুকরাকে বুকে তুলে নেন। এরপর পানির চারপাশে বালু-মাটি দিয়ে তা আটকে রাখার চেষ্টা করেন; কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণ হয় না। তখন তিনি আঞ্চলিক ভাষায় বলে ওঠেন زَمْ زَمْ (থেমে যাও, থেমে যাও)। তখন সেটি এককুয়োয় পরিণত হয়ে যায়। যেটি মক্কামোকাররমায় বসতি গড়ে ওঠার কারণ আর মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় এবং আস্তে আস্তে সেখানে লোকজন আসতে শুরু করে। পর্যায়ক্রমে সেখানে জনবসতি গড়ে ওঠে। যা আজ বিশ্বের একটি সেরা নগরীতে পরিণত হয়েছে; কিন্তু তারপরও এটি ছাড়া তার আশপাশের গোটা এলাকাজুড়ে শুধু শুকনো পাহাড় আর পাহাড়!

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে, আল্লাহপাক যদি ইচ্ছে করতেন, তাহলে বিশ্বের সবচেয়ে নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এলাকায় তার ঘর তৈরি করতে পারতেন। সে জন্যে ভূস্বর্গ কাশ্মিরে কোনো মনোরম উপত্যকা এর জন্যে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত ছিলো। অথবা সিরিয়ার বাগ-বাগিচায় ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চারণভূমি অনেক ভালো ছিলো বা নীল নদের সৈকত কিংবা তার অন্যপাশের স্বাস্থ্যকর পর্যটন এলাকা হতে পারতো এজন্যে আদর্শ জায়গা; কিন্তু তারপরও এমন সুন্দর সুন্দর এলাকাগুলো কেনো পছন্দ করেননি? সবকিছু বাদ দিয়ে বেছে নিয়েছেন এমন জনমানবহীন অনুর্বর মরুএলাকা!

বিজ্ঞ ওলামায়েকেরাম নানাভাবে এসব জিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

যার যার অবস্থান থেকে নিজের মতো করে, যা সবার কাছে সমানভাবে যৌক্তিক নাও হতে পারে। যেমন, কেউ কেউ বলেছেন, প্রকৃত বাস্তবতা হলো, সম্রাটদের বাসভবন সাধারণত কোলাহলমুক্ত সুনসান এলাকায় হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে তার মাহাত্ম্য, গাম্ভীর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রকাশ ঘটে। একটি স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। হয়তো এমন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রজ্ঞাময় আল্লাহপাক সবুজ-শ্যামলীমায় ঘেরা ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা নৈসগির্ক কুঞ্জবন এলাকা বাদ দিয়ে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি, বড়োত্ব, মাহাত্ম্য, মর্যাদার সাথে খাপ খাইয়ে, তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে মতো এমন কোলাহল আর ঝামেলামুক্ত নিরিবিলি শুষ্ক এলাকা নির্বাচন করেছেন, যা পাহাড়-পর্বতে ঘেরা নিরাপদ অঞ্চল। যেই পাহাড়ি নির্জন এলাকায় ঘুরে বেড়ালে মহান রাজাধিরাজের মাহাত্ম্যের কথা মনে পরে। এ কারণেই মহানবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] নবুয়ত লাভের আগে এই নির্জন এলাকায় সাওরগুহায় তাঁর প্রভুর এবাদত-সাধনায় মগ্ন থাকতেন। যা আত্মসাধনার পুরোপুরি অনুকূলে।
আল্লাহর অন্যবান্দারাও যেনো নিরিবিলিভাবে প্রশান্ত মনে ঝামেলামুক্ত পরিবেশে পরম একাগ্রতার সাথে তাঁর এবাদত-বন্দেগি করতে পারে, তাঁকে স্মরণ করে, সেই মহৎউদ্দেশ্য থেকেই তিনি এমন পাহাড় বেষ্টিত সুনসান এলাকা নির্বাচন করেছেন তাঁর ঘরের জন্যে।

জেদ্দা নগরী

এখান (মক্কা) থেকে কয়েক কিমি দূরে সমুদ্রউপকূল ঘেষে একটি শহর গড়ে উঠেছে, যাকে জেদ্দা বলে। সেই শহর হয়েই আমরা এখানে আসি, সেই শহর, নগরী বা জায়গাটিকে 'জেদ্দা' করে নামকরণের পেছনে কয়েকটি কারণ পাওয়া যায়। তার একটি হচ্ছে, কোনো কোনো বর্ণনা মতে, মা হাওয়া [আলায়হাসসালাম] জান্নাত থেকে প্রথম এখানে নেমে এসেছিলেন। এখানেই তাঁর কবর রয়েছে বলে জানা যায়। সেই জায়গাটি এখনও চিহ্নত করে রাখা হয়েছে।

فَهِيَ جَدَّةُ جَمِيْعِ الْعَالَمِ

"সাধারণভাবে হাওয়া [আলায়হাসসালাম] সব মানুষের মা।"

তবে অনেকে তাঁকে দাদি হিসেবেও বলে থাকে। আর আরবিতে দাদীকে বলা হয় 'জাদ্দাতুন।' যার আঞ্চলিক সহজ উচ্চারণ 'জিদ্দাহ্।' তাই সেই জায়গার নাম 'জেদ্দা' হিসেবে পরিচিত পেয়ে গেছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।
এই জেদ্দা একটি প্রাচীন বন্দরনগরী। সমুদ্রপথের যাত্রীরা এখানে এসে যাত্রাবিরতি দিয়ে কিছুসময় অবস্থান করতো। এলাকায় প্রচুর মৎস্যশিকারী থাকায় এখানে বিরাট মাছের আড়ৎ গড়ে উঠেছিলো; কিন্তু সেখানে মাঝে মধ্যেই

জলদস্যুরা হামলা করে বসতো। সেসব লুটেরা দস্যুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বসতি এলাকার চারপাশে বিশাল প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিলো। যার ফলে সেখানে অবস্থানরতো (ঘুমন্ত) মানুষের ওপর জাহাজে আসা জলদস্যুরা অতর্কিতে হামলা করতে পারতো না।

প্রাথমিকভাবে মাছের ব্যবসাকে কেন্দ্রে করে সেখানে একটি ছোটো জনবসতি গড়ে উঠলেও পরবর্তিতে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কারণে তা দ্রুতো বাড়তে ও প্রসারিত হতে থাকে। যেমন, প্রাচীর নির্মাণের ফলে সুন্দর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে ওঠা, মাছ ধরার পাশাপাশি يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (সেখান থেকে হীরে মোতি পান্না আহরণ ও সংগ্রহ করা), সেখানের দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকালে সবুজ পানির সমারোহ দেখা যায়। এসব ছাড়াও মহান আল্লাহপাক সেখানে কুদরতিভাবে বহুকিছু দিয়ে রেখেছিলেন; কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেটিকে একটি সুপরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ে তোলেন হজরত ওসমান গনি [রদিয়াল্লাহু আনহু]। বলা আছে, হজরত ওসমান গনি [রদিয়াল্লাহু আনহু] সেখানে গিয়ে বহু সময় অবস্থান করেছিলেন এবং সাগরে গোসলও করেছিলেন, সাঁতার কেটেছিলেন। এই কারণেই সাঁতারবিদ্যার সাথে সংশ্লিষ্টরা সেটিকে তাদের সপক্ষের দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন। তারা বলেন, হজরত ওসমানগনি [রদিয়াল্লাহু আনহু] নিজে সাগরে সাঁতার কেটেছেন। মোটকথা, তাঁর সেখানে গমন করা ও সাঁতার কাটার (গোসল করার) বিষয়টি প্রমাণিত।

তো দেখুন, প্রথমে এটি একটি জনবসতি হিসেবে গড়ে ওঠে সাধারণ শহরে পরিণত হয়। তারপর সেটি বন্দরগরীতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং সেখানে আন্তর্জাতিক নৌবন্দর গড়ে ওঠে। পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে নানা রকম সংস্কার ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের কারণে সেটি আজ বিশ্বের একটি সেরা সুপরিকল্পিত উন্নত নগরী হিসেবে পরিণত হয়েছে। যার কারণে তাকে লোহিত সাগরের মহারানী বলা হয়ে থাকে। সেই শহর দিয়েই আমরা পবিত্র মক্কানগরীতে এসে থাকি। যার সমুদ্রউপকূল বেয়ে প্রায় তিনশো মিটার উঁচু বেড়িবাঁধতুল্য বেষ্টনী রয়েছে। যে কারণে সেই এলাকাকে 'হেজাজে আরব' বলা হয়ে থাকে।

মক্কা নগরী মর্যাদা লাভের কারণ

মহান আল্লাহপাক পবিত্র মক্কা নগরীকে অসামান্য সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। এটি সেই মহাঐতিহসিক নগরী, যেখানে শেষনবি মোহাম্মদ বিন আব্দিল্লাহ জন্ম নিয়েছেন। এটি সেই বরকতময় শহর, যেখানে প্রথম আল্লাহপাকের ওহি নেমেছে। এই শহরেই হজরত আবুবকর সিদ্দিক, হজরত ওমর ফারুক [রদিয়াল্লাহু আনহুমা]-এর বাড়ি। হজরত খাদিজাতুল কুবরা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বাড়ি এই নগরীতেই। হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর হিজরতের আগের সব স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই শহরের

সাথেই। যার কারণে এই শহরে আসার সময়, প্রবেশকালে প্রতিটি মোমিনের হৃদয় স্পন্দিত হয়। এখানে আসার আগে এই শহরের আলোচনা করতে করতে যেমন মানুষের জিভ ক্লান্ত হয় না, তেমনি এখানে হাজির হওয়ার পর এই পবিত্র ঘর দেখে তাদের চোখ অশ্রু বিসর্জন দিতেও ক্লান্ত হয় না। এটি একটি আশ্চর্য স্মৃতিবিজড়িত শহর। এই শহরের প্রতি আল্লাহ্‌পাকের প্রিয়নবি হজরত মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর এমন গভীর ভালোবাসা আর হৃদয়ের টান ছিলো, যার কারণে হিজরতকালে এই শহর ছেড়ে যাওয়ার সময় একান্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে অশ্রুসিক্ত চোখে কাবাশরিফের দিকে বার বার পেছন ফিরে তাকিয়ে বলছিলেন, হে কাবাশরিফ! হে মক্কানগরী! হে প্রিয়জন্মভূমি! তোমাকে ছেড়ে যেতে কখনোই আমার মন চায় না। তোমার বিচ্ছেদ বিরহ সইতে পারছি না; কিন্তু কী করবো? মক্কার লোকেরা যে আমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছে না!! এমনই বেদনাবিধুর মনে অশ্রু বিসর্জন দিতে দিতে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] মদিনার পথে রওয়ানা করেন।

এখানেই সেই 'আরকাম ভবন', যেখানে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] দরোজা বন্ধ করে কালেমার তালিম দেয়া শুরু করেন। এই ভবনেই হজরত হামজা [রদিয়াল্লাহু আনহু]-দের মতো মহামনীষীরা এসে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর এটিই সেই জায়গা, যেখান থেকে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] মেরাজ গিয়েছিলেন, এখানেই ছিলো হজরত উম্মেহানি [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর সেই ঘর। এসব কিছুর বিস্তারিত বর্ণনা জেয়ারতে মক্কার আলোচনার সময় দেয়ার চেষ্টা করবো–ইনশাআল্লাহ!

এখন বলার বিষয় হচ্ছে, এই পবিত্র শহর, যার সাথে আমাদের আবেগ জড়িত। এখানে মহান আল্লাহপাক আমাদেরকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহপাক এই শহরের শপথ করে বলেছেন–

لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ

"শপথ! এই শহরের!"

সেই সাথে তিনি এই শহরকে নিরাপদ শহর হিসেবে ঘোষণা করে বলেছেন–

وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

"আর এই নিরাপদ শহরের শপথ!"

সোবহানাল্লাহ! এতো এতো সম্মানিত শহর, এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ নগরী, এই শহরেই এমন একটি ঘর আছে, যাকে আল্লাহপাক তাঁর নিজের ঘরের মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন। আমরা এই সেই ঘরেই অবস্থান করছি। আল্লাহপাক বলেছেন–

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ

"তারপর তারা যেনো এই ঘরের প্রভুর এবাদত করে।"

মহতের মহান দরবার

আমরা এখানে এসে হারামশরিফ দেখে বিস্মিত হয়ে যাই। আপনারা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, হারামশরিফের প্রতিটি গেইটে গেইটে দু'টি করে সুউচ্চ মিনার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যেগুলোর মাঝে ব্যবধান খুব একটা বেশি নয়; কিন্তু দূর থেকে খেয়াল করলে মনে হয় শাহান শাহের দরবারে কে যেনো (মিনার হলো) দু'হাত ওপরে তুলে মোনাজাত করছে! আর এর মাধ্যমে আল্লাহপাক বোঝাতে চাচ্ছেন, এটি আমার কাছে দোয়া প্রার্থনা করার জায়গা, তাই তোমরাও আমার কাছে প্রর্থনা করো। এটি আল্লাহর কাছে চাওয়ার জায়গা, এখানে আল্লাহপাক আমাদেরকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এখানে মোমিনরা আসে একক মন-মানসিকতা নিয়ে একমাত্র আল্লাহপাকের দিকে মনোযোগী হয়ে। যেমন, চুম্বকের দিকনির্ণয়যন্ত্র, যেটি সবসময় উত্তরমুখী হয়ে থাকে। তেমনি প্রতিটি মোমিনের অন্তরও সেই দিকনির্ণয়কারী চুম্বক যন্ত্রের মতো সবসময় আল্লাহপাকের এই ঘরমুখী হয়ে থাকবে, সবার হৃদয় থাকবে এই দিকে আকৃষ্ট। একলোক কতো সুন্দর করে বলেছেন–

تیرا جلال و جمال حی القیوم کی دلیل

[তেরা জালাল ও জামাল হাইয়ুল কাইয়ুম কী দলীল]

وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل

[ওহ ভী জলীল ও জামীল তো ভী জলীল ও জামীল]

সুন্দর ও মহান হওয়া
দলিল তোমার জানি
গুণের মতো চিরস্থায়ী
তাইতো তোমায় মানি!

এই ঘরের ভেতরে দেখলে সেখানে আপনিও হুবহু এমন মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য খেয়াল করতে পারেন। তাই বলা হয়ে থাকে, বিশ্বের অন্যান্য মসজিদ সাধারণ দরবার আর এই মসজিদেহারাম খাস দরবার। এখানে গোটা পৃথিবীর মুসলমানকে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যার কারণে সবাই এখানে এসেই এই আল্লাহপাকের ঘরের তাওয়াফ করে।

কাবাশরিফ আর কালো রঙ

প্রজ্ঞাময় আল্লাহতায়ালা কাবাশরিফের জন্যে কালো রঙ নির্ধারণ করেছেন, যে পাথরে তৈরি, তার রঙও কালো, আবার তাকে ঢেকে রাখা চাদরের রঙও কালো! সোবহানাল্লাহ!!

এর পেছনে অবশ্যই রহস্য আর কারণ রয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানেন, সব জিনিস আলোকে আকর্ষণ করে। আর যে আলোকে আকর্ষণ করা হয়, তা-ই সাদা, কালো, লাল ইত্যাদি দেখা যায়। আলোর সব রঙকে যখন আকর্ষণ করা

হয় এবং সব রঙের অবমিশ্রণ ঘটে, তখন আমরা সাদা দেখতে পাই। আর যা সব রঙকে আকর্ষণ করে, তা কালো দেখা যায়। সোবহানাল্লাহ! এ জন্যে আল্লাহপাক কালো রঙ নির্ধারণ করেছেন, যা আল্লাহপাকের তরফ থেকে ঝরা তাজাল্লি (আলো) সবটুকু শোষণ করে নেয়।

আজকাল আমরা নতুন প্রজাতির গোলাপ ফুল দেখতে পাই, যাকে ব্লাক রোজ বা কালো গোলাপ বলে। যা দেখতে খুবই সুন্দর। সেদিকে তাকালেই চোখজুড়ে যায়, মন ভরে যায়। সেই গোলাপের ওপর নজর পরার সাথে সাথে আমার চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে কালো রঙের কাবাশরিফের ছবি। যার প্রতি আহবান জানিয়ে তাঁর স্রষ্টা বলছেন, এসো এসো, এখানে এসো; তোমরা বিশ্ব কালো গোলাপ (কাবাশরিফ) দেখে যাও, তোমাদের ভালোবাসার চোখ দিয়ে তা দেখো। তারপর হজ ও ওমরা পালনকারীরা এসে তা দেখে প্রশান্তি লাভ করে।

হৃদয়ের আকাঙ্খা

এই কাবাশরিফ নির্মাণকারী খলিলুল্লাহ, আবাদকারী মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, সংরক্ষণকারী স্বয়ং আল্লাহ। প্রত্যেক যুগে যুগেই পৃথিবীর বুকে বহু আলিশান অট্টালিকা রাজপ্রাসাদ এবং জাকজমকপূর্ণ ইমারত তৈরি হয়েছে, কালের আবর্তনে তার সবই ধসে পরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; কিন্তু আল্লাহপাকের এমন একটি ঘর, যা খুবই সাদামাঠাভাবে নির্মিত হয়েছে, সৃষ্টির শুরু থেকে তা আজ পর্যন্ত আপন জায়গায় সমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এভাবে সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহপাকের এটি এমনই একটি ঘর। এ কারণেই নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] অশ্রুভরা চোখে আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে তাকিয়ে থাকতেন। আর মনে মনে আশা পোষণ করতেন, হৃদয়ে আকাঙ্খা লালন করতেন, হে খোদা! তোমার এই পবিত্র ঘরকে আমাদের জন্যে কেবলা বানিয়ে দাও। তাঁর এমন প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে থাকার দৃশ্যের বর্ণনা মহান আল্লাহপাক নিজে তাঁর কিতাব 'কোরআনশরিফ'-এ উল্লেখ করেছেন এভাবে–

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ

"আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম হে রাসুল আপনার চেহারা ঘুরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা।"

হে নবি! আপনার প্রেমেভরা আকাঙ্খা আমার খুব ভালো লেগেছে, যার কারণে আমি এই ঘরকে আপনার, আপনার আগত উম্মতের কেবলা বানিয়ে দিয়েছি। একটু পেছনে ফিরে তাকাতে হবে, ইসলামের শুরুর দিকে পবিত্র বায়তুলমোকাদ্দাস মুসলমানদের কেবলা ছিলো। সেদিকে মুখ করে সবাইকে

নামাজ পড়তে হতো। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] রুকনেইয়ামানি আর হাজরে আসওয়াদের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে বায়তুলমোকাদ্দিসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তেন। ফলে কাবাশরিফও তাঁর সামনে পরে যেতো। যার কারণে দুই কেবলা রক্ষা হতো; কিন্তু মদিনাশরিফ হিজরত করার পর তা দু'টির মাঝা মাঝি থাকার আর দু'টিকে সমন্বয় করে নামাজ পড়া সম্ভব হয় না, তাই হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] সবসময় মনে-প্রাণে চাইতেন, আল্লাহপাক যেনো কাবাশরিফকে কেবলা বানিয়ে দেন। এ জন্যে তিনি আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে অপেক্ষা করতেন এই ভেবে, হয়তো কোনো সময় হজরত জিবরাইল [আলায়হিসসালাম] এমন নির্দেশ (ওহি) নিয়ে আগমন করবেন। আল্লাহপাক নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ব্যাকুল হৃদয়ের সেই ইচ্ছে পুরো করে দেন। কয়েক মাস পরেই কাবাশরিফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ প্রদান করেন। আদেশ পাওয়ামাত্রই (নামাজরতো অবস্থাতেই) বায়তুল্লাহর দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তা বহাল আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। যেনো সেখানে একটি বাতি জ্বলে চলেছে আর পতঙ্গের মতো সব মুসলমান সেই বাতির উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে এবং তার চারপাশে চক্কর দিয়ে (তাওয়াফ করে) চলেছে। আসলে সেটি একটি আল্লাহর নুরের দীপ, যার আলো খালি চোখে দেখা যায় না।

آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشہ دیکھے

[আখ ওয়ালা তেরে জওবন কা তামাশা দেখে]

دیدۂ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

[দীদায়ে কূর কো কিয়া আয়ে নজর কিয়া দেখে]

চর্মচোখে দেখবে যেজন
দেখবে সেজন ভুল
মনের চোখে দেখলে পরেই
দেখতে পাবে ফুল।

এখানে এসে সব মানুষ তাওয়াফ করে। পুরুষ তাওয়াফ করে, মহিলারা তাওয়াফ করে আর এখানকার সেরা এবাদতই হচ্ছে এই তাওয়াফ করা। যা শুধু এখানেই করা যায়।

কাবা হৃদয়ের চুম্বক

আল্লাহপাকের এই ঘরের সাথে প্রতিটি মোমিনের হৃদ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, গভীর ভালোবাসা রয়েছে। আপনারা দেখে থাকবেন, চুম্বক লোহার কণাকে সবসময় নিজের দিকে টানে। তা যেখানেই থাক লোহা বা তার টুকরোকে সে নিজের দিকে টেনে আনবেই। এটি তার সৃষ্টিগতো বৈশিষ্ট আর প্রাকৃতিক স্বভাব, তেমনি

বায়তুল্লাহশরিফও মানুষের হৃদয়ের জন্যে চুম্বকের মতো। এটি মোমিনদেরকে তার দিকে আকর্ষণ করে। টেনে আনে। যার কারণে গোটা পৃথিবীর কোথাও এমন কোনো মুসলমানকে পাবেন না, চাই তার সামর্থ্য থাক বা না থাক, তাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন, আপনার হৃদয়ের প্রধান চাওয়া কী? সে একবাক্যে বলে দেবে, আল্লাহপাকের পবিত্র ঘরের দেখা পাওয়া। গরিব বেচারাও বলবে, ধনী ভদ্রলোকও বলবে, শ্রমিকও বলবে, মালিকও বলবে, পুরুষও বলবে, নারীও বলবে, যুবকও বলবে, বুড়োও বলবে, সবাই বলবে—একবারের জন্যে হলেও যেনো সে বায়তুল্লাহশরিফ দেখে যেতে পারে। এজন্যে সে আপনার কাছে অবশ্যই দোয়া চাইবে।

ইমানের দাবিই হচ্ছে, সব ইমানদারের হৃদয় এজন্যে ছটফট করবে। জানা গেলো, এই কাবাশরিফ মোমিনের জন্যে চুম্বকের মতো, এটি সবসময় মোমিনের হৃদয়কে তার দিকে আকর্ষণ করে। টানতে থাকে।

দুঃখের কাহিনী কাকে শোনাবো?

এখানে আসা লোকেরা সবাই সম্পদশালী নয়; বরং এমনও অনেকে আছেন, যারা কতোদিন কান্নাকাটি আর দোয়া মোনাজাতের পর কতো কষ্টে ও ত্যাগ স্বীকার করে এখানে আসার ন্যূনতম সামানাপত্র জোগাড় করেছে, আল্লাহু আকবার! এরপর আল্লাহতায়ালা কাউকে জীবনে একবার, কাউকে দু'বার, কাউকে বহুবার আসার সুযোগ দিয়েছেন এবং দিয়ে থাকেন। আল্লাহপাক আমাদেরকে যখন এমন সৌভাগ্য দান করেছেনই, তখন আমাদের উচিত এর ঠিকঠাক মূল্যায়ন করা। প্রতিটি মুহূর্তকে সুন্দরভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা। সবসময় এবাদত-বন্দেগিতে মগ্ন থাকার চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

আমাদের ওমরার কাজ তো সম্পন্ন হয়েছে। এখন আমরা এখানে থেকে বাকি কী কী কাজ করবো? আমরা বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দোয়া করবো। তাঁকে রাজি-খুশি করার আপ্রাণ চেষ্টা করবো। হৃদয়ের যতো ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-যাতনা, আফসোস-অনুতাপ, অভিযোগ-অনুযোগ রয়েছে, তার সবকিছু মন খুলে আজ তাঁর সামনে পেশ করবো। গোটা জীবনভর আমরা মানুষের কাছে যেসব নিজের দুঃখ-বেদনা, অভাব-অনুযোগের কথা বলে এসেছি যে, অমুক এই করেছে, তমুক এই ক্ষতি করেছে, এসব অন্যকে বলার কোনোই প্রয়োজন নেই, আজ এখানে ওসবকিছু শুধু এই ঘরের মালিকের কাছেই বলবো, তাঁর কাছে সমাধান চাইবো। দোয়া করবো।

ওলামায়েকেরাম লিখেছেন, হারামশরিফে এমন ১২টি বিশেষ জায়গা রয়েছে, যেগুলো দোয়া কবুলের জন্যে মনোনীত। সেসব জায়গায় দোয়া করলে অবশ্যই কবুল হয়। যেগুলো চিহ্নিত করে দেবো—ইনশাআল্লাহ! যেনো সেসব গ্রহণীয় জায়গায় গিয়ে আপনারা দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে

মোনাজাত করতে পারেন। এখানে বসে কাজই হচ্ছে আল্লাহর কাছে চাওয়া, আপনারা তাঁর দরোজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। এখানে যা চাইবেন, তা-ই পাবেন। তবে হ্যাঁ, সে চাওয়ার অবশ্যই পদ্ধতি রয়েছে। নিয়ম আছে, কৌশল আছে। কৌশল ছাড়া ভুলপদ্ধতিতে চেষ্টা করে কখনও সফলতা পাওয়া যায় না। যেমন, বন্দুক দিয়ে প্রাণহানী ঘটানো যায়। তবে তার আগে সেটি চালানো শিখতে হয়। কৌশল জানতে হয়। নির্দিষ্ট উপায়ে তা চালাতে হয়। এখন যদি কেউ তার ভেতর গুলি ভরতেই না জানে, তাহলে কীভাবে তার স্টিগার চালাবে? আবার গুলি ছাড়া শুধু স্টিগার চাপলেই তো কাজ হবে না।

এখন মনে করুন যে, আল্লাহপাক আমাদের এখানে নিয়ে এসছেন এবং তিনি আমাদের দিতেও চান। আমাদেরকেই তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে। আমরা আল্লাহপাকের কাছে চাইবো, কেঁদে কেঁদে চাইবো, সেজদায় লুটিয়ে চাইবো, একা একা চাইবো, সমবেতভাবে চাইবো। যেভাবে চাইতে পারি, সেভাবেই চাইবো, আপন প্রভুর কাছে মনপ্রাণ ভরে চাইবো। তারপর দেখতে পাবেন কীভাবে তাঁর বরকত প্রকাশ পেয়ে চলেছে।

এখানে এমন এমন সব দোয়া কবুল হয়, যা শুনে মানুষ হয়রান হয়ে যায়, বিস্মিত হয়ে যায়। এসবের বিস্তারিত আলোচনা আমি তো মাঝে মধ্যেই করে থাকি এবং আগামীতে বলতেই থাকবো, আল্লাহপাকের কেমন বরকত আর নিদর্শন এখানে দেখা যায়, প্রতিফলিত হয়, তা যদি বান্দা জানতে না পারে, বুঝতে না পারে, তাহলে এখানে এসেও তারা বহুকিছু থেকে বঞ্চিত রয়ে যাবে। খালি হাতে ফিরে যাবে!!

চিন্তার বিষয়

আপনারা শুনে অবাক হয়ে যাবেন। একবার আমি তাওয়াফ করছিলাম। এমন সময় ভাবলাম, এখন বায়তুল্লাহর দরোজার সামনে ভীড় কিছুটা কম আছে, তাই ওখানে গিয়ে দোয়া করা যাক। সে উদ্দেশ্যে মুলতাজামের পাশে এগিয়ে দাঁড়াই, আমার পাশেই একতরুণ দাঁড়িয়ে ছিলো। চেহারা সুরত দেখে মনে হলো, লাহোরি হবে হয়তো। এমন সময় তার মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। সে তা রিসিভ করে কথা বলতে থাকে, মনে হচ্ছিলো ওপ্রান্ত থেকে তাকে বলা হচ্ছিলো তার বাসার কেউ অথবা কোনো আত্মীয়-স্বজন অসুস্থ হবে।

এখান থেকে সেই তরুণ বলছিলো, তাহলে তাকে 'দাতা দরবার দরগায়' (মাজারে) নিয়ে যাও। কী আজব ব্যাপার! এখানে সে খোদ আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে থেকে অন্যকে বলছে বিপদমুক্তির জন্যে তাকে বান্দার দরবারে নিয়ে যেতে। সে কি একটু অনুভবও করতে পারছে না সে এখন কোথায় দাঁড়িয়ে

আছে? স্বয়ং আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়েও সে আল্লাহকে ভুলে গেছে? অন্যকে বলছে, বান্দার কাছে সাহায্য চাইতে? আকিদা-বিশ্বাস কোন পর্যায়ে চলে গেলে কেউ এমন করতে পারে? যেখানে এসে প্রার্থনা করলে মানুষের জীবন বদলে যায়, সেখানে আসার পরও তার ইমান আকিদা বদলালো না? তাহলে আর কী-ই বা বলার আছে!

সময় কীভাবে কাটাবো?

তাই এজন্যে চেষ্টা করবো এ সময়টুকু এবাদত, তেলাওয়াত, তাওয়াফ ও জিকির-আজকারের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিতে। দিনের বেলায় গরম বেশি পরে, অনেক সময় শয়তান ধোঁকা দিয়ে বলে, জোহরের সময় তাওয়াফ সেরে নেবে; কিন্তু না আমরা এমন প্রচণ্ড গরম সহ্য করতে পারবো না। পরীক্ষা করে দেখার দরকার নেই, আমাদের আগের বুজুর্গানেকেরাম অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বলে গেছেন, দিনের বেলায় পুরুষেরা হারামশরিফে গিয়ে নামাজ পড়বে আর মহিলারা কামরায় থেকে সেখানেই নামাজ আদায় করবে। তাহলে এতেই বরং বেশি সোয়াব পাওয়া যাব, তবে এশার নামাজের সময় গরম কমে পরিবেশ ঠাণ্ডা হয়ে আসে, নারী, শিশু সবার জন্যে অনুকূল। তাছাড়া তখন মহিলাদের মাতাফে ওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকে না। তাই এ সময়টাতে তারা শান্তভাবে ওয়াফ করতে পারে। সাথে শিশুদেরও রাখা যেতে পারে। সেই সাথে এ য়ে বেশি বেশি এবাদত-বন্দেগি ও দোয়া-মোনাজাত করবে।

আমার একটি অভিজ্ঞতামূলক পর্যালোচনা রয়েছে, নারীরা সাধারণত দিনেরবেলা বের হবে না, নিজেদেরকে গরমের তীব্রতা থেকে রক্ষা করবে। তা না হলে তারা দ্রুতো অসুস্থ হয়ে পরতে পারে। শিশুরাও অসুস্থ হতে পারে। তাই তারা দিনে বাসায় বসে বসে এবাদত-বন্দেগি, কোরআন তেলাওয়াত আর জিকির-আজকার করবে, রাতেরবেলা ভালোভাবে খাবার খেয়ে প্রশান্ত মনে তাওয়াফ করতে চলে আসবে। পারলে গোটা রাত হারামশরিফে কাটিয়ে দেবে।

এটি খুবই সৌভাগ্যের কথা, খুবই সুন্দর কাজ। এশার পর নারীদেরকে আসার কথা বলার আকেরটি কারণ হচ্ছে, দূর-দূরান্ত থেকে আসা লোকেরা এশার পর থেকে নিজ নিজ বাসায় চলে যায়। ফলে ভীড় অনেক কমে যায়। ফলে তাওয়াফ করা অনেকটা সহজ হয়। এমন কি অন্যসব এবাদতও খুব শান্তিপূর্ণভাবে ধীরেসুস্থে পালন করা যায়। এরপর তাহাজ্জুদ নামাজ শেষে মহিলারা বাসায়ও আসতে পারে বা তাদের জন্যে নির্ধারিত জায়গায় ফজর নামাজ আদায় করে ফিরে আসবে; কিন্তু তার আগে রাতের বেলায় তারা খুব ভালোভাবে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। মনপ্রাণ খুলে চাইতে থাকবে।

কারণ, তাঁর কাছে চাওয়াটাই তো আসল। ভিক্ষুকের কাজই তো চাওয়া। এখানে আবার শরমের কী আছে? বরং আল্লাহর কাছে চাইলেই তিনি আরও বেশি খুশি হন। কতো রকমের চাওয়ার থাকতে পারে। মনপ্রাণ উজার করে তা চেয়েই যাবে। আল্লাহপাক অবশ্য অবশ্যই তা পুরো করবেন।

দোয়া করি, আল্লাপাক যেনো এই মহামূল্যবান সময়টুকু সুন্দরভাবে কাজে লাগাবার সুযোগ দেন!

জীবনের অতি মূল্যবান যে কয়েকটি দিন এখন আমরা পেয়েছি, এটি আমাদের খুবই মুখ্য সময়। যা এখানে কাটাচ্ছি। এমন মুখ্য আর সুবর্ণ সময় মানুষের জীবনে বার বার আসে না। আল্লাহপাক যখন এমন মহাসুযোগ দিয়েই দিয়েছেন, তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, এর ঠিকঠাক মূল্যায়ন ও সদ্ব্যবহার করা।

আমি দেখেছি, অনেক বন্ধুর বাজারের দোকানপাট সম্পর্কে খুব পরিষ্কার ধারণা এবং জানা শোনা আছে। কোন জিনিস কোন মার্কেটে পাওয়া যায়, সেগুলো তাদের নখদর্পণে। অথচো হারামশরিফে কোন জায়গা কেমন বরকতময়, কোথায় কোথায় নামাজ পড়ে দোয়া করলে কবুল করা হয়, তা তাদের জানা নেই। যার কারণে তারা মনে করে একটি তাওয়াফ করে নিয়েছি, ব্যস, ওমরা করে ফেলেছি, এখন বাকি দিনগুলো মার্কেটের দোকানে দোকানে তাওয়াফ (ঘোরাঘুরি) করার জন্যে বরাদ্দ! তাই মেয়েদেরকে বাজারে তাওয়াফ (ঘোরাঘুরি) ও কেনাকাটা করতে বেশি দেখা যায়। যদি নোট করে রাখা হয়, তাহলে দেখা যাবে, কাবাশরিফ তাওয়াফ করার চেয়ে মার্কেটে তাওয়াফ করার পরিমাণটা তাদের অনেক বেশি হবে। সাবধান, এমন করা মহাদুর্ভাগার আলামত। তাই বেশি বেশি বায়তুল্লাহশরিফের তাওয়াফ করতে হবে। আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে চাইতে হবে। তাঁকে খুশি করতে হবে। শুধু আমাদের এখানে হাজির হতে পারাটাই যথেষ্ট নয়। এখানে পৌঁছুতে পারা একটা মস্তবড়ো অনুগ্রহ। এখন এখানে পৌঁছার পর নিজের সময়গুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। এজন্যে সবসময় চিন্তিত থাকা দরকার। বেশি সময় এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা দরকার। চলতে, ফিরতে, উঠতে, বসতে কালেমা, দরুদশরিফ বেশি বেশি পড়া দরকার, মুখে ও অন্তরে যেনো সবসময় আল্লাহর জিকির ও স্মরণ বিরাজ করে।

প্রতিজ্ঞায় অটল থাকুন

বিশেষভাবে নিজ নিজ চোখের হেফাজত করবেন। যেহেতু শয়তান এখানে এসেও পেছনে লাগে। সে মানুষের দৃষ্টি নিচু রাখতে অপারগ বানিয়ে দেয়, যার কারণে তাদের দৃষ্টি এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করে। আর এতে করে যদি

একবার নিষিদ্ধ জায়গায় (পরনারীর ওপর) বদনজর পরে যায়, তাহলে তাতে করে তার গোটা দিনের আমলই ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে না তার দোয়ার প্রভাব পরে, না সে আমল করে মজা পায়। যেভাবে এসেছিলো, সেভাবেই শূন্য হাতে ফিরে যায়। তাই নিজ নিজ এবাদত হেফাজত করাও ভীষণ জরুরি। বলা হয়েছে, বাইরে মানুষ পাপ কাজ করার পরই শুধু সে সাজার যোগ্য বিবেচিত হয়; কিন্তু এখানে (হারামশরিফে) পাপকাজের ইচ্ছে করলেই সে সাজার যোগ্য হয়ে যায়। বলা হয়েছে–

وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ.

"এখানে যে জুলুম (পাপকাজ) করার ইচ্ছে পোষণ করে, তাকে আমি বেদনাদায়ক আজাব ভোগ করাবো।"

তাই কোনোভাবেই এখানে কোনো ধরনের পাপকাজের নিয়ত বা ইচ্ছেই করা যাবে না। খারাপ উদ্দেশ্যে কোনোদিকে তাকানো যাবে না। যৌনোচাহিদা নিয়ে কারও দিকে নজরই করা যাবে না। কারণ, নজর দেয়ার সাথে সাথে পাকড়াও হতে হবে, সাজা ভোগ করতে হবে। তাই এখানে অবস্থানকালে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। হারামশরিফের মার্যাদার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদে জড়ানো যাবে না। কারও ওপর উত্তেজিত হওয়া চলবে না। মসজিদে যাওয়ার পর অন্যকেউ যদি জায়গা চায়, স্বেচ্ছায় তাকে জায়গা ছেড়ে দেবে। হাদিসে এসেছে–

إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ.

আর যদি তোমাদের বলা হয় একটু জায়গা ছেড়ে দিন, তাহলে তার জন্যে বসার জায়গা করে দাও, তাহলে মহান আল্লাহপাক তোমার জন্যে সবকিছু চওড়া করে দেবেন।"

এখানে কারো সমালোচনা করবেন না, ভুল ধরতে যাবেন না। শুধু নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, এবাদতে ডুবে থাকবেন। আল্লাহপাক এমন সুযোগ দিয়েছেন, মানে তিনি যেনো একটি ব্যাংকের ফাঁকা চেক দিয়ে দিয়েছেন! সেখানে যতো ইচ্ছে পরিমাণ বসিয়ে তা উঠাতে পারেন। হাজার, লাখ, কোটি, বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন, যতো ইচ্ছে। কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তবে সে সংখ্যা অবশ্যই সতর্কতার সাথে বসাতে হবে। যেনো ভুল বা কাটাকাটি না হয়। তাহলে কিন্তু সব বিনাশ হয়ে যাবে। চেক অকার্যকর হয়ে পরবে। বহু মানুষের এই চেক অকার্যকর হয়ে যায় পাপের কারণে। এদিকে ওদিকে অন্যায়ভাবে তাকাতাকি করার অপরাধে। তাই খুব সাবধানতার সাথে চলতে হবে। চোখকে হেফাজত করতে হবে। তাহলে আল্লাহপাকের এই ঘর থেকে কিছু নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

আল্লাহপাক আমাদের কল্যাণ কামনা করেন বলেই তো আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছেন, এখন আমাদেরকে এর ঠিকঠাক ব্যবহার করতে হবে। তিনি আমাদের দিতে চান; কিন্তু আমাদেরকে তো তা বুঝে নিতে হবে।
হে খোদা! আমাদেরকে তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেয়ার সুযোগ দাও আর বাকি সময়টুকু খুব বেশি বেশি এবাদত-বন্দেগি, জিকির-আজকার আর তোমার স্মরণে ডুবে থাকার শক্তি-সাহস দাও! আমিন!!

নবির তরেই কোরবান আমার প্রাণ

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي التُّرْبِ أَعْظُمُهُ

[ইয়া খইরা মান দুফিনাত ফিত্ তুরবি আ'জুমুহূ]

فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَ الْأَكَمُ

[ফা ত-বা মিন তীবিহিন্নাল ক-উ ওয়াল আকামূ]

نَفْسِي الْفِدَآءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ

[নাফসীল ফিদা-উ লিকবরিন আনতা সা-কিনুহূ]

فِيْهِ الْعَفَافُ وَ فِيْهِ الْجُوْدُ وَ الْكَرَمُ

[ফীহিল আফা-ফু ওয়া ফীহিল জূদু ওয়াল কারামূ]

এ মাটিতে ঘুমিয়ে যিনি
সেরা সবার তিনি
যার ছোঁয়াতে ধন্য মাটি
পবিত্রজন তিনি।

এ অধমের প্রাণটি কবুল
তাঁর কদমে যিনি
জগত সেরা দান ও ধ্যানে
পবিত্রজন তিনি।

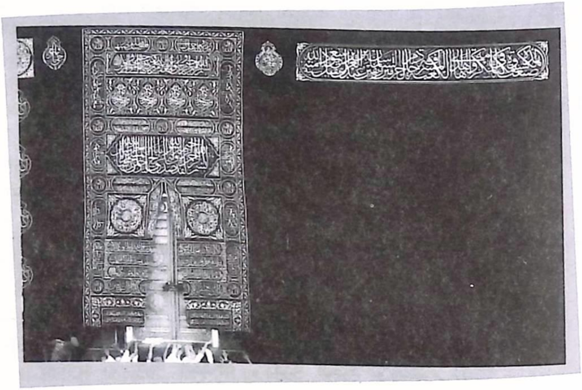

কাবার গেলাফ
আর
হাজরে আসওয়াদ

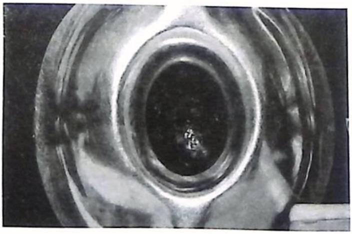

এবাদতের প্রথম ঘর

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ

"নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম ঘর, যা নির্মাণ করা হয়েছে মানুষের জন্যে। শহরের নাম মক্কা আর মক্কাশরিফে অবস্থিত আল্লাহপাকের ঘরের নাম 'বাক্কা।'"

এটি ছিলো সর্বপ্রথম ঘর। এর অর্থ হলো, শুধু আল্লাহর এবাদতের জন্যে নির্মিত এটি সর্বপ্রথম ঘর। বসবাসের জন্যে এর আগেও ঘর নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। আবার নাও থাকতে পারে। কারণ, হজরত আদম [আলায়হিসসালাম] সর্বপ্রথম আল্লাহর নির্দেশে এই ঘর নির্মাণ করেন। (তিনি সৃষ্টির প্রথম মানুষ। সেই জায়গায় সেই ভিত্তির ওপর হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] ছেলে ইসমাইল [আলায়হিসসালাম]-কে সাথে নিয়ে তা পুনঃনির্মাণ করেন। এরপর নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর নবুয়ত লাভের শুরুতে মক্কার কোরাইশরা তা আবার নির্মাণ করে। এই ঘরকেই বলা হয়েছে এবাদতের জন্যে নির্মিত বিশ্বের প্রথম ঘর।

কাবাশরিফের গেলাফের ইতিহাস

শুরুতে কাবাশরিফের ওপর গেলাফ (চাদর) ছিলো না, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্মের প্রায় নয়শো বছর আগে তুব্বা নামের এক ইয়েমেন সম্রাট কাবাশরিফের ওপর গেলাফ (চাদর) দিয়ে তা ঢেকে দেন। তারপর থেকে এ ধারা অব্যাহতভাবে চলে আসছে। মক্কার কোরাইশরা তাদের যুগে তাতে রেশমের গেলাফ পরিয়ে দেয়। এরপর নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তার ওপর ইয়েমেনি মিসরি চাদরের গেলাফ পরিয়ে দেন। যেহেতু স্বয়ং নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] এই কাজের প্রত্যয়ন করেছেন, তাই এখন সেটি একটি শরয়ি কাজ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। তারপর আব্বাসীয় খলিফারা তাতে কালো রঙের চাদর পরিয়ে দেয়। এর আগে নির্দিষ্ট একরঙের চাদর ছিলো না। কখনও কালো, কখনও সবুজ, কখনও বা অন্যরঙের। এখনও খুব খেয়াল করে দেখলে বুঝতে পারবেন, কাবাশরিফের বাইরের দিকে চাদর একদম মিশমিশে কালো আর ভেতরের চাদরকে কিছুটা সবুজ মনে হবে। ইনশাআল্লাহ হজ শেষে সুযোগ হলে আপনাদেরকে 'কিসওয়াতুলকাবা' নামের জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবে। যেখানে কাবাশরিফের গেলাফ তৈরি হয়। তাহলে কীভাবে গেলাফ তৈরি (বুনন) হচ্ছে তা নিজের চোখে দেখতে পাবেন। এটি রেশমি সুতা দিয়ে তৈরি করা হয় আর তার ওপর সোনার তার দিয়ে আয়াত লেখা হয়। যার কারণে এই গেলাফের ওজন অনেক বেশি হয়ে যায়। একটি গেলাফ তৈরিতে সাতশো কেজি রেশমি সুতা লাগে আর সব মিলে তার ওজন দাঁড়ায় দুই টনের কাছাকাছি। এই প্রায় দুই টন ওজনের পোশাক প্রতি বছর কাবাশরিফের গায়ে নতুন করে পরানো হয়।

গেলাফ বদলের সময়

সাধারণত আরাফার দিনে হাজিরা যখন সবাই আরাফার ময়দানে চলে যায়, তখন এখানে তাওয়াফকারীর সংখ্যা অনেক কমে আসে। এই ফাঁকে তার গেলাফ বদলের কাজটা সেরে ফেলা হয়। এ কারণেই তাওয়াফেজেয়ারতের সময় ফিরে এসে একদম নতুন ঝলমলে গেলাফ দেখা যায়।

গেলাফ কী?

গেলাফকে বলা হয় কেসওয়া, অর্থ এমন চাদর, যা (শরীরের সাথে) লেপ্টে বা জড়িয়ে থাকে। তাই 'কেসওয়াতুলকাবা' মানে কাবাশরিফের সাথে জাড়িয়ে থাকা চাদর। মনে করুন, এটি বায়তুল্লাহশরিফের এহরাম, অন্যভাষায় বলা যায় বায়তুল্লাহশরিফের বোরকা বা হিজাব।

গেলাফ পরানোর রহস্য

কাবাশরিফকে গেলাফ দিয়ে ঢেকে রাখার মধ্যে বেশ কিছু কারণ ও রহস্য আছে। যেমন, ১. মানুষ যখন বায়তুল্লাহশরিফের কাছে গিয়ে তার গেলাফ আঁকড়ে ধরে দোয়া করে কান্নাকাটি করে, তখন এমন অনুভব হয়, যেনো তারা খোদ প্রিয় আল্লাহপাকের আঁচল জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করছে, ফরিয়াদ জানাচ্ছে প্রিয়মাবুদের। আঁচল জড়িয়ে ধরে আবেদন করার মাঝে মানুষের অন্তরিকতা, একাগ্রতা ও আস্থা বেশি জন্মে, যে কারণে খোদ নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]ও কাবাশরিফের গেলাফ ধরে দোয়া করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

২. সাধারণ দুনিয়ার নিয়মও হচ্ছে মূল্যবান আর স্পর্শকাতর ও কোমল জিনিসগুলো সুন্দরভাবে ঢেকে রাখতে হয়, যে কারণে সবাই দামি জিনিসপত্র সবসময় উন্নত মানের প্যাকেটে বক্সে পুরে রাখে বা অন্যকিছু দিয়ে ঢেকে রাখে। আর আল্লাহপাক সবসময় সুন্দর বস্তুকে ঢেকে রাখতে পছন্দ করেন। এটি সহজাত স্বভাব আর নিয়মও বটে। এ কারণেই নারীরা বেশি সুন্দর বলে তাদের পর্দায় থাকার বিধান দিয়েছেন।

প্রথম আসা হাজিদের জন্যে এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, নইলে তাদের হৃদয়ের চেয়ে চোখ নিয়ন্ত্রণ করা আরও কষ্টকর হতো। তারা বায়তুল্লাহর সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে শুধু সেদিকেই তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করতো। এখনও খোদাপ্রেমিকদের যদি তাওয়াফের সময় বায়তুল্লাহর দিকে তাকানো নিষেধ করা না হতো তাহলে জানি না তাদের কী অবস্থা হতো? বায়তুল্লাহশরিফ জড়িয়ে ধরে কী যে করতো, তা একমাত্র আল্লাহ মালুম।

کمال جوش جنوں میں رہا میں گرم طواف
[কামালে জুশে জুনোঁ মেঁ রাহা ম্যায় গারমে তাওয়াফ]

خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف
[খোদা কা শুকর সালামত রাহা হারাম কা গিলাফ]

তাওয়াফকালে প্রেমিক মনে
জোয়ার যখন জাগে
যায় দেখা যায় হাজারটি ফুল
মনের কুসুমবাগে।

নিষেধ যদি না-ই-বা হতো
গেলাফটাকে ছেঁড়া
ফিরতো কি আর প্রেমিক তাতে
করবে তাকে জেরা।

আর এ কারণেই পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহপাক নির্দেশ জারি করে দিয়েছেন যেনো তাওয়াফ করার সময় কেউ কাবাশরিফের দিকে চোখ তুলে না তাকায়। এরপর মন চায় মানুষ কাবাশরিফের গেলাফ ধরে দোয়া করবে আর এই দোয়া করার সময় তাদের চোখের অশ্রু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বাস্তবেও এমনটি মনে হয়, যেনো তার একান্ত প্রিয়তমের আঁচল জড়িয়ে ধরে মানুষ তার কাছে নিজের ফরিয়াদ নিবেদন করছে, নিজের হৃদয়ের সব দুঃখ-বেদনা আর অপ্রাপ্তির কথা মন উজাড় করে তার প্রিয়তমের কাছে উপস্থাপন করছে। তাই হৃদয়ের আবেদন নিবেদন জানানোর জন্যে পর্দা থাকাটাই ভালো। কারণ–

دل سے بڑھ کر ہے اسکی نگاہ بے قابو
[দিল সে বড়্হ কর হায় উসকী নেগাহে বে কাবূ]

কষ্ট হলেও যায় এড়ানো
প্রেমিক মনের কথা
কেমন করে এড়াই বলো
চোখে লেখা কথা।

কবির ভাষায়–

حجاب اکسیر ہے آوارۂ کوئے محبت کو
[হিজাব আকসীর হায় আওয়ারায়ে কুয়ে মোহাব্বত কো]

میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی
[মেরী আতশ কো ভড়কাতী হায় তেরী দের পাওয়ান্দী]

প্রেমের গলির পর্দা যেনো
অমৃত আমার তরে

যার ছোঁয়াতে প্রেমের আগুন
জ্বললো আমার ঘরে।

এক আজব ইতিহাস

কোরাইশদের যুগেও এই গেলাফ ছিলো। একবর্ণনায় এসেছে, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] একবার রাতের বেলায় হাজরে আসওয়াদ আর রুকনে ইয়ামানির মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে পবিত্রকোরআন তেলাওয়াত করছিলেন, এমন সময় ওমর ইবনে খাত্তাবও হারামশরিফে প্রবেশ করেন। তিনি অনুমান করার চেষ্টা করেন, তিনি কী পড়ছেন? কিন্তু ভালো বুঝতে পারেন না, তাই তিনি গেলাফের ভেতর ঢুকে চুপি চুপি সেদিকে এগুতে থাকেন এবং এমন জায়গায় পৌঁছে যান, যেখান থেকে তাঁর তেলাওয়াত স্পষ্টভাবে শোনা যায়। তখন নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] যে সুরার আয়াতগুলো পড়ছিলেন, তার শেষ শব্দগুলো ছিলো كَافِيَةٌ 'কাফিয়া', حِسَابِيَةٌ 'হিসাবিয়া', رَاضِيَةٌ 'রদিয়া' কিতাবিয়া জাতীয় ছন্দবদ্ধ বাক্য। এগুলো শুনে ওমর বিন খাত্তাব মনে মনে ভাবেন, ইনি কোনো বিখ্যাত কবির আবৃতি করছেন, তখন কাকতালীয়ভাবে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] পড়েন–

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ

"আর এটি কোনো কবির কবিতা নয়।"

একথা শুনে ওমর চমকে উঠেন, ভাবেন, কী ব্যাপার? গণক না-কি? তাহলে বুঝি ইনি কোনো গণকের কথা পড়ে চলেছেন! এমন সময় নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] পড়েন–

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ

"আর এগুলো কোনো গণকেরও কথা নয়।"

একথা শুনে ওমর বিন খাত্তাব ঘাবড়ে যান, তাঁর লোম শিউড়ে ওঠে। ভাবতে থাকেন, ব্যাপার কী? আমি মনে যা কল্পনা করি, এ বেচারাও হুবহু তা-ই বলে দেন! তাই এটি কোনো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়! অবশ্যই এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বাণী! তারপর তিনি ধীরে ধীরে গেলাফের আড়াল থেকে বের হয়ে বাড়ি চলে যান; কিন্তু এতে তার চিন্তার সাগরের ঢেউ তোলপাড় শুরু করে দেয়। সেটি ছিলো সেই রাতের ঘটনা, যার পরের দিনই মক্কার কোরাইশ নেতারা তাকে পাঠিয়ে ছিলো নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে হত্যা করে তার কল্লা আনতে! তিনিও খোলা তলোয়ার হাতে ছুটে চলেছিলেন, পথে একসাহাবির সাথে দেখা হয়ে যায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার ওমর, এভাবে খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে কোথায় কী উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছো? জবাবে তিনি বলেন, বেশি কথা বলার সময় নেই, শুধু জেনে রেখো, আমি চলেছি কেচ্ছা কতম করে দিতে।

যাতে করে বাঁশিও থাকবে না, বাঁশরীও বাজবে না। মোহাম্মদের কল্লা আনতে চলেছি, আমাকে বিরক্ত করবেন না। তা বুঝলাম; কিন্তু তোমার পরিবারের কি কোনো খবর নিয়েছো? পরিবারের খবর মানে? পরিবারের খবর মানে, মোহাম্মদ বিন আব্দিল্লাহকে খতম করার আগে গিয়ে দেখো তোমার বোন ও ভগ্নিপতি মুসলমান হয়ে গেছে!

গতিপথ পাল্টিয়ে তখনই তিনি ছুটে চলেন তার বোনের বাড়ির দিকে। বাড়িতে ঢুকতেই তাঁর কানে ভেসে আসে গতো রাতের শোনা কথাগুলোর মতো কিছুবাক্য। দ্রুতো ঢুকে পরেন ভেতরে। ভগ্নিপতিকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, বলো, তোমরা কি সত্যই মুসলমান হয়েছো? তিনি নির্ভীকচিত্তে জবাব দেন, ইসলাম যদি হক আর সত্য হয়, তাহলে তা গ্রহণ করতে সমস্যা কোথায়? আর যার কথায়? সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় তার ওপর চড় থাপ্পড়, কিল, ঘুষি। বোন ছুটে আসেন স্বামীকে রক্ষা করতে। তখন তিনি বোনকেও থাপ্পড় কষে দেন প্রচণ্ড বেগে, তাল সামলাতে না পেরে তিনি মাটিতে পরে যান। আবার ওঠে দাঁড়ান। তিনিও ছিলেন ওমরের বোন। একই বাবার মেয়ে। তড়িৎ ওমরের সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভীকচিত্তে এক ঐতিহাসিক বাক্যের মাধ্যম জবাব দিয়ে বলেন, "হে ওমর! তুমি যে মায়ের বুকের দুধ পান করেছো, সেই মায়েরই দুধ পান করেছি আমিও, তুমি আমার দেহ থেকে প্রাণ বের করে আনতে পারো; কিন্তু হৃদয় থেকে ইমান ছিনিয়ে নিতে পারবে না কখনও!"

একথাগুলো ওমরের হৃদয়ে বিদ্যুতের মতো আঘাত করে। তিনি আগে থেকেই একটু করে বুঝতে পারছিলেন এগুলো কোনো সাধারণ বাণী নয়। অবশ্যই বিশেষ কিছু। তখন একটু শান্ত হয়ে তিনি বোনকে বলেন, আচ্ছা, তোমরা এতোক্ষণে কী পড়ছিলে? তা একটু আমাকেও শোনাও। দৃঢ়চিত্তে বোন জবাব দেন, না, তুমি এখনও অপবিত্র, এই অবস্থায় এই বাণী তোমাকে শোনানো যাবে না। আগে গোসল করে পবিত্র হয়ে এসো, তারপর তা শোনানো যাবে।

ওমর বিন খাত্তাব ভালোভাবে গোসল করে এসে বলেন, এই যে পাক হয়ে এসেছি, এখন শোনাও দেখি! ভগ্নিপতি পড়েন–

طٰهٰ . مَآ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡكَ الۡقُرۡاٰنَ لِتَشۡقٰۤى .

যখন–

اِنَّنِيۡۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِيۡ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكۡرِيۡ .

এই আয়াতে চলে আসেন, তখন দয়াময় আল্লাহপাক তার হৃদয়ের দরোজা খুলে দেন, তিনি সপ্রণোদিত হয়ে বলেন, আর দেরি নয়, আমাকেও কালেমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে নাও!

আগত লোক কী দেখলেন?

অনেক আগে থেকেই কাবাশরিফে গেলাফ পরানোর রেওয়াজ চলে আসছে। হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর আগমনের প্রায় নয়শো বছর

আগে থেকে তা শুরু হয়েছে। একবার মক্কার কোরাইশ নেতাদের একনেতা, যার নাম ছিলো আফিফ, এসে বাইতুল্লাহর পাশে একটি আজব দৃশ্য দেখেন। বায়তুল্লাহর দরোজার কাছে অর্থাৎ, মাকামেইবরাহিমে এক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আরেক পনেরো/ষোলো বছরের তরুণ। আর তার পেছনে দাঁড়িয়ে একজন বয়স্ক নারী। সামনের লোক যা করছেন, পেছনের দু'জনও তা-ই করছেন। এ দৃশ্য দেখে সেই নেতা ভীষণভাবে বিস্মিত হন এবং কৌতুহল নিবারণের জন্যে ছুটে যান আব্বাসের কাছে। গিয়ে হতবিহবল অবস্থায় বলেন, আমার মনে হয় পৃথিবীতে বড়ো কিছু একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে। আব্বাস বলেন, কেনো আপনার এমন মনে হচ্ছে? তখন তিনি এইমাত্র কাবাশরিফের পাশে দেখে আসা দৃশ্যের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেন। জবাবে আব্বাস বলেন, আপনার অনুমান পুরোপুরি ঠিক। ওখানে সামনে যে লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন, তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ, তাঁর পেছনে দাঁড়ানো তরুণটি তাঁর পরিবারেরই সদস্য, নাম আলি আর তাঁর পেছনে দাঁড়ানো মহিলা হচ্ছেন তাঁর স্ত্রী, নাম খাদিজা।

আসল ঘটনা ছিলো, ইসলামের শুরুতে হজরত জিবরাইল [আলায়হিসসালাম] এসে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে হাতে কলমে নামাজ পড়া শিখিয়ে দিয়ে যেতেন। তারই প্রশিক্ষণ চলছিলো সেদিন, যাকে মহড়া বলা যায় আর সেই মুহূর্তে আফিফ নামের সেই কোরাইশ নেতা এসে সে দৃশ্য দেখে এমনভাবে প্রভাবিত হয়ে পরেন আর আবেগ তাড়িত হয়ে বলতে শুরু করেন, আমার মনে হয় বিশ্বের বুকে কোনো মহাঘটনা ঘটতে চলেছে!

এখনও যদি আপনি বায়তুল্লাহশরিফের দরোজার একটু ডান দিকে খেয়াল করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানে নিচের ভেতরে কিছু পাথর বসানো আছে। প্রায় ৫/৬টা পাথর হবে, সম্ভবত এটিই সেই জায়গা, যেখানে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] সর্বপ্রথম নামাজ আদায় করেছেন।

যদি সুযোগ হয়, তাহলে সেখানে দু'রাকাত নামাজ পড়ার চেষ্টা করবেন। মহিলাদের জন্যে অবশ্য কাজটা একটু কঠিনই বটে। তারপরও আমি রাতের বেলায় সেখানে মহিলাদের নামাজ পড়তে দেখেছি। আর আল্লাহপাকের কাছে এই দোয়া করবেন, হে আল্লাহ! আপনার প্রিয়নবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] এই জায়গাতে তাঁর উম্মতকে নামাজ পড়া শিখিয়েছেন। হাতে কলমে নামাজের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, এখানে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করলাম। এর বরকতে আমাকেও সঠিক পদ্ধতিতে নামাজ পড়া শিখিয়ে দাও। হে খোদা! আমার মাঝে নামাজের একাগ্রতা তৈরি করে দিন। এহসানের স্তরে পৌঁছিয়ে দিন। যে প্রসঙ্গে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, এহসান হচ্ছে তুমি এমনভাবে গভীর মনোযোগের সাথে নামাজ আদায় করবে,

যেনো তুমি স্বয়ং আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছো আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পারো (তোমার ভেতরে এমন অবস্থার সৃষ্টি না হয়), তাহলে (আপাততো এতোটুকু মনে করবে,) তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে দেখছেন।

সেই জায়গায় গিয়ে দোয়া করবেন। তো নিসবত বা সম্পর্কের যেহেতু অনেক মূল্য এবং গুরুত্ব রয়েছে, এই নিসবত বা স্পর্কের কারণেই ইজ্জত সম্মান পাওয়া যায়। তাই এ কারণে আল্লাহর অনুগ্রহও খুব দ্রুতো লাভ করা যায়।

সম্পর্কের কারণেই ব্যবধান

সম্পর্কের প্রসঙ্গ যখন চলেই এসেছে, তো এ ব্যাপারে কটি কথা শুনুন। একটু চিন্তা করে দেখুন, একই ভাটা থেকে ইট তৈরি হয়, ইটগুলোর রঙ, মান, মাপ আর দামও একই। এখন এই ইট দিয়ে আপনি মসজিদ তৈরি করলেন, আবার তার পাশেই বানালেন টয়লেট। এখানে একটির সম্পর্ক বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘরের সাথে হওয়ায় আপনি সেখানে গিয়ে সেজদা করছেন, মাথা ঠুকছেন, আবার প্রয়োজন সারার জন্যে টয়লেটে গিয়ে (তা পরিষ্কার ঝকঝকে থাকা সত্ত্বেও) তার ওপর পা পর্যন্ত বিছান না। পায়ে জুতা পরেন। তো এই দুই শ্রেণীর ইটের মাঝে এমন মর্যাদাগতো ব্যবধানের কারণ হচ্ছে দু'য়ের সম্পর্ক গড়া। সম্মানী জিনিসের সাথে সম্পর্ক রাখলে সম্মান বাড়ে আর অসম্মানী বস্তুর সাথে সম্পর্ক জুড়লে সম্মানের হানী ঘটে।

এই উম্মতের ওপর আল্লাহপাকের বড়ো অনুগ্রহ

একটু খেয়াল করে দেখুন, বনিইসরাইলকে আল্লাহতায়ালা বহু সম্পদ দিয়েছেন, আবার উম্মতেমোহাম্মাদিকেও অনেক সম্পদ দিয়েছেন। হজরত মুসা [আলায়হিসসালাম] তাঁর দলবল নিয়ে যাওয়ার সময় বিপদ ঘনিয়ে আসায় তাঁর উম্মতকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন–

إِنَّ مَعِيَ رَبِّي

"নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার প্রভু আছেন!"

আবার হিজরতের সময় সাওর গুহায় শত্রুদের দেখে বিচলিত হয়ে ওঠা হজরত আবুবকর সিদ্দিক [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর জিজ্ঞাসার জবাবে আমাদের নবি হজরত মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন–

إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

"চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা আমাদের সাথেই আছেন।"

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, হজরত মুসা [আলায়হিসসালাম]-এর কথায় বোঝা গেছে, আল্লাহপাকের সম্পৃক্ততা শুধু তাঁর নবির সাথে, তাঁর উম্মতের সাথে নয়।

অন্যদিকে আমাদের আখেরিনবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর জবাবে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেছে, আল্লাহপাকের সম্পৃক্ততা শুধু তাঁর নবির সাথে নয়, তাঁর সব উম্মতের সাথে। অর্থাৎ, আল্লাহপাক তাঁর প্রিয়নবি ও তাঁর উম্মতের সাথেও আছেন, এটি উম্মতেমোহাম্মাদির একধরনের বিশেষ মর্যাদা বহন করে।

একটি সূক্ষ্মবিষয় শুনুন!

একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, হজরত ইয়াকুব [আলায়হিসসালাম] তাঁর ছেলে হবু নবি হজরত ইউসুফ [আলায়হিসসালাম]-কে লক্ষ করে বলেছিলেন, তুমি তোমার স্বপ্নের কথা অন্যভাইদের কাছে বলবে না। কারণ, মানবিক স্বভাববসত তারা তোমার প্রতি হিংসাপরায়ণ হতে পারে। সেই সাথে হজরত ইয়াকুব [আলায়হিসসালাম] হজরত ইউসুফ [আলায়হিসসালাম]-কে সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন–

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ

"আর এভাবে আল্লাহপাক তোমাকে মনোনীত করবেন।"

অন্যদিকে আল্লাহতায়ালা উম্মাতেমোহাম্মাদি প্রসঙ্গে পবিত্রকোরআনে ঘোষণা করেছেন–

هُوَ اجْتَبٰكُمْ

"আর আল্লাহপাক তোমাদেরকে মানোনীত করে নিয়েছেন।"

এখানে দু'য়ের মাঝে তুলনামূলক লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, হজরত ইউসুফ [আলায়হিসসালাম]-এর ক্ষেত্রে তাঁকে মনোনীত করার ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়েছে ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ, তাও একজন নবির মুখ দিয়ে। অন্যদিকে হজরত মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর উম্মতকে নির্বাচন বা মনোনীত করে নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে অতীতকালের ক্রিয়াপদ, অর্থাৎ, তাদেরকে মনোনীত করে নেয়া হয়েছে। সেই সাথে একথা বলেছেন আল্লাহপাক নিজে। তিনি স্বয়ং ঘোষণা দিয়েছেন, আমি তোমাদের মনোনীত করে নিয়েছি। এটি উম্মতেমোহাম্মাদির জন্যে একবিরাট পাওয়া, মহাসম্মানের ব্যাপার।

জান্নাতিখাবার ও জান্নাতিপাথর

আরো খেয়াল করুন, বনিইসরাইলের আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহপাক জান্নাত থেকে তাদের জন্যে মায়েদা (ট্রে ভর্তি বিশেষ ধরনের খাবার) পাঠিয়েছিলেন। হজরত ইসা [আলায়হিস সালাম]-ও তাঁর উম্মতের জন্যে দোয়া করেছিলেন–

رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ

মায়েদার এক অর্থ দস্তরখানা, অন্য অর্থ দস্তরখানে সাজানো খাবার। আমাদের পাঞ্জাবি ভাষায় তাকে 'ময়দা' বলে। আবার রিফাইন্ড করা আটাকেও ময়দা

বলে। তা যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে, বনিইসরাইলের আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহপাক তাদেরকে জান্নাতিখাবার দান করেছেন। অন্যদিকে না চাইতেই আমাদেরকে, অর্থাৎ, উম্মতেমোহাম্মাদিকে আল্লাহপাক জান্নাত থেকে হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর দান করেছেন। এখন সেই আসমানিখাবার ও আসমানিপাথর নিয়ে সামান্য তুলনামূলক আলোচনা করা যাক। প্রথম ব্যাপার হচ্ছে, বনিইসরাইলকে আল্লাহপাক আসমানিখাবার দিয়েছেন তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে, অন্যদিকে উম্মতেমোহাম্মাদিকে হাজরে আসওয়াদ (আসমানি পাথর) দিয়েছেন কোনো ধরনের চাওয়া ছাড়াই, স্বেচ্ছায়। এছাড়া তাদের দেয়া খাদ্যদ্রব্য ছিলো সাময়িক। অল্পক্ষণের জন্যে পঁচনশীল বস্তু। অথচো উম্মতেমোহাম্মাদিকে দেয়া জান্নাতিপাথর চিরস্থায়ী, কেয়ামত পর্যন্তের জন্যে। জান্নাতিখাবার খেতে পেরেছিলো বনিইসরাইলের সামান্য কিছুলোক; কিন্তু উম্মতেমোহাম্মাদিকে দেয়া হাজরে আসওয়াদ সবার জন্যে। কেয়ামত পর্যন্ত আসা সব উম্মতেমোহাম্মাদি তা থেকে উপকৃত হতে পারবে। স্বয়ং হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তাতে যে চুমু দিয়ে গেছেন, এখন পর্যন্ত সবাই তাতে চুমু দিয়ে বরকত লাভ করে চলেছে এবং চুমু দিয়ে বলছে, আমরা এই পাথরে চুমু দিচ্ছি না; এর মাধ্যমে আমরা আপনার চুমুতে চুমু দিচ্ছি।

تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر

[তেরে বুসে কো হাম দেতে হেঁ বুসাহ হজরে আসওয়াদ পর]

وگرنہ کام کیا تھا ہم مسلمانوں کو پتھر سے

[অগরনাহ কাম কিয়া থা হাম মুসলমানোঁ কো পাথর সে]

পাথর গায়ে চুম দিয়েছো
তাইতো চুমুই আসে
নয়তো জড় ওই পাথরে
চুমুই রে কোন আশে?

কারণ, আমরা তো পাথরের পূজা করি না, আমরা শুধু নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর চুমুর ওপর চুমু দিই। আজও তাঁর উম্মত সেই কালো পাথরে চুমু দেয়ার জন্যে কেমন উতালা? কীভাবে ছটফট করে? তাদের আগেরদের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন, তাদের পাগলামী দেখুন, যেনো সবাই পাগলের মতো সেদিক ছুটে আসছে, একটিবারের জন্যে, একটু চুমু দিতে। পুরুষরা যেমন, নারীদের অবস্থাও তেমনই। কোথাও কোনো ঘাটতি নেই, একটুও ব্যত্যয় নেই, সবাই পাগলপারা। আল্লাহু আকবার! তাঁর চুমুর কারণে আল্লাহপাক এর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

হাজরে আওয়াদের মর্যাদা

একটু ভেবে দেখুন, পবিত্র হাদিসে এসেছে, হাজরে আসওয়াদ দুনিয়াতে আল্লাহপাকের রহমতের ডান হাত। এর প্রেক্ষাপটে মোহাদ্দিসরা লিখেছেন, যে

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর যুগ পায় নি, অর্থাৎ, সাহাবাদের পরের যুগের কেউ এসে এই বায়তুল্লাহশরিফের হাজারে আসওয়াদে চুমু দেয়, তাহলে সে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর পবিত্র হাতে বায়াত হওয়ার মর্যাদা লাভ করবে। সোবহানাল্লাহ! হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়ে হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর হাতে বায়াত হওয়ার মতো মর্যাদা লাভ করা কতো সৌভাগ্যের কাজ!!

বর্তমান যুগে কেউ যদি কোনো স্মৃতি বা কাজ সংরক্ষণ করে ধরে রাখতে চায়, তাহলে তা ভিডিও ক্যামেরায় রেকর্ড করে রাখে। যেমন, একদেশ থেকে অন্যদেশে যাওয়ার সময় ইমিগ্রেশন থেকে বের হওয়ার সময় পাসপোর্ট চেক করে বলে, একটু ওদিকে ওই ক্যামরার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। উদ্দেশ্য তার সবকিছু সংরক্ষণে রাখা, তেমনি হাজরে আসওয়াদ মানুষের অন্তরের অবস্থাকে সংরক্ষণ করে রাখে। মক্কা বিজয়ের পর নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর হাতে একদিনেই প্রায় দু'হাজার মানুষ বায়াত করে মুসলমান হয়েছিলো। হাদিসশরিফে এসেছে, তখন নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] হাজরে আসওয়াদের পাশে বসেছিলেন, যার কারণে হাজরে আসওয়াদও বায়াতের সময় সবার সামনে ছিলো, অর্থাৎ, গোটা সম্প্রদায় হাজরে আসওয়াদকে সামনে নিয়ে হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর হাতে বায়াত হয়েছিলো। আজও তো এমন হতে পারে, আমরা হাজরে আসওয়াদের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহপাকের কাছে তওবা করে দোয়া করবো–"হে খোদা! একসময় তোমার প্রিয়রাসুলের পবিত্র হাতে হাজারও পাপীবান্দা এখানে এসে তওবা করেছিলো। আমিও তাঁর উম্মতের একজন পাপীবান্দা, আজ এমন সময় এখানে হাজির হয়েছি, যখন তোমার প্রিয়নবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] আর দুনিয়াতে নেই। আমিও সেই জায়গাতেই এসে বসেছি, সেই ভিডিও ক্যামেরার সামনে বসেছি, যাকে আপনি হাজের আসওয়াদ বলেন, যেটি আপনার রহমতের ডান হাত। হে আল্লাহ! আমিও আজ এখানে বসে খাঁটি অন্তরে তওবা করছি। দয়া করে আপনি আমার এই তওবা কবুল করে নিন।"

আশা করা যায়, অবশ্যই আল্লাহপাকের তরফ থেকে রহমত ঝরবে এবং তিনি সেই তওবা কবুল করে নেবেন।

ওমরা পালনের পর আমাদের কাছে যে কদিন অতিরিক্ত সময় আছে, এগুলো এ কাজের জন্যেই আমরা এখন জায়গায় বসে আল্লাহপাকের কাছে দোয়া করবো, মিনতি জানাবো, যারা প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু, তারা অবশ্যই খুঁজে বের করে এমন সব জায়গা, যেখানে বসে দোয়া করলে আল্লাহ তা কবুল করে নেন।

শাহ রফিউদ্দিন [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর উঁচু নজর

দারুলউলুম দেওবন্দ মাদরাসার দ্বিতীয় মোহতামিম (প্রিন্সিপাল) ছিলেন মাওলানা রফিউদ্দিন [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]। তিনি ছিলেন একজন কাশফ ও কারামতধারী বুজুর্গ। তিনি হজে গিয়ে হারামশরিফে অবস্থান করছিলেন। পরের ঘটনা শুনলেই বুঝতে পারবেন কেমন উঁচুস্তরের চিন্তা-ভাবনা ছিলো তাঁর। একদিন বসে বসে তিনি ভাবতে থাকেন, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তো বায়তুল্লাহশরিফের চাবি বনুশাইবাকে দিয়ে গেছেন এবং তা কেয়ামত পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে তাদের হাতেই ঘোরাফেরা করবে। যা হাদিস দিয়ে প্রমাণিত (এ থেকে আরেকটি বিষয় নিশ্চিত যে, কোনোকালেই সেই বংশের বিলুপ্তি ঘটবে না। কেয়ামত পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকবে, তাই হৃদয়ের সুপ্ত বাসনা পূরণের একটি মোক্ষম হাতিয়ার হতে পারে বনুশাইবা)। তিনি আরও চিন্তা করেন, বনুশাইবার লোকজন অবশ্যই এই আশেপাশেই থাকবেন, যারা প্রয়োজন মুহূর্তে এসে কাবাশরিফের দরোজা খুলে দেন। তারপর মাওলানা রফিউদ্দিন সাহেব বনুশাইবা গোত্রের লোকদের খুঁজে বের করেন। এরপর ধীরে ধীরে তাদের সাথে পরিচয়, সম্পর্ক, তারপর বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। সেখানে যাওয়া-আশা করতে থাকেন আত্মীয়-স্বজনের মতো। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব একান্ত গভীরে পৌঁছে যায়। ফলে বিদায় বেলায় তার প্রভাব পরে দু'পক্ষের মাঝেই। সবার মাঝেই লক্ষ করা যায় বিরহের ছায়া, বিচ্ছেদের বেদনা, স্বজন হারানোর যাতনা। একপর্যায়ে বনুশাইবার লোকজন বলেন, এতোদিন তো আপনার জন্যে বেশি কিছু করতে পারিনি। আচ্ছা আজ বলুন, আপনার জন্যে আমরা কিছু করতে পারি কী-না? মাওলানা রফিউদ্দিন সাহেব এতোক্ষণ এই অপেক্ষাতেই ছিলেন, সুযোগ কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে বলেন, না এতোদিনে আপনারা যা করেছেন, তা-ই অনেক বেশি; তবে এই মুহূর্তে যদি আরও একটি উপকার করেন, তাহলে খুব খুশি হবো, আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। আর তা হচ্ছে, এই নিন সামান্য কিছুপয়সা আর এই তলোয়ারটি!

কিন্তু আমরা পয়সা আর তলোয়ার দিয়ে কী করবো? তা বলছি, পয়সাগুলো আপনাদের জন্যে হাদিয়া আর এই তলোয়ারটি হচ্ছে আমানত। যেমন আমানত আপনাদের বংশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন মহানবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] মক্কা বিজয়ের দিন কাবাশরিফের চাবি, তো সেই চাবি যেমন কেয়ামত পর্যন্ত আপনাদের বংশের লোকের হাতে স্থানান্তরিত হয়ে আসবে, তেমনি এই তলোয়ারটিও সেভাবে হাত বদলের অনুরোধ রাখছি, কেয়ামতের আগে ইমাম মাহদি [আলায়হিসসালাম] আগমন করলে তাঁকে যখন আপনার বংশের লোক কাবাশরিফের দরোজা খুলে দিয়ে সেখানে প্রবেশ করাবেন, তখন তিনি যেনো এই তলোয়ারটিকেও ইমাম মাহদি [আলায়হিসসালাম]-এর কাছে আমার তরফ থেকে হাদিয়া হিসেবে উপস্থাপন করেন।

আল্লাহু আকবার! দেখুন, ভালোবাসা মানুষের চিন্তাকে কতো উঁচুতে নিয়ে পৌঁছিয়ে দেয়। এতোটুকুই ব্যবধান আমাদের সাধারণ মানুষ আর আহলুল্লাহদের মাঝে। আমরা আসি, ওমরা করেই অবসর হয়ে যাই। কাজ বলতে শুধু মার্কেটে ঘোরাফেরা, কেনাকাটা, সকাল বা বিকেল দিনে কমপক্ষে একবার যেতেই হবে; কিন্তু আল্লাহঅলাদের হৃদয় সবসময় হারামশরিফে আটকে থাকে।

কেমন বরকতময় গুরুত্বারোপ!!

হজরত কারি রহিম বখশ পানিপতি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, আমি ওমরা পালনের জন্যে হারামশরিফে হাজির হওয়ার পর রোজ প্রতি বেলার নামাজ (হারামশরিফের) একদম ইমাম সাহেব বরাবর তাঁর পেছনে তাকবিরেউলার সাথে আদায় করেছি।

আজকাল আমাদের মাথায় এমন ব্যাপার ঢুকবেই না, কোনোভাবেই তার হিসাব মেলাতে পারবো না, প্রতি বেলা তো দূরেই থাকলো, মাত্র দু'-এক বেলা নামাজই সামনের কাতারে গিয়ে পড়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া ইমামের পেছনে তাকবিরেউলার সাথে পড়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। আমার মনে হয় তিনি সবসময় সামনে কাতারেই বসে থাকতেন, শুধু এশা আর ফজরের মাঝে কোনো একসময় গিয়ে পেশাব-পায়খানা ও ওজু সেরে আসতেন, তারপর আবার ইমামের পেছনের জায়গা নিতেন। তা না হলে কোনোভাবেই তো এমনভাবে নামাজ পড়া সম্ভব নয়। অবশ্যই স্থানচ্যুতি ঘটবে। তা যেভাবেই হোক, তিনি তো এমন সৌভাগ্য লাভ করতেন, আমাদেরও আপাতত তার কাছাকাছি চেষ্টা করা দরকার।

কাবাঘরের প্রতিবেশী কে?

বিশ্ববিখ্যাত তাফসিরবই 'তাফসিরে কাশশাফ'-এর লেখক আল্লামা জমখশরি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বড়ো আলেম ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এককবি বলেন—

তیرے وجود پر نہ ہو جب تک نزول کتاب

[তেরে উজূদ পর নাহ হো জব তক নুযূলে কিতাব]

گرہ کشاں ہیں نہ رازی نہ صاحب کشاف

[গেরাহ কাশাঁ হেঁ নাহ রাযী নাহ সাহেবে কাশশাফ]

যতোদিনে হয়নি নাজিল
তোমায় নিয়ে কিতাব
রাজি কিবা অন্যকেউ
পায়নি সেরার খেতাব।

হজে গিয়ে সবসময় শুধু হারামশরিফেই পরে থাকতেন। তাঁর এতো বেশি সময় হারামশরিফে কাটতে দেখে আরবের লোকেরা তাঁকে جارالله (জারুল্লাহ) 'আল্লাহর পড়শী' উপাধীতে ভূষিত করেছিলেন।

তাহলে একটু চিন্তা করে দেখুন, কী পরিমাণ আর কতো বেশি সময় আল্লাহর ঘরে অবস্থান করলে তাকে আল্লাহর প্রতিবেশী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। এটি কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। হায়! আমরাও যদি সেভাবে হারামশরিফে বেশি বেশি সময় কাটাতে পারতাম!!

কথা চলছিলো নিসবত বা সম্পর্ক নিয়ে। হাজরে আসওয়াদের সাথে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর চুমুর সম্পর্ক ছিলো। সেই সম্পর্কের ধারা আজও বিদ্যমান রয়েছে তাঁর উম্মতের সাথে।

মাকামে ইবরাহিম

মাকামে ইবরাহিমের সাথে হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর পদচিহ্নের সম্পর্ক জড়িত। হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] বায়তুল্লাহশরিফ ফের নির্মাণকালে যে পাথরটিকে (আল্লাহপাকের ইশারায়) লিফ্‌ট হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, তার ওপর পা রেখে দেয়ালে পাথর বসিয়েছিলেন। আজও সে পাথরে ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর পদচিহ্ন খোদাই করা রয়েছে। তাকে বলে 'মাকামে ইবরাহিম।'

এই পাথরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো, হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর কাজ করার সুবিধার্তে যখন তাকে ওপর দিকে উঠতে হতো, তখন এই পাথরটি আল্লাহর হুকুমে নিজ থেকেই তাঁকে নিয়ে ওপর দিকে ওঠে যেতো। আবার কাজ শেষে নিচে নেমে আসতো। অনেকটা স্বয়ংক্রিয় লিফটের মতো কাজ করতো। আগের যুগে ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর পদচিহ্ন খঁচিত পাথরটি কাবাশরিফের পাশে এমনি এমনিই পরে থাকতো; কিন্তু হজরত ওমর ফারুক [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর খেলাফতকালে একবার প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের কারণে পাথরটি ভেসে চলে যায়। জানতে পেরে হজরত ওমর ফারুক [রদিয়াল্লাহু আনহু] ভীষণ বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে পরেন। একে তো পাথরটি খুঁজে বের করা, দ্বিতীয় তো তা পাওয়া গেলেও সেটিকে তার আগের জায়গায় ফের রাখা, দু'টিই খুব কঠিন কাজ। তারপর তিনি সবাইকে তা খুঁজে বের করার কাজে লাগিয়ে দেন। আল্লাহর ইচ্ছায় বহু খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে সেটিকে আজইয়াদ নামের এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। এখন রয়ে যায় সেটি আগের জায়গায় হুবহু প্রতিস্থাপন করা। যেহেতু আগের জায়গাটি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা ছিলো না, তাই কেউ সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারে না হুবহু এই জায়গায় এভাবে রাখা ছিলো পাথরটি। সবাই যা বলে, তা হয় তো সম্ভবত, মনে হয়, হতে পারে এজাতীয় অনুমান নির্ভর কথা। হজরত ওমর ফারুক [রদিয়াল্লাহু আনহু]ও নাছোড়বান্দা। তাঁর কথা হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর যুগে এটি যেখানে যেভাবে রাখা ছিলো, এখনও সেখানে সেভাবেই রাখতে হবে। এক ইঞ্চিও এদিক সেদিক হওয়া চলবে না। তাই তিনি ঘোষণা করে বলেন, দেশের যারই এ ব্যাপারে নিশ্চিত জানা আছে, সে যেনো অবশ্যই এসে তা জানিয়ে দেয়।

অনেক তালাশ আর খোঁজাখুঁজির পর একলোককে পাওয়া যায়, যিনি বলেন, আমি জানি সেটি কোথায় ছিলো। তিনি ছিলেন বনুআসহামের একলোক, নাম মোত্তালিব বিন বেদা। তাকে হাজির করা হলে তিনি জায়গাটা একটু মেপে নিয়ে বলেন, এই এখানে ছিলো। খলিফা বলেন, এমন অনুমান করে তো সবাই বলছে; কিন্তু তুমি এভাবে বলার পেছনে প্রমাণ কী? কিসের ভিত্তিতে তুমি একথা বলছো? তিনি বলেন, আমার কাছে প্রমাণ আছে হে আমিরুলমোমিনিন! বেশ কিছুদিন আগে একবার ভাবলাম পাথরটি আদিকাল থেকে এখানে অরক্ষিতভাবে রয়েছে, যেকোনো সময় তা স্থানান্তরিত হতে পারে। তাই জায়গাটা চিহ্নিত করে রাখা দরকার; কিন্তু তা কীভাবে করা যায়? সে ব্যাপারে কোনো আইডিয়া তখন আমার মাথায় না আসায় আপতত সাময়িকভাবে তার দু'পাশের জায়গাটুকু মেপে রাখি আর সে মাপ কাঠিটা অর্থ্যাৎ, এর পরিমাপটি আমার কাছে এখনও সংরক্ষিত রয়েছে।

তারপর তিনি সেটি এনে দু'দিকে মাপ দিয়ে পাথরটি আগের জায়গায় রেখে দেন। এরপর সব সাহাবি সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, হ্যাঁ, মনে হয়েছে পাথরটি হুবহু এখানেই আর এভাবেই ছিলো।

এ থেকে আও জানা যায়, সব সাহাবি একটি পাথরের জন্যে নির্ধারিত জায়গাটি সযতনে এভাবে মেপে রেখে সংরক্ষণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের প্রিয়রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কথা কাজ তথা হাদিসগুলো আরও কতো যত্নসহ সংরক্ষণ করবেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে?

একটি ঘটনা

নিকট অতীতেও সেই পাথরটি ওই জায়গায় এভাবে রেখে দেয়াছিলো। এমনকি ১৯৩০ সালের দিকেও। আমাদের আগের দেওবন্দি বুজুর্গানেকেরাম যখন হজে যেতেন, তখন তাঁরাও সেটিকে সেই অরক্ষিতভাবেই দেখেছেন। অরক্ষিত বলতে খোলামেলা জায়গায়ই ছিলো। বলা হয়ে থাকে, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বিদায় হজের সময় তাওয়াফেজেয়ারতের জন্যে মক্কাশরিফ ফিরে আসেন, তাওয়াফ শেষে জমজমের পাশে গিয়ে বালতি দিয়ে পানি তুলে তা থেকে কিছু পান করেন আর পান করে বেঁচে যাওয়া পানিটুকু আবার জমজম কুয়োর ভেতর ঢেলে দেন। উদ্দেশ্য পরবর্তী উম্মাতরা যেনো নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বরকতপূর্ণ এঁটে পানি খেতে পারে, তা থেকে বরকত লাভ করতে পারে। এই ধারা এখনও অব্যাহত আছে। সবাই জমজমের পানিতে রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বরকত অনুভব করেন।

আমাদের আগেররাও সেই বরকত লাভের চেষ্টা করতেন আরও বিচিত্র উপায়ে। শুধু হুজুর [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর মুখের বরকতই নয়, এমন কি হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর পায়ের বরকত লাভের জন্যেও কতো না চেষ্টা করেছেন।

মুরুব্বিরা বলেন, হজরত মাওলানা আহমাদ আলি লাহোরি সাহেব একদিন তাওয়াফ শেষে হঠাৎ করে মাকামে ইবরাহিম পাথরটি উঠিয়ে জমজমের কাছে নিয়ে যান। সেখান থেকে পানি তুলে তা ওই পাথরের যেখানে হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর পদচিহ্ন খোঁদাই করা আছে, সেখানে রেখে দেন, এরপর উপুর হয়ে সেখান থেকে পানিটুকু ঠোঁট দিয়ে চুষে পান করেন। যেভাবে থালা বা পেয়ালা থেকে পান করে থাকে, তারপর আবার সেই পাথরটি নিয়ে আগের জায়গায় রেখে দেন। কী আজব ভালোবাসার নমুনা?

অবশ্য পরবর্তী শাসকরা সেটিকে একটি কাঁচের ঘরের ভেতর সংরক্ষণ করে রেখে দিয়েছেন। অর্থাৎ, তার চারপাশ কাঁচ দিয়ে ঘেরাও করে দিয়েছেন। ফলে সেটি এখন তার জায়গায়ই সরক্ষিত রয়েছে।

হজরত ওমর ফারুক [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে আল্লাহপাক এমন ধীশক্তি আর বিচক্ষণতা দিয়েছিলেন, যার কারণে তাঁর বহু মতামতের সপক্ষে স্বয়ং আল্লাহপাকের তরফ থেকে আয়াত নেমেছে; এর বহু নজির রয়েছে। যেমন, বদর যুদ্ধের বন্দিদের ক্ষেত্রে হজরত ওমর ফারুক [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর যে সিদ্ধান্ত ছিলো, তার সাফাই গেয়ে আল্লাহপাক পরবর্তীতে আয়াত নামান এবং তা গ্রহণ না করার কারণে কিছুটা তিরস্কারমূলক উষ্মাও প্রকাশ করেন। হজরত ওমর ফারুক [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর ইচ্ছার সপক্ষে আল্লাহপাক পর্দার আয়াত নামান। এছাড়া কোথায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া হবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য তৈরি হলে হজরত ওমর ফারুক [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর মতের সপক্ষে আল্লাহপাক আয়াত নামিয়ে বলেন–

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

"আর তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে নামাজের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করো।"

এখানে মোহাদ্দিসরা একটি সূক্ষবিস্ময় উল্লেখ করে বলেছেন, যেহেতু হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] নিজ হাতে বায়তুল্লাহশরিফ নির্মাণ করেছেন, তাই তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর পদচিহ্ন সম্বলিত জায়গাটুককে পরবর্তী যুগের মানুষের জন্যে সেজদার জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বলেছেন, যেখানে আমার খলিল [আলায়হিসসালাম] পা রেখেছেন, সেখানে তোমরা মাথা রেখে আমার উদ্দেশ্যে সেজদা করো।

হে আল্লাহ! তুমি কতোই না মর্যাদার মূল্যায়নকারী, যার কারণে তুমি এই মাকামে ইবরাহিমকে উম্মতের দোয়া কবুলের জায়গা হিসেবে নির্বাচন করেছো। হজরত ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] একবার সেখানে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন এবং এই দু'রাকাতের মাঝেই গোটা কোরআনশরিফ খতম করেন! এরপর বলেন–

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

"যেভাবে হক আদায় করে এবাদত করা দরকার ছিলো, সেভাবে আমি আপনার এবাদত করতে পারিনি আর আপনাকে যেভাবে চেনা প্রয়োজন, সেভাবে চিনতেও পারিনি!"

একথা বলে ইমামআজম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর একটি সুন্নতের ওপর আমল করেছেন। কারণ, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]ও মাকামে ইবরাহিমে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করে হুবহু একথাই বলেছিলেন–

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

"আপনার যেভাবে এবাদত করার প্রয়োজন, আমি সেভাবে এবাদত করতে পারিনি!"

আমাদের যদি সুযোগ হয়, তাহলে আমরাও মাকামে ইবরাহিমে দু'রাকাত নামাজ পড়ে একথাই বলবো সুন্নাত পালনের ইচ্ছায়। সেই সাথে আরও বলবো, হে খোদা! তুমি আমাদের এই টুঁটাফাঁটা এবাদতটুকু কবুল করে নাও আর যেভাবে এবাদত করলে খুশি হও, তা কুরার সুযোগ দাও।

শেষকথা

সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলবো, খালি চোখে দেখলে আপনাদের কাছে বায়তুল্লাহশরিফ একটি সাদামাটা ঘর বলে মনে হবে। তার ভেতরে কিছুই নেই। কারো মন বলতে পারে হয়তো তার ভেতরে খাজানা রয়েছে। কোনো মহামূল্যবান বস্তু লুকিয়ে রাখা হয়েছে; কিন্তু আসলে তার ভেতরে কিছুই নেই। ব্যস, শুধু কয়েকটি খুঁটির ওপর একটি ছাদ দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে ছাদে যাওয়ার জন্যে একটি সিঁড়ি রয়েছে। আর মাঝখানটা একদম ফাঁক; কিন্তু তারপরও এর ভেতর কী রহস্য লুকিয়ে আছে? একটু চিন্তা করুন, উম্মতকে এখানে একটি রহস্যের কথা বলা হচ্ছে।

হয়তো আমাদের দৃষ্টি সেখানে পৌঁছাবে না; কিন্তু প্রকৃত আল্লাহঅলাদের নজর সেখানে ঠিকই পৌঁছে। তাঁরা বলেছেন, দেখো, আল্লাহতায়ালা চাইলে এই বায়তুল্লাহশরিফকে সোনা-চাঁদি দিয়ে ভরে দিতে পারতেন। ইচ্ছে করলে হীরে জহরত দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিতে পারতেন। মোতি-মুক্তা-পান্না দিয়ে তা নির্মাণ করতে পারতেন বা অন্যকোনো মহামূল্যবান বস্তু দিয়ে তা সাজিয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু তার কিছুই করনেনি; বরং তা একদম শূন্য, পুরোপুরি ফাঁকা; কিন্তু প্রজ্ঞাময় আল্লাহতায়ালা তাঁর আপন ঘরটাকে এভাবে ফাঁকা রাখা পছন্দ করলেন?

তা এ কারণে, একটি বার্তা দেয়ার ছিলো–হে আমার বান্দারা! তোমরা দেখো একে আমি, 'আমার ঘর' বলে সম্বোধন করছি, এজন্যে এর ভেতর পার্থিব কোনো কিছুই নেই। শুধু আমার তাজাল্লি (দ্যুতি) এর ওপর নামে। তোমরা যদি

চাও সেই দ্যুতি তোমাদের অন্তরে ঝরুক, তাহলে তোমরাও তোমাদের অন্তর অন্যসবকিছু থেকে খালি করে নাও।

بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے

[বুতূঁ কো তুড় তাখয়ীল কে হোঁ কেহ পাথর কে]

মনের গড়া মূর্তি ভাঙ্গো
ভাঙ্গো পাথরটারে
মনের যতো প্রার্থনা তোর
বল না খোদার দ্বারে।

অন্তর থেকে সব মূর্তি ঝেড়ে ফেলো, ভেঙ্গে ফেলো। চাই তা কল্পনার মূর্তি হোক বা পাথরের মূর্তি হোক। এককথায় সব মূর্তি ভেঙ্গে ফেলো, নিজের হৃদয়কে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে মুক্ত করে নাও। যেমন এই খালি কাবাশরিফের ওপর, এই এমারতের ওপর সরাসরি আল্লাহপাকের তাজাল্লি (জ্যোতি) নামে, তেমনি যে হৃদয় আল্লাহ ছাড়া অন্যসবকিছু থেকে মুক্ত থাকে, সে হৃদয়ে সরাসরি আল্লাহপাকের তরফ থেকে তাঁর তাজাল্লি (দ্যুতি) ঝরতে থাকে।

এখন আমরা একটু আমাদের অন্তরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখি, তা খালি আছে, না-কি তার ভেতর নানা ধরনের কৃত্রিম মূর্তি। مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ (এগুলো সবই মূর্তিতুল্য, যে পর্যন্ত এই মূর্তিগুলো কারো ভেতরে অবস্থান করবে, সে পর্যন্ত তাতে আল্লাহর তাজাল্লি (নুর) ঝরতে পারবে না)। তাই আজকের এই মাহফিল থেকেই আমরা মনে মনে দৃঢ়সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা করে নিই, হে আল্লাহ! আমরা সৃষ্টির, প্রকৃতির, যৌনো ও শয়তানি ভালোবাসাকে ছেড়ে দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে সবকিছু থেকে মুক্ত করে নিয়েছি। এখন এই হৃদয় শুধু তোমার জন্যেই বরাদ্দ থাকবে, তুমি এখন এর দিকে একটু তোমার রহমতের নজর দাও।

আমরা যখন এমন নিয়ত ও সংকল্প করে নেবো, তখন আল্লাহপাকের বিশেষ রহমতের নজর এর ওপর পড়বে।

تَرَكْتُ اللّٰتَ وَ الْعُزّٰى جَمِيْعًا

[তারাকতুল্লা-তা ওয়াল ওয্যা জামীআন]

كَذَالِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيْرُ

[কাযা-লিকা ইয়াফআলুর রজুলুল বাসীরু]

লাত ও মানাত ত্যাগ করেছি
ত্যাগ করেছি ওজ্জাকেও

জ্ঞানের ভারে ঋদ্ধ যারা
ত্যাগ করেছে নফসটাকেও।

আজ আমরাও এই মাহফিলে সবধরনের লাত, মানাত, উজ্জা, হুবলকে ছুড়ে মারবো, ভেঙ্গে ফেলবো আর আল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবো, হে আমার মাওলা! বায়তুল্লাহশরিফ খালি আর সবকিছু থেকে ফাঁকা থাকার কারণে সেখানে তোমার রহমতের তাজাল্লির ফল্গুধারার মাধ্যমে তা টুইটম্বুর করে দিয়েছো। এখন আমাদের হৃদয় ও অন্তরও অন্যসবকিছু থেকে মুক্ত করে নিচ্ছি। তাই আমাদের অন্তরকে তোমার তাজাল্লি দিয়ে ভরে দাও! আমিন!!

প্রেমিকদের ওমরা

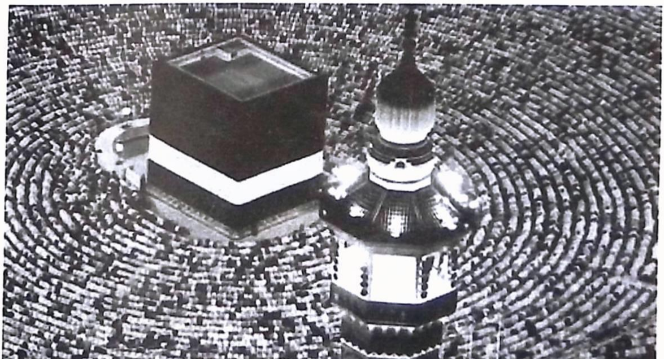

হজ ও ওমরা কার জন্যে?

আল্লাহপাক পবিত্রকোরআনে বলেছেন–

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

"আর তোমরা হজ আর ওমরা পুরো করো একমাত্র আল্লাহর জন্যে।" এই আয়াতে আল্লাহপাক মুসলমানদেরকে পবিত্র হজ আর ওমরা পূর্ণ (পালন) করার নির্দেশ দিয়েছেন। আয়াতে اَتِمُّوْا শব্দটি আদেশসূচক বা অনুজ্ঞাবাচক। এটি নির্দেশ জারি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। এখানে একটি বিশেষ সূক্ষবিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, চিহ্নিত করেছেন। সেটি হচ্ছে, لِلّٰهِ (লিল্লাহ) একমাত্র আল্লাহর জন্যে। একমাত্র আল্লাহর জন্যে বলে কী বুঝাতে চেয়েছেন? এতে বুঝাতে চেয়েছেন, এ কাজগুলো আল্লাহপাকের ভালোবাসার সাগরে ডুব দিয়ে, নিমজ্জিত হয়ে আদায় করো। মানুষ অনেক ধরনের কাজ করে; কিন্তু সেখানে যে নিয়ত বা উদ্দেশ্যে প্রাধান্য থাকে, সেটি তারই রঙে রাঙিয়ে ওঠে, তার নামেই চিহ্নিত হয়ে যায়। যেমন, কেউ তার সন্তানের জন্যে কিছু কিনে আনলে তা বাড়ির অন্যসদস্যরাও খায়; কিন্তু নাম হয় সেটি সেই সন্তানের নামেই। অথবা ধরুন বাড়িতে নতুন জামাই আসবে, সে জন্যে বিশেষ আয়োজন করা হয় এবং তা বাড়ির সবাই মিলেমিশেই খায়, অথচো তার নাম হয় কিন্তু 'জামাই আয়োজন' বা জামাই খাবার। এমনকি এই একই কথা যদি বার বার বলা হয়, তাহলে স্ত্রী অভিমানের সুরে বলে, তুমি সবকিছু তো তোমার সন্তানের জন্যেই করো, আমার জন্যে কী করেছো? এমন বলার কারণ, স্বামী স্ত্রীর মাঝে একবিশেষ ধরনের গভীর সম্পর্ক থাকে, প্রেমের সম্পর্ক থাকে, সেই ভালোবাসা দাবি করে, তারই রঙে সব রাঙিয়ে উঠুক। সবকিছু তাকে কেন্দ্র করেই হয়ে চলুক।

মহান আল্লাহপাকও ঠিক এমনই চান যে, এই হজ আর ওমরা, যা অনেক ধরনের আমলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যেমন, হজের মাঝে নামাজ আছে, তেলাওয়াত আছে, অর্থ ব্যয় আছে, নফল রোজা আছে, এসব হজেরই অংশবিশেষ। এগুলো ছাড়া হজ পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এসব কিছুই শুধু আল্লাহর জন্যেই হোক, তাঁর রঙেই রাঙিয়ে উঠুক। এজন্যে বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, এই হজ আর ওমরা করলে একমাত্র আল্লাহর জন্যে করো, তাঁর ভালোবাসা অর্জনের জন্যে করো

কে কোন নিয়তে হজ করবে?

হাদিসশরিফে এসেছে, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, কেয়ামতের আগে কিছুলোক হজ করবে শুধু দেশ বেড়ানোর উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ, একশ্রেণীর ধনী-সম্পদশালী লোক হজকে আনন্দভ্রমণ ও পর্যটনের উপলক্ষ

হিসেবে ব্যবহার করবে, এটিকে বানিয়ে নেবে শপিং করার একটি মোক্ষম মাধ্যম, উপযুক্ত সুযোগ। আর একশ্রেণীর আলেম-ওলামা বার বার হজ করবে গৌরব করার জন্যে। গর্ব করে তারা বলে বেড়াবে, আমি জীবনে এতোবার হজ করেছি, এতোবার ওমরা করেছি! আবার একশ্রেণীর গরিব লোক এই হজকে গ্রহণ করবে ভিক্ষাবৃত্তি আর চাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে। হজের নাম আর বাহানা করে নানাভাবে চেয়ে মেঙ্গে অর্থ কামাইয়ে লেগে যাবে।

অথচো আল্লাহপাক বলেন, গোটা হজের সফরে সব কাজের উদ্দেশ্য হতে হবে একমাত্র আমার ভালোবাসা। এখানে লিল্লাহ (আল্লাহর জন্যে) যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এটি গভীর তাৎপর্য বহন করে। এজন্যে আমাদের বড়োরা বলেছেন, হজ আর ওমরার সফর হচ্ছে আশেকানা সফর, প্রেমপূর্ণ সফর। মোমিনরা বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়ই তাদের বলে দেয়া হয়, তোমাদের যে পোশাক-আশাক রয়েছে, যার দ্বারা গৌরব, আভিজাত্য আর উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ প্রকাশ পায়, তা এখানেই শেষ করে দাও, ছুড়ে মারো, তোমরা সবাই একবেশে একমনে একই পন্থায় আমার কাছে হাজির হও।

تیرے دربار میں پہونچے تو سبھی ایک ہوئے

[তেরে দরবার মেঁ পঁহচে তু সভী এক হোয়ে]

তোমার দ্বারে পৌঁছে সবাই
এক হয়েছে জানি
ধনী গরিব সবাইকে তাই
এক বরাবর মানি।

বলা হয়েছে, পুরুষরা শুধু দু'টি চাদর (কাপড়) শরীরে জড়িয়ে নেবে, যা দেখতে কাফনের মতো মনে হয়। আর সেটিকেই বলা হয় এহরাম। এহরাম বাঁধা অবস্থায় তার চুল থাকবে এলোমেলো, অগোছালো, চেহেরা থাকবে মলিন জীর্ণশীর্ণ, সফরের ক্লান্তি আর অবসাদের চিহ্ন ফুটে উঠবে অবয়বজুড়ে। যা দেখে মনে হবে দুনিয়ার চাকচিক্য বা সাজসজ্জার এবং সৌন্দর্যের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই। এ সময় না তারা খোশবু ব্যবহার করতে পারবে, না পারবে তারা চুল নখ কেটে পরিপাটি হতে। কোনো মন্দ ও কটুবাক্য বলতে পারবে না, পারবে না অশ্লীলভাষা ব্যবহার করতে। পাপকাজের কথা কল্পনাতেও আনা যাবে না, এমন কি স্বামী-স্ত্রী যাদের সবকিছু করা বৈধো, তারাও এহরাম বাঁধা অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীসুলভ কোনো আচরণ করতে পারবে না, করতে পারবে না প্রেম-ভালোবাসা আদান প্রদান, অর্থাৎ, অন্যসময়ে যেসব কাজ বৈধো ছিলো, এহরাম বাঁধার পর (নির্দিষ্ট এবাদত ও একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া) তার সবকিছু হারাম হয়ে যায়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একান্ত ঘনিষ্ঠ কাজগুলো খুবই স্পর্শকাতর। যার কারণে তাওয়াফেজেয়ারত ছাড়া হজের অন্যান্য কাজ, যেমন, আরাফায় অবস্থান, মুজদালেফায় অবস্থান, মিনায় গমন, কঙ্কর ছোড়া, কোরবানি

ইত্যাদি সম্পন্ন করার পর হলক (চুল কাটার) করার মাধ্যমে এহরাম খুলে ফেলার পরও তার জন্যে অন্যসব কাজের অনুমতি ফিরে এলেও স্বামী-স্ত্রীর মিলন বৈধো হয় না। এজন্যে অপেক্ষা করতে হয় তাওয়াফেজেয়ারত পর্যন্ত।

বোঝা গেলো 'লিল্লাহ' বা একমাত্র আল্লাহর জন্যে কথাটি আমাদের এই বার্তা প্রদান করছে। এটি নিছক আনন্দভ্রমণ নয়, শুধু বিনোদন আর শপিং করার উপলক্ষ নয়; এটি হচ্ছে আল্লাহপাকের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের সফর। যেমন তিনি বলেছেন–

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

"আর তোমরা একমাত্র আমি আল্লাহর জন্যেই হজ আর ওমরা পুরো করো।" তাই হজ-ওমরার প্রতিটি কাজের মাঝে ঝিলিক দিতে হবে আল্লাহর ভালোবাসার রঙ। স্বামী হোক বা স্ত্রী, ভাই হোক বা বোন, বাবা হোক বা সন্তান, আল্লাহপাক এই সফরে সবার প্রতিটি আমলের মাঝে এটি দেখতে চান যে, তারা সবাই আমার ভালোবাসার জন্যে কতোটা ব্যাকুল বা কী পরিমাণ উদগ্রীব?

জোবায়দা খাতুনের ঘটনা

রানী জোবায়দার ব্যাপারে জানা যায়, তিনি বহু সমাজ সেবামূলক কাজ করে গেছেন। বিশেষ করে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জোবায়দা খাল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। যা দিয়ে এখন পর্যন্ত লাখো কোটি মানুষ উপকৃত হয়ে চলেছেন। সদকায়েজারিয়া হিসেবে চালু আছে। তার মৃত্যুর পর কোনো একনেককার লোক তাঁকে স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নের মাঝে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে মহিয়সী জোবায়দা! এখন আপনার কী অবস্থা হয়েছে? জবাবে তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহপাকের সামনে হাজির করা হয়, সেই সাথে নহরেজোবায়দা বা জোবায়দা খালের মাধ্যমে প্রাপ্ত সোয়াব বা আমলও উপস্থাপন করা হয়। এখন আল্লাহপাক বলেন, হে জোবায়দা, জানি তোমার মুখ আমার গুণগান করেছে, তোমার ধন-সম্পদ দিয়ে নানা ধরনের সোয়াবের কাজ হয়েছে। এগুলো তোমার মৌখিক ও আর্থিক এবাদত, এখন বলো, তুমি আমার জন্যে কায়িক বা দৈহিক কী কষ্ট করেছো?

জোবায়দা বলেন, এমন প্রশ্নে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যাই, আতঙ্কিত হয়ে পরি, ভাবি, সত্যিই তো আমার কোনো দৈহিক কষ্টকর এবাদত নেই! এমন কি পার্থিব কষ্টকর কোনো কাজও আমি করিনি কখনও। কারণ, আমি ছিলাম প্রথমে শাহজাদি, এরপর সম্রাজ্ঞি, কখনও একটি সুতো ছিঁড়ে দু'ভাগ করতে হয় নি আমাকে। আমি ভীষণ ঘাবড়ে যাই; কিন্তু তখন আল্লাহপাকের রহমতের ঢেউ উথলে ওঠে। তিনি বলেন, তোমার দৈহিক কষ্টকর তেমন কোনো আমল না থাকলেও তোমার ভিন্নধর্মী ছোট্ট একটি আমল খুব পছন্দ হয়েছিলো। সেই আমলটি ছিলো, একবার তুমি দুপুরের খাবার খেতে বসেছিলে, হাতে রুটি ছিঁড়ে নিয়ে তাতে সালুন লাগিয়ে যেইমাত্র মুখে দিতে যাবে, এমন সময় পাশের

মসজিদ থেকে ভেসে আসে আজানের ধ্বনি–আল্লাহ-হু আকবার! তখন তোমার মাথার ওড়না অর্ধেকটা নেমে গিয়েছিলো, সাথে সাথে খাবার বন্ধ রেখেই বাঁ হাত দিয়ে সেই ওড়না টেনে নিয়ে পুরো মাথা ঢেকে নিয়েছিলে। আমার নামের সম্মান প্রদর্শনের খাতিরে তখন আমি তোমার এই কাজের প্রতি ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। আজ তোমাকে আমি সেই ছোট্ট আমলটির কারণে পুরোপুরি ক্ষমা করেদিলাম। কারণ, সেটি করেছিলে একমাত্র আমার প্রতি ভালোবাসার কারণে।

মূর্তিগুলো ছুড়ে ফেলো, চাই তা কল্পনার হোক বা পাথরের

মহান আল্লাহপাক পবিত্রকোরআনে ঘোষণা করেছেন–

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

"তোমরা একমাত্র আমার জন্যেই হজ আর ওমরা পুরো (পালন) করো।"
তাই মনে রাখবেন, আমরা এখন যে মহৎ সফরে বের হয়েছি, সেটি একটিমাত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে করেছি। আর তা হচ্ছে, আল্লাহকে রাজি-খুশি করা; কিন্তু তিনি সে নাগাদ কখনই রাজি হবেন না, যে নাগাদ আমরা এখানে এসে এটি প্রমাণ করে দিতে না পারবো যে, পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে আমরা তোমাকে বেশি ভালোবাসি। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যেক নিশ্বাসে-প্রঃশ্বাসে তোমার ভালোবাসা জড়িয়ে আছে; কিন্তু সেটি কীভাবে বাস্তবায়ন হবে? এজন্যে তো এহরাম অবস্থায় বেশি বেশি তালবিয়া পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

"হাজির, আমি তোমার কাছে হাজির! হে আল্লাহ, তোমার কোনো শরিক নেই। তোমার কাছে হাজির! নিশ্চয়ই সব প্রশংসা, অনুগ্রহ ও রাজত্ব শুধু তোমার জন্যেই।"
এখানে হাজির হওয়ার মানে কী? এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্যসবকিছু ছেড়ে দেয়া।

تَرَكْتُ اللَّاتَ وَ الْعُزّٰى جَمِيْعًا

[তারাকতু ইল্লাতা ওয়ালয্যা জামীআন]

كَذَالِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيْرُ

[কাযালিকা ইয়াফআলুর রজুলুল বাসীরু]

লাত ও মানাত ত্যাগ করেছি
ত্যাগ করেছি ওজ্জাকেও
জ্ঞানের ভারে ঋদ্ধ যারা
ত্যাগ করেছে নফসটাকেও।

প্রত্যেক সেই বস্তু, যা বান্দাকে আল্লাহবিমুখ করে দেয়, তা-ই তার জন্যে লাত-মানাত, ওজ্জা তথা মূর্তি সমতুল্য। এগুলো মাটি বা পাথরের নির্মিত হওয়া জরুরি নয়। এগুলো বেশিরভাগ রক্তে মাংসে গড়া মানবমূর্তি। যখন কোনো কিছুর ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসাকে অতিক্রম করে যাবে, তখন সেটিই তার জন্যে মূর্তি তথা লাত-মানাত হিসেবে পরিগণিত হবে।

আমরা যখন আমাদের বাড়ি থেকে বের হয়েছি, তখন যেনো আমরা সবধরনের মানবিক মূর্তিটুর্তি মন থেকে বের করে দিয়ে শুধু তাঁর দিকেই মোড় নিয়েছি এবং তাঁরই ভালোবাসার সাগরে ডুব দিয়ে বের হয়েছি। আর এই তালবিয়া তারই স্বীকৃতি। তারই প্রমাণ।

তালবিয়া কীভাবে পড়বো

দশম হিজরিতে সাহাবায়েকেরাম যখন নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সাথে এহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়তে পড়তে এগিয়ে চলেছিলেন, (হাদিসশরিফে এসেছে,) তখন হজরত জিবরাইল [আলায়হিসসালাম] নেমে আসেন। বলেন, হে আল্লাহপাকের প্রিয়বন্ধু! মহান আল্লাহপাক বলেছেন, আপনার সাথীদের বলে দিন, তারা যেনো উঁচুস্বরে তালবিয়া পড়ে। দেখুন, এই বিশেষ বার্তাটি দেয়ার জন্যে আল্লাহপাক স্বয়ং জিবরাইল [আলায়হিসসালাম]-কে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সাহাবারা বলেন, তারপর থেকে আমরা এতো বেশি পরিমাণ তালবিয়া পড়তাম, যার কারণে আমাদের গলা (কণ্ঠনালী) শুকিয়ে যেতো!

কিন্তু আজ আমাদের মুখ দিয়ে তালবিয়ার শব্দই বের হতে চায় না। পানি পানের পরিবর্তে জুস পান করি, রুটির পরিবর্তে খাই চিকেন বিরিয়ানি; কিন্তু তারপরও আল্লাহপাকের জিকিরে এতোটাই দুর্বল যে, মুখ দিয়ে তালবিয়া শব্দ করে বের হতেই চায় না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যায়, অথচো তালবিয়া পড়ার সুযোগই হয় না! অথচো এহরাম বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। এ কেমন ওমরা? আমাদের তো এভাবে এ পরিমাণ তালবিয়া পড়া দরকার, যেনো উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, প্রতি পদে পদে মুখ দিয়ে বের হতে থাকে। এ কারণেই ফেকাহবিদরা লিখেছেন, হাজিরা ওপর দিকে উঠতে আর নামতে, এক অবস্থা থেকে অন্যঅবস্থায় পরিবর্তনকালে, এমনকি অন্যকারো সাথে দেখা-সাক্ষাতের সময়ও তালবিয়া পড়বে। আগে তালবিয়া পরে সালাম করবে। প্রতিটি কাজে আল্লাহর ভালোবাসা অগ্রগণ্য থাকবে। এই সফর আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয়।

সর্বাবস্থায় রাজি থাকবে

আল্লাহপাক বলেছেন, তোমরা হজ ও ওমরা পুরো করো একমাত্র আমার জন্যেই। আমরা এই উদ্দেশ্যে বের হয়েছি, আল্লাহপাকের কাছে সেটিই খুব প্রিয় আমল। যেটি পালন করা হবে আল্লাহর প্রেমের সাগরে ডুব দিয়ে। এজন্যে তিনি অন্যত্র বলেছেন–

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ

"আর তারা আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উদ্দেশ্যে এতিম, মিসকিন এবং বন্দিদের খাবার খাওয়ায়।"

এই আল্লাহর ভালোবাসাই মূল উদ্দেশ্য। এমন যেনো না হয়, কেয়ামতের দিন আমরা বলবো, হে খোদা! আমরা ওমরার জন্যে সফর করেছিলাম আর আল্লাহ বলবেন, তা জানি; কিন্তু তোমরা আমার জন্যে কী কী করেছিলে? ঠিক করে বলো দেখি, সেই সফরে তোমরা আমার জন্যে কী কী করেছিলে? এ জন্যে মূল উদ্দেশ্যটা সামনে রাখতে হবে। এই সফরকে কেন্দ্র করে যতো ধরনের দুঃখ-কষ্ট, বালা-মসিবতের মুখোমুখি হতে হবে, তা হাসিমুখে বরণ করে নেবে।

তিন কাজ একদম করা যাবে না

এই হজের সফরে তিনটি কাজ একেবারেই করা যাবে না: (১) অধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটনো যাবে না। অধৈর্য কী? অধৈর্য হচ্ছে, ছোটোখাটো সামান্য বিষয়েই একে অন্যের প্রতি উত্তেজিত হয়ে পরা। একটুতেই অসন্তুষ্ট হওয়া, হাতাশা প্রকাশ করা; (২) অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাবে না। অকৃতজ্ঞতা বা কী? অকৃতজ্ঞতা হলো, এটা ভালো হয়নি, ওটা মনঃপুত হলো না। জাহাজের সিট ভালো না, হোটেল রুম সুন্দর নয়। খাবারের মান উন্নত নয়। বাসের সিট ভালো নয় ইত্যাদি।

ভালো বলতে কী বোঝায়? আল্লাহপাক এই যুগে এতো সহজ উপায়ে হজের সফর করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমরা কি সত্যিই এর যোগ্য ছিলাম? না কখনই ছিলাম না। এয়ারপোর্ট এয়ারকন্ডিশান, বাসগুলোও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, বিমানেও এসি করা; কিন্তু তারপরও আমাদের অভিযোগ শেষ হয় না।

অমুক জায়গায় বেশি সময় লেগে গেছে, ইমিগ্রেশনে দেরি হয়েছে। আরে ভাই, আমাদের মুখ দিয়ে এই যেসব অভিযোগের ফুলঝড়ি ছিটছে, এগুলো সবই অকৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। তাই সবধরনের ধৈর্যহীনতা আর অকৃতজ্ঞতার বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এমন কোনো কথা বলা যাবে না, যার মাধ্যমে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

(৩) এমন কোনো কাজ না করা, শরিয়তের ভাষায় যাকে পাপ বলে। পাপকাজ করা তো সর্বাবস্থাতেই নিন্দনীয় ও বর্জনীয়; কিন্তু স্বয়ং আল্লাহপাকের ঘরে এসে তাঁর অবাধ্যতা করা একেবারেই গর্হিত ও অশোভনীয়। এখানে পাপকাজ করা মারাত্মক অপরাধ। তাই মুখ থেকে এমন কোনো কথা বের না করা, চোখ দিয়ে এমন কোনো জিনিস না দেখা, কান দিয়ে এমন কিছু না শোনা আর হাত পা দিয়ে এমন কোনো কাজ না করা, যেগুলোকে শরিয়ত গোনাহ বা পাপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, এমন কোনো ধরনের পাপকাজে কখনই জড়াবো না। এককথায়, এই তিন ধরনের কাজ একেবারেই করবো না।

ওমরা করা কখন ভালো

আমরা এখন এহরাম অবস্থায় আছি এবং ওমরা করারও নিয়ত আছে। আমরা এখানে রাতে এসে পৌঁছেছি, ইচ্ছে করলে রাতেই এ কাজ সেরে ফেলা যেতো; কিন্তু আমাদের সাথে নারী ও শিশু আছে, আবার বুড়োও আছে, তারপরও আমরা যদি রাতেই একাজ করতে যেতাম, তাহলে ব্যাপারটা হতো কোনো রকমে মাথা থেকে দায়িত্বটা ঝেড়ে ফেলার মতো। সবার চিন্তা থাকতো যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় কাজটা শেষ করে ফেলার, সবার মন বলতো, কখন শেষ হবে? জলদি করো, ক্লান্ত শরীর, ক্লান্ত মন, এদিকে ঘুম এসে খুব কষ্ট দিচ্ছে। তাহলে আমরা কি এতোদূর থেকে এতো কষ্ট করে এজন্যে এখানে এসেছি যে, দুই, পৌনে দুই ঘণ্টায় ওমরার কাজ শেষ করে ফেলবো? না, আমরা একটি আলাদা এবাদত করার জন্যে এখানে এসেছি, যে কারণে সামান্য বিরতি দিলাম। এতে করে অসুস্থরা ওষুধ সেবন করে সুস্থ হয়ে উঠবে, ক্লান্ত-শ্রান্ত লোকেরা বিশ্রাম করে সতেজতা ফিরে পাবে এবং এশার পর পুরোপুরি ফ্রেশ হয়ে আমাদের প্রভুর দরবারে হাজির হবো। জানি আল্লাহর কাছে চাওয়ার জন্যে হৃদয় অস্থির হয়ে আছে, তাঁর ঘরে নিজেকে সঁপে দেয়ার জন্যে অন্তর আকুলি বিকুলি করছে, তাই এমন অবস্থায় আল্লাহপাকের দরবারে (ঘরে) হাজির হওয়া দরকার, যখন হৃদয় তাঁর ভালোবাসায় টুইটম্বুর থাকে। তাই মাঝখানে এতোটুকু বিরতি দিলাম শুধু নিজেদের দেহ-মন ফ্রেশ করে নেয়ার জন্যে। এখন ইনশাআল্লাহ এশার নামাজের পর ভীড় কিছুটা কমে গেলে আরাম মতো শান্তভাবে তাওয়াফ সম্পন্ন করা যাবে। যেহেতু এশার নামাজের সময় ভীড়টা একটু বেশি থাকে, তাই একটু দেরি করে তা শুরু করবো, আমার আর বন্ধুদের অতীত অভিজ্ঞতা বলে, রাত দশটা থেকে একটা পর্যন্ত সাধারণত ভীড় কিছুটা কম থাকে, তাই সেটিই হবে তাওয়াফ করার মোক্ষম সময়। সেই সময় আমরা হারামশরিফে যাবো–ইনশাআল্লাহ!

হারামশরিফের পাঁচ কাজ

হারামশরিফে গিয়ে আমাদের পাঁচটি কাজ করতে হবে: (১) হারামশরিফে ঢুকার সময় তালবিয়া পড়তে পড়তে যাবে। তালবিয়ার ব্যাপারে একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। এখানে অনেকেই কিছুটা ভুল করে থাকে। তালবিয়া পড়তে এহরাম বাঁধতে হয় এবং এখান থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদের পাশে গিয়ে তাতে চুমু দেয়ার মাধ্যমে তার সময় শেষ হয়ে যায়। এই স্লোগান দেয়ার প্রয়োজন ছিলো এখানে আসার সময়। যখন আল্লাহর ঘরের মিলনাকাঙ্খায় সবাই ব্যাকুল আর উন্মাদ থাকে, লাব্বাইক লাব্বাইক বলে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। যারা এই মাসয়ালাটি জানে না, তারা আবেগের বশে তাওয়াফ করার সময়ও তালবিয়া পড়তে থাকে। আরেকটি মাসয়ালা হচ্ছে, নারীরা সবসময় ধীরে ধীরে তালবিয়া

পড়বে আর পুরুষেরা পড়বে শব্দ করে। উঁচুস্বরে; তবে উঁচুস্বরে পড়ার অর্থ এই নয়, শ্লোগানের মতো করে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুলবে; বরং উঁচুশব্দে পড়ার অর্থ হচ্ছে, সামান্য জোড়ে, মৃদু আওয়াজ করে পড়বে, যেনো পাশ থেকে আপাতত শোনা যায়। অর্থাৎ, মাঝামাঝি শব্দে। সেই সাথে বায়তুল্লাহশরিফে অর্থাৎ, হারামশরিফে ঢুকার সময় অন্তরে প্রবলভাবে আল্লাহপাকের বড়োত্ব ও মাহাত্ম্য ধারণ করতে হবে।

আমরা দেখে থাকি, কেউ কোনো মন্ত্রীর অফিসে ঢুকার সময় তার মনের অবস্থা বদলে যায়। খুব সতর্ক থাকে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ঢোকার সময় তার মাত্রা আরও একটু বেড়ে যায় আর যদি প্রেসিডেন্ট বা কোনো সম্রাটের দরবারে ঢুকে, তাহলে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মনোযোগী হয়ে যেতে হয়। তখন মনে আশা ও শঙ্কা দু'টোই কাজ করে।

আল্লাহপাক পবিত্রকোরআনে ঘোষণা করেছেন–

اُولٰٓئِکَ مَا کَانَ لَهُمْ اَنْ یَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِیْنَ

"আর তাদের উচিত অন্তরে ভয় মাহাত্ম্য নিয়ে মসজিদেহারামে প্রবেশ করা।"

(২) আল্লাহর ঘর মসজিদেহারামে পা রাখার সাথে সাথে এতেকাফের নিয়ত করতে হবে, কেউ আরবি নিয়ত না জানলে সে নিজ ভাষাতেই নিয়ত করলেও চলবে। নিয়তের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। মনে মনে বলবে–'আমি যতোক্ষণ এই মসজিদে আছি, ততোক্ষণ এতেকাফের নিয়ত করছি।' এটি হবে নফল এতেকাফ। এটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষ সবাই করতে পারে।

আমাদের এলাকায় নিয়ম আছে, যখন কোনো মেহমান আসে, তখন আমরা চাই মেহমানের সব চাহিদা পুরা করতে এবং চেষ্টাও করি। বলা হয়, তিনি একথাটি বলার জন্যে আমার বাড়ি পর্যন্ত চলে এসেছিলেন, তাই তার সম্মানার্থে তার কথা মেনে নিয়েছি। তেমনি আল্লাহপাকও বলেছেন, "তোমরা যখন আমার ঘরে চলে আসবে, তখন আমি তোমার সব আশা পুরো করে দেবো। সব চাহিদা মিটিয়ে দেবো। তিনি আরও বলেছেন, তোমরা আমার ঘর দেখার সাথে সাথে যে আবেদন করবে, আমি তা পুরো করে দেবো। কাবাশরিফের দিকে প্রথম নজর পরার সময়কার দোয়া কবুল করে নেবো।"

এর ব্যাখ্যায় ওলামায়েকেরাম লিখেছেন, প্রথম নজর দিয়ে উদ্দেশ্য, মোমিনের উচিত হলো, তারা যখন হজ বা ওমরার জন্যে যাবে, তখন তাদের নজর নিচু রাখবে। কারণ, হঠাৎ যদি অমনোযোগী অবস্থায় নজর পরে যায়, তাহলে একে তো তার সম্মান রক্ষা করা যাবে না, দ্বিতীয়তো, তখন মনোযোগ বা ধ্যান অন্যদিকে থাকতে পারে। তাই সেখানে যাওয়ার সময় নজর নিচু রাখবে, আদবের সাথে চলবে, চলতে চলতে মাতাফে (তাওয়াফ করার জায়গায়) পৌঁছলে সেখানকার বাইরের লেভেলটা উঁচু আর কাবাশরিফ নিচে থাকায় কয়েকটি সিঁড়ি মাড়িয়ে নিচে যেতে হয়। নিয়ম হলো, (আমরা যেহেতু

দলগতোভাবে যাবো), নজর নিচু রেখে এগিয়ে যেতেই থাকবে। যেতে যেতে থেমে গেলে বুঝতে পারবো আমরা এখন বায়তুল্লাহর সামনে চলে এসেছি। এ অবস্থায় কয়েক সেকেন্ডে নিজেকে সামলে নিতে হবে, এরপর যখন নিশ্চিত হওয়া যাবে, হ্যাঁ, আমার মন এখন পুরোপুরি স্থির আছে, আমি পুরোপুরি প্রস্তুত, তখন শান্তভাবে কাবাশরিফের দিকে চোখ তুলে তাকাবো এবং চোখের পলক পরার আগেই (চোখ বন্ধ হওয়ার আগে) যে বিশেষ দোয়া করার প্রয়োজন হয়, মনে চায়, তা করবো। এখন কেউ বলতে পারে, কী সেই বিশেষ দোয়া করবো?

ইমাম আবুহানিফার বলে দেয়া দোয়া

একলোক ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর কাছে জানতে চায়, হুজুর, মানুষের দোয়া (মনের বাসনা) অনেক আর সময় মাত্র কয়েক সেকেন্ড তথা একপলক, এই একপলক সময়ে মানুষ আল্লাহর কাছে কিসের দোয়া করবে? কী কী চাইবে?

ফেকাহবিদদের কথার গভীরতা অনেক, জবাবে ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, এ জন্যে তুমি কাবাশরিফের দিকে নজর পরামাত্রই এই দোয়া করবে–"হে খোদা! আমাকে 'মোস্তাজাবুদ্‌দাওয়াত' বানিয়ে দাও, 'মোস্তাজাবুদ্‌দাওয়াত'-এর অর্থ হলো, যার সব দোয়া কুবল করা হয়, কোনো দোয়াই আল্লাহপাক ফিরিয়ে দেন না। যদি তার এই দোয়া কবুল হয়ে যায়, তাহলে আর কী লাগে? এরপর যখন যার প্রয়োজন হবে, সেই দোয়াই করবে, আল্লাহপাক তা কবুল করে নেবেন। তাই আগে পাওয়ার বা দোয়া কবুলের মর্যাদা অর্জন করে নিতে হবে। সেই সাথে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, চোখের পলক পরে গেলেই যে তার আর কোনো দোয়া কবুল হবে না, ব্যাপারটা এমন নয়। কাবাশরিফের দিকে নজর দেয়ার প্রথম পলকটি একটি অপশনমাত্র । এই অপশনটা কাজে লাগাতে পারলে ভালো। এরপরের সময়গুলোতেও দোয়া করতেই থাকা দরকার। কারণ, একই মজলিসের একটি দোয়া কবুল করবেন আর বাকিগুলো করবেন না, এটা আল্লাহপাকের মাহাত্ম্যের সাথে যায় না। তাই নজর পরার পর থেকে দীর্ঘক্ষণ ধরে দোয়া করতে থাকা দরকার।

এতোক্ষণ আলোচনার সারমর্ম দাঁড়ালো, আমরা আল্লাহ ঘরে ভীত-বিহ্বল অবস্থায় কম্পিত মনে সম্মানের সাথে ঢুকবো। শুধু এহরাম অবস্থায় নয়; বরং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এভাবে ঢুকবো। এরপর এতেকাফের নিয়ত কবরো, তারপর কাবাশরিফের দিকে তাকিয়ে মন খুলে মোনাজাত করবো।

(৩) এ আমলটি শুধু পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তা হলো, এহরামের চাদর বদলিয়ে (ঘুরিয়ে) নেয়া, অর্থাৎ, এহরামের চাদর ডানে কাঁধের নিচ দিয়ে বাঁ কাঁধের ওপরে নিয়ে আসা। হজের পরিভাষায় এটিকে 'ইজতেবা' বলে। এটি অবশ্য সবসময় করতে হয় না, সবসময় চাদর শরীরের সাথে জড়িয়েই থাকে। এতেকাফের নিয়তের সাথে দোয়া করে চাদর ঘুরিয়ে নেয়ার পর হাজরে

আসওয়াদের সামনে যেতে হবে, এরপর এখানে দুটি কাজ করতে হবে। যেগুলোকে ৩ ও ৫ নম্বর কাজ হিসেবে ধরা হয়েছে। এ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন কাজ।
(৪) এস্তেকবালে কাবা, এটি একটি স্বতন্ত্র সুন্নত আর
(৫) এস্তেলাম, এটি একটি ভিন্ন সুন্নত।
এস্তেকবাল সম্পন্ন করার পদ্ধতি হলো, আমরা হাজরে আসওয়াদের দিকে গিয়ে তার দিকে মুখ করে এভাবে দাঁড়াবো, যেনো হাজরে আসওয়াদটি আমাদের ডান কাঁধের দিকে থাকে। এখানে দাঁড়িয়ে

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ تَعَالٰى

"আমি আল্লাহরওয়াস্তে ওমরার নিয়ত করছি।"

বলে বলবে–

نَوَيْتُ اَنْ اَطُوْفَ

"আমি তাওয়াফের নিয়ত করছি।"

তারপর একটু সামনে এগিয়ে এসে নামাজের মতো করে তাহরিমা বাঁধবে এবং বলবে–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

এভাবে এস্তেকবাল সম্পন্ন করবে। এরপর আমরা একটু এগিয়ে হাজারে আসওয়াদের সামনে চলে আসবো, এসে তাকে এস্তেলাম করবো। যদি হাজরে আসওয়াদের একদম কাছাকাছি আসা সম্ভব হয়, তাহলে তার দু'পাশে দু'হাত রেখে তাতে চুমু দেবে আর যদি প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে তা সম্ভব না হয় (অবশ্য তা খুব কমই সম্ভব হয় ভীড়ের কারণে), তাহলে একটু দূরে থেকেই হাতের ইশারায় উড়ন্ত চুমু (Flying kiss) দেবে, যেমনটি অনেকে (দূর থেকে) ছোটো বাচ্চাদের লক্ষ করে দিয়ে থাকে। ইংরেজিতে যাকে ফ্লাইং কিস বলে। হাদিসশরিফে এসেছে, হাজরে আসওয়াদ দুনিয়ার বুকে আল্লাহপাকের (ভালোবাসার) ডান হাত। আমরা যেমন মুরব্বিদের সাথে সাক্ষাতের সময় তাদের (ডান) হাতে চুমু দিই, ঠিক তেমনি আমরা যখন হাজরে আরওয়াদে চুমু দিই, তখন যেনো তাঁর (আল্লাহর) রহমতের ডান হাতেই দিয়ে থাকি।
একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, এস্তেকবাল আর এস্তেলাম দু'টি ভিন্ন ভিন্ন আমল, তবে এই দুই আমল মেয়েরাও করতে পারে।
এখন এতেকাফের নিয়ত, দোয়া, এজতেবা, এস্তেকাবাল আর এস্তেলাম সম্পন্ন হয়ে গেলে শুরু হয়ে যাবে আমাদের তাওয়াফের কাজ, এ অবস্থায় আমরা ডান দিকে মোড় নেবো। যেহেতু আমাদের মুখ এতোক্ষণ হাজরে আসওয়াদের দিকে ছিলো, তাই আমাদেরকে ডান দিকে মোড় নিতে হবে, এরপর কাবাশরিফ সাতবার প্রদক্ষিণের মাধ্যমে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হবে। এই সাতবার প্রদক্ষিণের প্রথম তিনবার পুরুষদের জন্যে রমল করতে হবে।

দলগতোভাবে যাবো), নজর নিচু রেখে এগিয়ে যেতেই থাকবে। যেতে যেতে থেমে গেলে বুঝতে পারবো আমরা এখন বায়তুল্লাহর সামনে চলে এসেছি। এ অবস্থায় কয়েক সেকেন্ডে নিজেকে সামলে নিতে হবে, এরপর যখন নিশ্চিত হওয়া যাবে, হ্যাঁ, আমার মন এখন পুরোপুরি স্থির আছে, আমি পুরোপুরি প্রস্তুত, তখন শান্তভাবে কাবাশরিফের দিকে চোখ তুলে তাকাবো এবং চোখের পলক পরার আগেই (চোখ বন্ধ হওয়ার আগে) যে বিশেষ দোয়া করার প্রয়োজন হয়, মনে চায়, তা করবো। এখন কেউ বলতে পারে, কী সেই বিশেষ দোয়া করবো?

ইমাম আবুহানিফার বলে দেয়া দোয়া

একলোক ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর কাছে জানতে চায়, হুজুর, মানুষের দোয়া (মনের বাসনা) অনেক আর সময় মাত্র কয়েক সেকেন্ড তথা একপলক, এই একপলক সময়ে মানুষ আল্লাহর কাছে কিসের দোয়া করবে? কী কী চাইবে?

ফেকাহবিদদের কথার গভীরতা অনেক, জবাবে ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, এ জন্যে তুমি কাবাশরিফের দিকে নজর পরামাত্রই এই দোয়া করবে–"হে খোদা! আমাকে 'মোস্তাজাবুদ্‌দাওয়াত' বানিয়ে দাও, 'মোস্তাজাবুদ্‌দাওয়াত'-এর অর্থ হলো, যার সব দোয়া কুবল করা হয়, কোনো দোয়াই আল্লাহপাক ফিরিয়ে দেন না। যদি তার এই দোয়া কবুল হয়ে যায়, তাহলে আর কী লাগে? এরপর যখন যার প্রয়োজন হবে, সেই দোয়াই করবে, আল্লাহপাক তা কবুল করে নেবেন। তাই আগে পাওয়ার বা দোয়া কবুলের মর্যাদা অর্জন করে নিতে হবে। সেই সাথে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, চোখের পলক পরে গেলেই যে তার আর কোনো দোয়া কবুল হবে না, ব্যাপারটা এমন নয়। কাবাশরিফের দিকে নজর দেয়ার প্রথম পলকটি একটি অপশনমাত্র । এই অপশনটা কাজে লাগাতে পারলে ভালো। এরপরের সময়গুলোতেও দোয়া করতেই থাকা দরকার। কারণ, একই মজলিসের একটি দোয়া কবুল করবেন আর বাকিগুলো করবেন না, এটা আল্লাহপাকের মাহাত্ম্যের সাথে যায় না। তাই নজর পরার পর থেকে দীর্ঘক্ষণ ধরে দোয়া করতে থাকা দরকার।

এতোক্ষণ আলোচনার সারমর্ম দাঁড়ালো, আমরা আল্লাহ ঘরে ভীত-বিহ্বল অবস্থায় কম্পিত মনে সম্মানের সাথে ঢুকবো। শুধু এহরাম অবস্থায় নয়; বরং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এভাবে ঢুকবো। এরপর এতেকাফের নিয়ত কবরো, তারপর কাবাশরিফের দিকে তাকিয়ে মন খুলে মোনাজাত করবো।

(৩) এ আমলটি শুধু পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তা হলো, এহরামের চাদর বদলিয়ে (ঘুরিয়ে) নেয়া, অর্থাৎ, এহরামের চাদর ডানে কাঁধের নিচ দিয়ে বাঁ কাঁধের ওপরে নিয়ে আসা। হজের পরিভাষায় এটিকে 'ইজতেবা' বলে। এটি অবশ্য সবসময় করতে হয় না, সবসময় চাদর শরীরের সাথে জড়িয়েই থাকে। এতেকাফের নিয়তের সাথে দোয়া করে চাদর ঘুরিয়ে নেয়ার পর হাজরে

আসওয়াদের সামনে যেতে হবে, এরপর এখানে দুটি কাজ করতে হবে। যেগুলোকে ৩ ও ৫ নম্বর কাজ হিসেবে ধরা হয়েছে। এ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন কাজ।
(৪) এস্তেকবালে কাবা, এটি একটি স্বতন্ত্র সুন্নত আর
(৫) এস্তেলাম, এটি একটি ভিন্ন সুন্নত।
এস্তেকবাল সম্পন্ন করার পদ্ধতি হলো, আমরা হাজরে আসওয়াদের দিকে গিয়ে তার দিকে মুখ করে এভাবে দাঁড়াবো, যেনো হাজরে আসওয়াদটি আমাদের ডান কাঁধের দিকে থাকে। এখানে দাঁড়িয়ে

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ تَعَالٰى

"আমি আল্লাহরওয়াস্তে ওমরার নিয়ত করছি।"

বলে বলবে–

نَوَيْتُ اَنْ اَطُوْفَ

"আমি তাওয়াফের নিয়ত করছি।"

তারপর একটু সামনে এগিয়ে এসে নামাজের মতো করে তাহরিমা বাঁধবে এবং বলবে–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

এভাবে এস্তেকবাল সম্পন্ন করবে। এরপর আমরা একটু এগিয়ে হাজারে আসওয়াদের সামনে চলে আসবো, এসে তাকে এস্তেলাম করবো। যদি হাজরে আসওয়াদের একদম কাছাকাছি আসা সম্ভব হয়, তাহলে তার দু'পাশে দু'হাত রেখে তাতে চুমু দেবে আর যদি প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে তা সম্ভব না হয় (অবশ্য তা খুব কমই সম্ভব হয় ভীড়ের কারণে), তাহলে একটু দূরে থেকেই হাতের ইশারায় উড়ন্ত চুমু (Flying kiss) দেবে, যেমনটি অনেকে (দূর থেকে) ছোটো বাচ্চাদের লক্ষ করে দিয়ে থাকে। ইংরেজিতে যাকে ফ্লাইং কিস বলে। হাদিসশরিফে এসেছে, হাজরে আসওয়াদ দুনিয়ার বুকে আল্লাহপাকের (ভালোবাসার) ডান হাত। আমরা যেমন মুরব্বিদের সাথে সাক্ষাতের সময় তাদের (ডান) হাতে চুমু দিই, ঠিক তেমনি আমরা যখন হাজরে আরওয়াদে চুমু দিই, তখন যেনো তাঁর (আল্লাহর) রহমতের ডান হাতেই দিয়ে থাকি।
একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, এস্তেকবাল আর এস্তেলাম দু'টি ভিন্ন ভিন্ন আমল, তবে এই দুই আমল মেয়েরাও করতে পারে।
এখন এতেকাফের নিয়ত, দোয়া, এজতেবা, এস্তেকাবাল আর এস্তেলাম সম্পন্ন হয়ে গেলে শুরু হয়ে যাবে আমাদের তাওয়াফের কাজ, এ অবস্থায় আমরা ডান দিকে মোড় নেবো। যেহেতু আমাদের মুখ এতোক্ষণ হাজরে আসওয়াদের দিকে ছিলো, তাই আমাদেরকে ডান দিকে মোড় নিতে হবে, এরপর কাবাশরিফ সাতবার প্রদক্ষিণের মাধ্যমে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হবে। এই সাতবার প্রদক্ষিণের প্রথম তিনবার পুরুষদের জন্যে রমল করতে হবে।

রমল

রমল বলা হয় বীরপালোয়ানের মতো বুক চেতিয়ে সাহসিকতার সাথে দ্রুতো চলন। রমলের বাংলা কখনও দৌড় হতে পারে না। দ্রুতো পায়ে বুক চেতিয়ে চলা আর দৌড়ানো একবিষয় নয়। অনেকে ব্যাপারটি না বুঝেই প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যেও দৌড়াতে থাকে। তখন একে কুনইয়ের গুঁতো লাগে, ওকে ধাক্কা লাগে। তাই সেখানে দৌড়ানো যাবে না। তবে সাহসিকতার সাথে বুক চেতিয়ে বীরপালোয়ানদের মতো একটু দ্রুতোবেগে চলবে, অর্থাৎ, হাঁটার গতিটা বিশেষ পদ্ধতিতে একটু বাড়িয়ে দেবে। বুড়োরা দেবে তাদের সামর্থ্য মতো আর তরুণ বাড়াবে তাদের মতো করে। তবে মহিলারা রমল করবে না।

সাহাবারা জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর কিছুটা ক্লান্তশ্রান্ত ছিলেন; কিন্তু তবুও তাঁদেরকে কাফেররা যেনো দুর্বল ভাবতে না পারে এ চিন্তা থেকে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তাঁদেরকে প্রথম তিনবার বাহাদুরের মতো মার্চ করতে বলেন এবং তিনিও করেন। আল্লাহপাকের কাছে সেই আমল খুব পছন্দ হয়ে যায়, যার কারণে তিনি এমন রমল করাকে চিরদিনের জন্যে তাওয়াফের অংশ বানিয়ে দেন। যে তাওয়াফের পর আবার সায়ি করতে হয়। এই চক্কর দেয়াকে আরবিতে শাওত (شَوْطٌ) বলে। সাত শাওতে (চক্করে) এক তাওয়াফ হয়। এই প্রতি চক্করে একবার করে হাজরে আসওয়াদের সামনে এসে এস্তেলাম বা উড়ন্ত চুমু দিতে হয় তাকে লক্ষ করে। ফলে একতাওয়াফে ফ্লাইং কিস বা উড়ন্ত চুমুর পরিমাণ দাঁড়ায় সাতটি।

তাওয়াফের ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা

এই তাওয়াফসংক্রান্ত কিছুকথা শুনে রাখুন, মনে রাখুন। তাওয়াফ একটি বিশেষ এবাদত। যেমন, নামাজ একটি বিশেষ এবাদত, নামাজের মধ্যে মানুষ এদিক ওদিক তাকায় না। তাকাতে পারে না, নামাজে দাঁড়িয়ে কেউ একবার ডানে, আবার বাঁয়ে তাকায় না, তাকাতে পারে না। এতে নামাজের ক্ষতি হয়, তেমনি তাওয়াফের সময়ও নজর নিচের দিকে রাখতে হয়, এমনকি বায়তুল্লাহশরিফের দিকেও মুখ তুলে তাকানো চলে না, তাওয়াফ চলাকালে সেদিকে মুখ করে বা পিঠ করে ঘুরে যাওয়া যায় না। এমন কি তাওয়াফ চলাকালে প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে কারও শরীর যদি কাবার দিকে বা তার বিপরীত দিকে ঘুরে যায় এবং সে ঘুরা অবস্থায় কয়েক কদম সামনে এগিয়ে যায়, তাহলে সেই ক'কদম তার তাওয়াফ হিসেবে গণ্য হবে না। হয়তো আবার সে পরিমাণ পেছনে এসে আবার সামনে এগুনো শুরু করবে, না হয় (যদি পেছনে আসা সম্ভব না হয়, সাধারণত এমন সম্ভব হয়ও না), তাহলে সেই চক্করটাকেই হিসাব থেকে বাদ দিয়ে একচক্কর বেশি আদায় করবে। তবে হ্যাঁ, তাওয়াফ চলাকালে কেউ যদি ইচ্ছে করে দাঁড়িয়ে

যায়। আর এই দাঁড়ানো অবস্থায় তার বুক বা পিঠ কাবাশরিফের দিকে ঘুরে যায়, তাহলে এজন্যে তার তাওয়াফের কোনো ক্ষতি হবে না।

মূল ব্যাপারটা হচ্ছে, তাওয়াফের সময় চলন্ত অবস্থায় তার মুখ বা পিঠ কাবার দিকে হওয়া চলবে না। এ কারণেই তো তাওয়াফের মাঝে হাজরে আসওয়াদের পাশে এসে তাকে (উড়ন্ত) চুমু দেয় আর তখন তার মুখ কাবাশরিফের দিকে হয়ে যায়, তবুও তার তাওয়াফের কোনো সমস্যা হয় না। কারণ, তখন সে আর চলন্ত অবস্থায় থাকে না; বরং থেমে গিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে চুমু দেয়।

আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা মনে রাখবেন, এই মাসয়ালাটি জানা না থাকার কারণে অথবা সেদিকে গুরুত্ব না দেবার কারণে অনেকে মারাত্মক অন্যায় করে বসে। অনেক দম্পতিকে দেখা যায়, তাওয়াফের সময় হয় স্বামী স্ত্রীর কাঁধে অথবা স্ত্রী স্বামীর কাঁধে হাত দিয়ে এগিয়ে চলেছে অথবা একজন আরেকজনের হাত ধরে তাওয়াফ করে চলেছে, অথচো তারা একটুও খেয়াল করছে না, তাওয়াফ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত (এটি কোনো সকাল বিকালের পায়চারী বা জগিং নয়) আর এবাদত তার নিয়মনীতি মেনেই পালন করতে হয়। নামাজের মধ্যে যেমন স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের কাঁধে বা হাতে হাত রেখে বা হাত ধরাধরি করে নামাজ পড়া যায় না, ঠিক তেমনি তাওয়াফের সময়ও একে অন্যের হাত ধরা বা শরীরে হাত লাগানো যায় না, যদিও মাঝে কাপড় থাক না কেনো।

হ্যাঁ, একান্ত প্রয়োজন হলে কেউ যদি হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, তাহলে একটি রুমাল বা এ জাতীয় কোনো কাপড় নিয়ে তার দুই প্রান্ত দু'জন ধরে এগিয়ে যাবে, তবুও শরীর ছুঁবে না। কারণ, আসল উদ্দেশ্য তো হচ্ছে এবাদত করা, আর পূর্ণাঙ্গ এবাদতের জন্যে মনোযোগ পুরোপুরি আল্লাহপাকের দিকে রাখতে হবে।

তিতা হলেও বাস্তব সত্য, হজে আজকাল যুবক তরুণেরা তাওয়াফও করছে, আবার ধুমছে সেলফোনে কথাও বলে চলেছে প্রিয়তমাদের সাথে। বলে যাচ্ছে–আমি এখন হাজরে আসওয়াদের সামনে, এখন আমার পঞ্চম চক্কর চলছে। এমনও অনেক তরুণকে দেখেছি, যারা তাওয়াফও করছে, আবার তার সরাসরি কমেন্ট্রিও করছে (ধারাভাষ্য দিয়ে যাচ্ছে)! আল্লাহপাকের কাছে আমাদের এমন তাওয়াফের কোনোই প্রয়োজন নেই। তাই তাওয়াফের আগেই সবার সেলফোন (মোবাইল) বন্ধ করে নিন এবং বলুন, হে প্রিয়খোদা! এই অবস্থায় আমি সব সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধু তোমার সাথে তা জুড়িয়ে দিয়েছি।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তাওয়াফের সময় বেশি বেশি দোয়া করা ভালো। অনেকে এটা না জানার কারণে সেসময় কালেমার ওজিফা পড়ে। জিকির করে। অনেকে আবার পবিত্রকোরআন তেলাওয়াত করে। হ্যাঁ, কোরআনমাজিদ তেলাওয়াত করা একটি খুবই ভালো এবাদত আর কালেমা পড়া সেরা জিকির; কিন্তু সবকিছুরই কিছু কিছু নির্দিষ্ট সময় আছে, সেই সময়ে সেটি করাই ভালো।

আর তাওয়াফের সময়টা মহান আল্লাহপাকের কাছে চাওয়ার সেরা সময়। তাই এই সময় বেশি বেশি দোয়া করা উচিত। তবে সে দোয়া আরবি ভাষাতে হওয়া জরুরি নয়। যেকোনো ভাষায় হলেই চলবে। তবে নিজ মাতৃভাষায় চাওয়া বেশি উপকারী।

কথায় বলে, সময়ের এককোপ আর অসময়ের দশ কোপ, তাই ঝেনে বুঝে কোপ মারতে হয়। আমরা সাধারণত দেখে থাকি, সময় সুযোগ মতো কোনো কথা বললে তা সোনার পুতুলের মতো মনে হয়। সময় মতো কোনো কিছু উপস্থাপন করতে পারলে তার সুফল বেশি পাওয়া যায়। এ কারণেই তো অফিসের ক্লার্ক বা কেরানিরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, যখন দেখে বা বুঝতে পারে এখন স্যারের মুড খুব ভালো, তখন আস্তে করে ফাইলটি সামনে হাজির করে এবং খুব সহজেই তাতে সই করিয়ে নেয়। এমনকি বুদ্ধিমতি স্ত্রীরাও তাদের স্বামীর মুডের দিকে চেয়ে থাকে, যখন বুঝতে পারে, তার মুড খুব ভালো অবস্থায় আছে, তখনই হৃদয়ে লালন করে রাখা দাবি বা আকাঙ্খার কথাটি বলে ফেলে। সময় মতো উপস্থাপিত বিষয় মানুষ সবসময় ইতিবাচক হিসেবে দেখে। ঠিক তেমনি অনুকূল পরিবেশে যথাসময়ে আল্লাহপাকরে কাছে কিছু চাইলে তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না আর তাওয়াফকালে আল্লাহপাকের কাছে চাওয়ার মোক্ষম সময়। এ সময়ের চাওয়া তিনি কবুল করে নেন।

কোরআনিক দলিল

পবিত্রকোরআন থেকে এর একটি দলিল শুনুন, হজরত মরিয়ম [আলায়হাসসালাম] অমৌসুমী ফল খাচ্ছিলেন। হজরত জাকারিয়া [আলায়হিসসালাম] শতোবছর ধরে দোয়া করে আসছিলেন একটি সন্তানের জন্যে; কিন্তু আল্লাহপাক তাঁকে সন্তান দিচ্ছিলেন না। হজরত মরিয়ম [আলায়হিসসালাম]-কে অমৌসুমী ফল খেতে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন–

يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا

“হে মরিয়ম! তুমি এই অমৌসুমে এই ফল কোথায় পেলে?”

জবাবে তিনি বলেন–

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

“এটা আল্লাহর তরফ থেকে পেয়েছি।”

তিনি বলেন, তাই না-কি? তাহলে তো এটি একটি মোক্ষম সময়। তোমাকে যখন তিনি অমৌসুমে এই ফল দান করেছেন, তখন আমাকেও এই বুড়ো বয়সে অবশ্যই সন্তান দেবেন!

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ

সাথে সাথে তিনি (জাকারিয়া) সুযোগ বুঝে আল্লাহর কাছে আবেদন করে বসেন (ভাবার্থ)–

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

"হে আল্লাহ! আমাকেও একটি পবিত্র সন্তান দান করো।"

আল্লাহপাক তাঁর দোয়া কবুল করে নেন। তারপর বলেন, তিনি যখন মেহরাবের ভেতর নামাজ পড়ছিলেন, তখন ফেরেশতা তাঁকে ডেকে বলেন–

فَنَادَتْهُ الْمَلَآئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰ

"নিশ্চয়ই আল্লাহপাক আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়ার ব্যাপারে।"

এ থেকে বোঝা গেলো, সময় মতো দোয়া করলে তা অবশ্যই কবুল করা হয়। এজন্যে যেসব সুন্নত দোয়া রয়েছে, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর কাছে যেসব দোয়া করেছেন, সেগুলোর সৌন্দর্য হচ্ছে, আল্লাহর প্রিয়নবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] সময় মতো উপযুক্ত মুহূর্তে তাঁর কাছে আবেদন করেছেন। যেমন আয়নায় মুখ দেখে বলেছেন, হে খোদা! তুমি যেমন আমার দেহ অবয়ব সুন্দর করে সৃষ্টি করেছো, তেমনি আমার চরিত্রও সুন্দর করে দিন। তাই বলা হয়, উপযুক্ত সময়ের দোয়া দ্রুতো কবুল হয়ে যায়। তাই সুন্নত দোয়াগুলো খুব গুরুত্বের সাথে নিয়মিত পড়া দরকার।

কী চাইবো

সর্বপ্রথম আমরা আমাদের জন্যে হেদায়াত চাইবো। নিজের জন্যে, বাবা-মায়ের জন্যে, সন্তানাদির জন্যে, ভাই-বোন, স্ত্রী, পরিবার, আত্মীয়-স্বজনের জন্যে। গোটা উম্মতের জন্যে। হে আল্লাহ! আমার রুটি রিজিকে, জীবনে, ধনসম্পদে, হে আল্লাহ! আমার সুস্থতায়, আমার ফয়সালায়, মোটকথা, প্রতিটি ক্ষেত্রে বরকত দান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে রিপুর চক্রান্ত আর অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা দান করো। শয়তানের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ থেকে মুক্তি দাও। হিংসুকদের হিংসা থেকে, দুশমনের দুশমনি থেকে নিরপত্তা দান করো, বন্ধুর বেশ ধরে শত্রুতাকারীর হাত থেকে রক্ষা করো। হে খোদা, দুনিয়ার সবধরনের ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করো। হে আমার মাওলা, আমাদেরকে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও। হে আল্লাহ! আমরা তো এসেছিই তোমার জন্যে এই আমল করার উদ্দেশ্যে, এতে কোনো কম-বেশি, ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেলে তা ক্ষমা করে দিয়ে এই ওমরাকে কবুল করে নাও এবং এটিকে একমাত্র তোমার ভালোবাসার মাধ্যম বানিয়ে নাও।

এমন যেনো না হয়, আমাদের এই সফর বিফলে যাবে। হে খোদা! আমরা বহুদূর থেকে অনেক দেরিতে এসেছি। হে আল্লাহ! শুধু তোমাকে পাওয়ার জন্যে,

তোমাকে রাজি-খুশি করার জন্যে এসেছি। তাই আমাদের উদ্দেশ্য পুরো করে দাও।
এভাবে দোয়া করতে থাকবেন। এই তাওয়াফের মাঝে আপনি যতোই চাইবেন, আল্লাহপাকের তরফ থেকে ততোই রহমত ঝরতে থাকবে। বিশেষ রহমত ও বরকত নামতে থাকবে।
আরেকটি মাসয়ালা হচ্ছে, মুহরিম (এহরামকারী) লোক এহরাম খোলার আগ পর্যন্ত যেনো বায়তুল্লাহশরিফের সাথে লেপ্টে (জড়িয়ে) না যায়। এহরাম বাঁধা লোকের সেখানে যাওয়া উচিত নয়।
মানুষে খোশবু লাগিয়ে দাঁড়ায় এবং বায়তুল্লাহর দেয়ালেও খোশবু লাগানো থাকে। এজন্যে এহরাম অবস্থায় কেউ যদি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খোশবু লেগে যায়, তাহলে এহরাম থেকে বের হওয়ার পর সেই খোশবু গ্রহণের কারণে ক্ষতিপূরণ (দম) দিতে হবে।

সব কাজ শিখে শিখে করবে

আমাদের প্রবীণ বুড়োদেরও ঘড়ির দাম জানা থাকে; কিন্তু দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো সম্পর্কে জানে না। এমন মূর্খতা আর অজ্ঞতার যুগ চলে এসেছে, একবড়োমিয়াকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কি ওমরা পালন করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি সেই কালো কুঁঠিটির (কাবার) চারপাশে চক্কর দিয়ে এসেছি। এতোটুকুতেই তিনি মনে করেছিলেন ওমরার সবকিছু সম্পন্ন হয়ে গেছে; কিন্তু তিনি সায়িও করেন নি, অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজও সারেন নি। অথচো চুলও কাটিয়ে নিয়েছেন। এহরাম খুলে সেলাই করা কাপড়ও পরে ফেলেছেন। এতোটাই অজ্ঞতার যুগ এখন। তাই এমন গুরুত্বপূর্ণ সফর করার আগেই নিজেরাও বিজ্ঞ আলেমদের কাছ থেকে সব জেনে নেবেন এবং সফরের মাঝেও এমন আলেমদের সাথে থাকবেন, যারা প্রয়োজন মুহূর্তে সবকিছুর সমাধান করে দিতে পারেন, বুঝাতে পারেন।
দেখুন, আমরা কাজ তো করেই যাচ্ছি; কিন্তু তা অসম্পূর্ণ আর ভুলে ভরার কারণে আমাদের এতো টাকা, সময় ও দুঃখ-কষ্ট সবকিছু বিফলে যাবে। তাই একথাগুলো সবসময় মাথায় রাখবো, মাসয়ালা-মাসায়েলকে সামনে রাখবো, নিজেরাও পড়বো এবং আলেম-ওলামাকেও জিজ্ঞেস করতে থাকবো। তাহলে সবকিছু সুন্দর ও স্বার্থক হবে।
এতোক্ষণ গেলো তাওয়াফের প্রসঙ্গ। এখন ওমরার ক্ষেত্রে কী কী করতে হবে?
প্রথমে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে নেবো, মাকামে ইবরাহিমে গিয়ে দোয়া করবো, মাকামে ইবরাহিম বলতে যেখানে হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর পদচিহ্নসম্বলিত পাথর রয়েছে। হুবহু সেখানে দাঁড়ানো জরুরি নয়। অনেকে বাস্তবতা বুঝতে না পেরে আবেগতাড়িত হয়ে সেখানেই নামাজে দাঁড়িয়ে যায়।

যার কারণে অন্যদের কষ্ট হয়, তাওয়াফ করতে ব্যঘাত ঘটে, রাস্তায় বাধাগ্রস্ত হয়। নিজেও কষ্ট করে, অন্যদেরও কষ্ট দেয়। ফলে লাভ করতে গিয়ে লোকসান গুনতে হয়। তাই সেখানে না দাঁড়িয়ে ওই পাথর বরাবর সোজা পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে দু'রাকাত নামাজ আদায় করুন। এরপর জমজম পান করতে হয়। আগের যুগে সেটি ছিলো খোলা একটি কুপ। নিজ হাতে বালতি দিয়ে সেখান থেকে পানি তুলে পান করতে হতো। তাছাড়া তখন মাকামে ইবরাহিমের পাথরটিও আজকের মতো এভাবে সুরক্ষিত ছিলো না, সাধারণভাবেই তার জায়গায় রেখে দেয়া ছিলো। একবার প্রবল বৃষ্টির তোড়ে পাথরটি সেখান থেকে সরে গিয়েছিলো আজয়াদ মহল্লায়, তখন খলিফা ছিলেন হজরত ওমর ফারুক [রদিয়াল্লাহু আনহু]। তিনি পাথরটি খুঁজে এনে আবার আগের জায়গায় রেখে দেন।

হজরত আহমাদ আলি লাহোরি সাহেব হজের সময় আবেগ তাড়িত হয়ে সেই পাথরটি তুলে জমজমের পাশে নিয়ে যান। এরপর জমজম থেকে পানি তুলে পাথরে ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর পদচিহ্ন খোঁদাইকৃত জায়গায় রেখে তাতে মুখ লাগিয়ে সে পানি পান করেন। যেহেতু কল্যাণের সাথে অকল্যাণও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তাই পরবর্তীতে কাঁচের ঘেরাও এর মাঝে সেই পাথরটিকে নিজ জায়গায় সংরক্ষিত করে দেন। যার কারণে এখন আর তাতে হাত লাগানো যায় না, তবে দর্শনার্থীরা ঠিকই দেখতে পায়।

জমজম পানের সময় কী দোয়া করবো?

জমজম দেখাও একটি এবাদত, পবিত্র হাদিসে এসেছে, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, বায়তুল্লাহশরিফ দেখাও এবাদত, বাবা-মায়ের চেহারার দিকে তাকানো এবাদত, কোনো হক্কানি আলেমের দিকে তাকানো এবাদত, পবিত্রকোরআন দেখা এবাদত, তেমনি জমজম দেখাও একটি এবাদত। অর্থাৎ, জমজম কুপের ভেতরে তাকানো; কিন্তু এখন যেহেতু সেটিকে নিরাপত্তা ও প্রয়োজনের তাগিদে বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে, তাই আর তার ভেতরে তাকিয়ে দেখা সম্ভব নয়। তাই শুধু তা দেখার নিয়ত করলেই সে সোয়াব পাওয়া যাবে। নিয়ত এভাবে করবে, হে খোদা! এটি যদি দেখার ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে এবাদতের উদ্দেশ্যে আমি তা অবশ্যই দেখতাম, তাই আমাকে সেটা দেখার সোয়াব দান করো আর তা পান করার আদব হচ্ছে, যেখানেই এই জমজম পান করার সুযোগ হবে, সেখানে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তা পান করবে এবং মনে মনে যা ইচ্ছে তা-ই কামনা করে দোয়া করবে। আশা করা যায়, আল্লাহপাক তার সেই দোয়া কবুল করে নেবেন।

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, যে যে উদ্দেশ্যে জমজম পান করবে, তার সেই উদ্দেশ্য পুরো হবে। এর দুটি দিক রয়েছে: এক. কেউ যদি তৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে জমজম পান করে, তাহলে তার তৃষ্ণা দূর হবে।

আবার কেউ যদি তার খিদে নিবারণের লক্ষে তা পান করে, তার খিদেও মিটে যাবে আর দুই. যে নিয়তে যে দোয়া করে সে তা পান করবে, আল্লাহপাক তার সেই দোয়া কবুল করে তার নিয়ত পুরো করে দেবেন। এ ব্যাপারে ওলামায়েকেরাম বিস্তারিত লিখেছেন এবং কোন কোন দোয়া করা দরকার, তারও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, যেহেতু এটি পানযোগ্য বস্তু, তাই তা পানের সময় নিয়ত করবে, আল্লাহপাক যেনো এই উসিলায় তার মৃত্যুকালীন পিপাসা নিবারণ করে দেন।

কেউ বলেছেন, কেয়ামতের দিনের বিভীষিকাময় অবস্থার কথা মনে করে তা থেকে মুক্তির জন্যে দোয়া করবে।

বেশি সূক্ষ্মদর্শী কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, এই পানীয় পদার্থের সাথে এলমেদীন বা ধর্মীয় জ্ঞানের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। জ্ঞান শেখা অনেকটা পানীয় পান করার মতোই (যার কারণে বলা হয় 'জ্ঞানের সুধা পান করে ধন্য হয়েছে'), তাই জমজম পানের সময় (বিশেষ করে তালেবেএলেমরা) দোয়া করবে, হে খোদা! এই উসিলায় আমাকে এলমের সাগর দান করো। এর এক একঢোকের বদলায় আমার বুকে এলেমের সাগর বইয়ে দাও। প্রতিটি বিন্দুর বিনিময়ে আমার জ্ঞানের এক একটি দরোজা খুলে দাও। আমার মারেফাতের দ্বার খুলে দাও..।

মোটকথা, জমজম পানের সময় মন খুলে দোয়া করতে হবে। অনেকে দুনিয়ার রঙিন পানীয় পান করে, ফলে তার নেশা জমে যায়। তেমনি আমরাও জমজম পানের সময় আল্লাহর কাছে আবেদন করবো, হে খোদা! এর মাধ্যমে তুমি আমার অন্তরে তোমার প্রেমের নেশা সৃষ্টি করে দাও। তোমাকে পাওয়ার বাসনা তৈরি করে দাও। এভাবে জমজম পানকালে আল্লাহর প্রেমের শরাবের কামনা অবশ্যই করবো। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] জমজম পান করার পর তার কিছু অংশ চোখে মুখে মাথায় এমন কি বুকেও মুছে দিতেন, বরকত লাভের আশায়। আসলেও এটি আল্লাহরপাকের একটি বিশেষ বড়ো অনুগ্রহ, যা তিনি এই উম্মতকে দান করেছেন। তাই খুব আগ্রহ ভরে জমজম পান করা দরকার।

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] আরও বলেছেন, মোমিনরা জমজম পান করে তৃপ্তি ভরে বেশি করে পেট পুরে আর মুনাফিকরা তা পান করে অল্প অল্প করে দায়সারাভাবে। বেশি পান করার অর্থ এই নয়, যার যতোটুকু প্রয়োজন বা যে যতোটুকু পান করতে পারবে, তার চেয়ে অনেক বেশি পান করবে। যেমন কেউ স্বাভাবিকভাবে দু'গ্লাস পান করতে পারে সে, জোর করে চার গ্লাস পান করবে, এমন হলে তো দেখা যাবে একটু পরই তার বমি শুরু হয়ে গেছে বা পেট খারাপ করছে; বরং বেশি বেশি পান করার অর্থ হচ্ছে, আগ্রহভরে অন্যসময় অন্যান্য পানি যে পরিমাণ পান করে, তার চেয়ে কম পান করবে না। স্বাভাবিক ভাবে পান করার প্রতি অনাগ্রহ দেখাবে না।

আরেকটি অর্থ হচ্ছে, অন্যসময়ও তা যেনো পান করতে পারে, তারও ব্যবস্থা করবে, শুধু জমজমের পাশে বসে পান করেই ক্ষান্ত দেবে না; বরং বাড়ি যাওয়ার সময় ক্যান বা অন্যকোনো পাত্রে ভরে নিয়ে যাবে, ফ্রিজে রেখে অন্যপানি পানের আগে পরে একটু করে তা পান করবে। এটি আল্লাহপাকরে এক অফুরন্ত দয়া। এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া গেলেও বাড়িতে যেহেতু তার পরিমাণ সীমিত, তাই এখানে থাকা অবস্থায় যতো বেশি পারা যায় তা পান করার চেষ্টা করা দরকার এবং তা অবশ্যই খুবই ভালোবাসা আর আগ্রহের সাথে পান করে বুঝিয়ে দেয়া দরকার, আমরা মোমিন, মুনাফিক নই।

সায়ি

জমজম পান ও দোয়া করা শেষে পরবর্তী কাজ হচ্ছে সায়ি করা। সায়ি করার আগে ৯ম এস্তেলাম বা হাজরে আসওয়াদ লক্ষ করে উড়ন্ত চুমু দেয়া জরুরি। অর্থাৎ, তাওয়াফের সময় সাতটি আর জমজম পানের সময় একটি মিলে আগের আটটির সাথে প্রাক সায়ির এই একটি হবে ৯ম এস্তেলাম। এর নিয়ম হলো, জমজম পান শেষে ২য়বার Green Signal (গ্রিন সিগনাল)-এর (সবুজ বাতি যেখানে জ্বলে) কাছে এসে হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে নয় নম্বর এস্তলাম করতে হয়। এটি করা মোস্তাহাব। এরপর সাফা পাহাড়ের দিকে যেতে হবে, যেখান (প্রান্ত) থেকে সায়ি শুরু হয় এবং শেষ হয় মারোয়ায় গিয়ে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, একসায়ি আর একচক্কর একজিনিস নয়।

চক্কর বলে ঘুরে আসা বা যাওয়া-আসাকে। আর একসায়ি হলো, শুধু একবার যাওয়া অথবা শুধু একবার আসা, অর্থাৎ, সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গেলে একসায়ি হয়ে যাবে। এজন্যে সাফা থেকে মারোয়া গিয়ে আবার সাফায় ঘুরে আসার দরকার নেই।

অনেকে যাওয়া আসা মিলে একসায়ি মনে করে থাকে। ফলে তারা সাত চক্করের মাধ্যমে (সাতবার যাওয়া, সাতবার আসা মোট ১৪বার) সায়ি পুরো করে, এমন করার প্রয়োজন নেই এবং এটা বাহুল্যও বটে। আল্লাহপাক উম্মতের জন্যে ব্যাপারটা সহজ করে দিয়েছেন। বিষয়টা জানা থাকা খুবই জরুরি।

আমাদের একমুফতি সাহেব বলেছেন, সায়ি করার সময় আমি একজন সহজ সরল বুড়ো লোককে দেখতে পাই, তার ক্লান্ত শ্রান্ত বেহাল অবস্থা। জিজ্ঞেস করি, বাবাজি আপনার এমন করুণ অবস্থা কেনো? বহু কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বলেন, ভাতিজা! সেই যে ফজর নামাজের পর থেকে লোকদের সাথে একত্রে সায়ি করা শুরু করেছি, তা চলছেই তো চলছে। জোহর গেলো, আসর গেলো, এখন মাগরিব যাওয়ার দশা; কিন্তু কারোই তা শেষ করার নাম গন্ধ নেই। কখন যে শেষ হবে বাপু? তা আল্লাহ মালুম; কিন্তু আমার শরীর যে আর কুলোয় না!

আসলে সেই সহজ সরল বুড়ো লোকটি মনে করেছিলেন সায়িটাও বুঝি জামাতের সাথে একত্রে নামাজ পড়ার মতো কাজ। সবাই মিলে একসাথে সালাম

দিয়ে তা শেষ করবে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাকে বুঝিয়ে বলি, বাবাজি! এই সায়ি নামাজের জামাতের মতো একসাথে শেষ হবে না। সবসময় তা এভাবে চলতেই থাকবে, কেউ আসবে, কেউ যাবে। প্রতিজনকে শুধু সাফা পাহাড় থেকে মারোয়া পর্যন্ত সাতবার যাওয়া-আসা করলেই হয়ে যায়। তাই আপনার কাজও শেষ হয়ে গেছে। আপনি এখন চলে যেতে পারেন।

তাই সবাই এটি ভালোভাবে জানা থাকতে হবে, সাফা-মারোয়ার মাঝে সাতবার যাওয়া-আসা করলেই সায়ি আদায় হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, সাফা ও মারোয়া পাহাড়ের কতোদূর পর্যন্ত যাওয়া জরুরি? পাহাড়ের ওপরে চড়তে হবে? না-কি শুধু তার পাশ থেকে চলে এলেই চলবে? তার জবাব হলো, পাহাড়ের এতোটুকু উঁচুতে চড়তে হবে, যেখান থেকে তাকালে কাবাশরিফ দেখা যায়। দেখবেন পাহাড়ের ওই জায়গায় খুঁটি তৈরি করে দেয়া আছে, সেখানে গিয়ে আরেকটি খুঁটি ও সিঁড়ির মাঝখান দিয়ে তাকালে কাবাশরিফ দেখা যায়। তো সেই পর্যন্ত যাওয়া জরুরি। তবে এটি শুধু সাফা পাহাড়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, মারোয়া পাহাড় থেকে কোনোভাবেই কাবাশরিফ দেখা যায় না। তাই সেখানে একটু বেশি ওপর দিকে ওঠা দরকার। যেনো তাতে কোনো কমতি না থাকে। কেউ যদি কোমড়, হাঁটু ব্যথা বা অন্যকোনো অসুস্থতার কারণে চলতে অক্ষম হয়, তাহলে সে বাহন বা অন্যকোনো মাধ্যমে সায়ি সম্পন্ন করবে। অসুস্থ অপারগের জন্যে এতোটুকু অনুমতি আছে, তবে যতোদূর সম্ভব পায়ে হেঁটেই তাওয়াফ করার চেষ্টা করবে। তবে যদি এতোটাই অক্ষম হয় যে, দু'চার পাও নিজে চলতে পারে না, তাহলে তার জন্যেও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েজ আছে। যার অর্থ তাওয়াফের চেয়ে সায়ি করার ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতার রয়েছে। তবে হ্যাঁ, কোনো স্থানীয় লোক বা হাতে প্রচুর সময় আছে এমন কারও জন্যে (ওমরার) একদিনে যদি সায়ি সম্পন্ন করতে না পারে, তাহলে একাধিক দিনে অল্প অল্প করে তা সম্পন্ন করতে পারবে। প্রয়োজনে সায়ির ক্ষেত্রে মাঝ বিরতির অনুমতি আছে। তবে তাওয়াফের ক্ষেত্রে বিরতির (প্রয়োজন হলে) আগে কমপক্ষে চার চক্কর শেষ করতে হবে। চার চক্কর শেষ করার আগেই কেউ যদি বিরতি দিয়ে বসে, তাহলে তাকে আবার নতুন করে সাত চক্কর দিয়ে তাওয়াফ শেষ করতে হবে। আর যদি অর্ধেকের (চার বা তার) বেশি চক্কর দেয়া সম্পন্ন হওয়ার পর বিরতি দেয়, তাহলে পরে বাকি চক্করগুলো দিয়ে সাত চক্কর পুরো করলেই তার তাওয়াফ শেষ হয়ে যাবে।

সায়ি করার সময় কী চাইবে?

রয়ে গেছে আরেকটি বিষয়, আমরা সায়ি করার সময় কী কী দোয়া করবো? এব্যাপারে কিতাবে অনেক রকম দোয়ার কথা লেখা আছে, সেসব দোয়ার মূলবিষয়বস্তুগুলো আত্মস্থ করে নেবো, সুন্নত দোয়াগুলো মূলশব্দসহ হুবহু মুখস্থ করে নিতে পারলে ভালো হয়। তবে আরবিতে যারা সেসব দোয়া করতে পারবে না, তারা শুধু সেগুলোর অর্থ শুনে তার মূল বক্তব্য নিজ নিজ ভাষায় উপস্থাপন

করবে। এখানে আল্লাহপাকের কাছে শব্দ বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং তার অর্থ আর হৃদয়ে আকুতিই মুখ্যবিষয়। যার হৃদয়ে যতো ব্যাকুলতা, অস্থিরতা ও বিনয় থাকবে, তার দোয়া আল্লাহপাক বেশি কবুল করবেন। নিঃশব্দ দোয়াও মহান আল্লাহপাকের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে যায়।

میرا مالک میری سن رہا ہے صدا
[মেরা মালিক মেরী সুন রাহা হায় সদা]

جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زباں
[জান্তা হায় ওহ খামূশিয়োঁ কী যবাঁ]

দয়ার মালিক শুনছো জানি
আমার মোনাজাত
জানি শুধু তুমিই জানো
নীরব মোনাজাত।

তাই বলা হয়, নিরবতাও একধরনের ভাষা। নিরব থেকেও বহুকিছু বুঝানো যায়। আর দোয়ার ক্ষেত্রে মূল লক্ষণীয় বিষয় হৃদয়ের অবস্থা, হৃদয়ের কথাই মুখ দিয়ে বের হয়।

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
[দিলসে জু বাত নিকালতী হায় আছর রাখতী হায়]

پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے
[পর নেহী তাকাত পরওয়ায মাগার রাখতী হায়]

মনের থেকে হয় যে কথা
প্রভাব আছে তার
একপলকেই ভুলবে জখম
মুক্তি মিলে যার।

তাই আমরা সেখানে দোয়া পড়ার চেয়ে দোয়া করার দিকে বেশি সচেষ্ট থাকবো। অর্থ না বুঝে শুধু মুখস্থ কিছু বুলি আওড়িয়ে যাবো না, অন্তরে যা আসবে, বিনয় আর আস্থার সাথে তা-ই আল্লাহর কাছে উপস্থাপন করে করবো। আকুতি মিনতি জানাবো।

অনেকে গদবাঁধা কিছু শব্দ বলে যায়, অথচো সে নিজেও জানে না সে কী চাচ্ছে আল্লাহর কাছে?

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ

"আর বিপন্নকে কে সাড়া দেই, যখন সে আল্লাহকে ডাকে!"

তাই অতীব অস্থির ও বিচলিত মনে বড়ো বাসনা নিয়ে এমন কন্ডিশনে যে দোয়া করা হবে, তা আল্লাহপাক অবশ্যই কবুল করবেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন একজন শক্ত মনের কঠিন প্রকৃতির মানুষ। প্রভাবশালী শাসক, তার মনে যা আসতো, তা বাস্তবায়ন করেই ছাড়তেন। একবার তিনি কাবাশরিফ তাওয়াফ করছিলেন, এমন সময় দেখতে পান মাতাফে বসে এক অন্ধ লোক দোয়া করছে, "হে আল্লাহ, আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও। চোখ ভালো করে দাও।" হাজ্জাজ বিন ইউফুফ তার কাছে গিয়ে তাকে (লাথির মতো করে) পা দিয়ে টোকা দিয়ে বলেন, এই অন্ধ? তুমি কি জানো আমি কে?

লাথি খেয়ে ভীত-বিহবল হয়ে সে বলে, না বাবা, আমি তো অন্ধ, আমি কীভাবে বলবো আপনি কে? চোখে না দেখলেও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নাম শোনোনি? আমি সেই হাজ্জাজ। এঁ্যা, এঁ্যা, এঁ্যা, শুনেছি, তো আমার কী গোস্তাখি জাঁহাপনা? তোমার গোস্তাখি? তুমি আল্লাহর কাছে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে চাচ্ছো, আমার আর মাত্র তিন চক্কর বাকি আছে, এর আগেই তুমি যদি তোমার প্রভুর কাছ থেকে দৃষ্টিশক্তি ফিরে নিতে না পারো, তাহলে বাকি চক্কর শেষ করে এসে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবো। আর এর মধ্যে তুমি যেনো কোথাও পালিয়ে যেতে না পারো সে জন্যে তোমার পাহারায় এই একজন সেনা রেখে গেলাম।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বাকি তাওয়াফে মনোনিবেশ করেন। এদিকে অন্ধের অবস্থা ভীষণ কাহিল। এতোক্ষণ প্রশ্ন ছিলো শুধু দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার, এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে গোটা জীবন রক্ষার (সেভাবে অন্ধ ছিলাম, ভালো ছিলাম, কষ্ট হলেও বেঁচেছিলাম; কিন্তু কেনো যে দৃষ্টিশক্তি চাইতে গেলাম? এখন সেজন্যে জীবনটাই হারাতে হবে দেখছি!)। তারপর সে প্রবল আকুতি মিনতি করে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দিয়ে আল্লাহপাকের দরবারে কান্নাকাটি শুরু করে। আল্লাহপাক তার আকুতি দেখে দয়া করেন। তার দোয়া কুবল করে নেন। তাওয়াফ শেষ করে এসে তাকে ভালো দৃষ্টিসম্পন্ন দেখে বলেন, আমি বুজুর্গদের কাছ থেকে শুনেছি, তুমি আগে যেভাবে দোয়া করছিলে, এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত দোয়া করতে থাকলেও তোমার দোয়া কবুল হতো না, তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে না। কারণ, এতোক্ষণ শুধু তোমার মুখ থেকে শব্দগুলো বের হচ্ছিলো, সেখানে আন্তরিকতা ছিলো না, এখন মৃত্যুর ভয় ভেতরে ঢুকে যাওয়ার কারণে তুমি যেসব দোয়া করেছো তা একদম অন্তর থেকে বের হয়েছে। ব্যাকুলচিত্তে নিষ্ঠার সাথে মন থেকে দোয়া করেছো, যার কারণে মহান আল্লাহপাক দ্রুতো তোমার দোয়া কবুল করে নিয়েছেন।

তাই প্রিয়সুধী! আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহপাক আমাদেরকে তাঁর প্রিয়জায়গায় নিয়ে এসেছেন, তাই তাঁর ঘরকে সামনে নিয়ে আন্তরিকতার সাথে খুবই বিনয়ী হয়ে তাঁর কাছে মনের আকুতি জানাবো।

সময় মতো দোয়া

আমি আগেও বলেছি, সুযোগ বুঝে উপযুক্ত সময় মতো যদি দোয়া করি, তাহলে তা খুব দ্রুতো কবুল হবে। তাই সায়ি করার সময় যদি সাইয়েদুনা ইবরাহিম

[আলায়হিসসালাম]-এর পরিবারকে সামনে রেখে তাঁদের উসিলা দিয়ে দোয়া করি, ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] যে দোয়া করেছিলেন, হজরত হাজেরা [আলায়হাসসালাম] যে মোনাজাত করেছিলেন, এই যে সাফা ও মারোয়াকে আল্লাহপাকের নিদর্শন হিসেবে পবিত্রকোরআনে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তার সাথে সম্পৃক্ত করে দোয়া করি–"হে আল্লাহ! হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-কে যে খাঁটি তৌহিদ (একত্ববাদ) দান করেছিলেন, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য শিরক থেকে রক্ষা করেছিলেন, আমাদেরকেও তেমনি তৌহিদ দান করো।"

তাকে আন্তরিক বন্ধু হওয়ার যে গুণ দান করেছিলেন, তার তাজাল্লি থেকে আমাদেরকেও কিছু অংশ দান করো। কোনো বর্ণনায় পঁচিশ হাজার, আবার কোনো বর্ণনায় দশ হাজার নবি তাঁর বংশে জন্ম নিয়েছেন, যার কারণে তাঁকে আবুল আম্বিয়া (নবিদের জনক) বলা হয়, তেমনি আমাদেরকেও আবুল আওলিয়া বা ওলিদের জনক বানিয়ে দাও। এরপর তাঁর বংশেই সর্বশেষ নবি হজরত মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে পাঠিয়েছেন, তেমনি আমাদের উত্তরসূরিদের মাঝেও কোনো মোজাদ্দিদ তৈরি করে দিন।

দোয়া করার ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো বাধা নিষেধ নেই, তাই প্রাণ খুলে যেকোনো জায়েজ দোয়া করতে পারেন, উপযুক্ত দোয়া করতে থাকবেন, হে আল্লাহ! বায়তুল্লাহশরিফ নির্মাণের সময় হজরত ইসমাইল [আলায়হিসসালাম] তাঁর বাবাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ

"আর ইবরাহিম যখন কাবাঘরের ভিত্তি রাখলো এবং ইসমাইলও...।"

তেমনি আমাদের সন্তানদেরও দীনিকাজে আমাদের সহযোগী বানিয়ে দিন।

দোয়া করতে শুরু করলে আপনা আপনি বহু দোয়া মন থেকে বের হয়ে যাবে। হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি আমার স্ত্রী-সন্তানকে আপনার ঘরের পাশে এনে রেখে গেলাম, হে খোদা! মানুষের অন্তর এই ঘরের দিকে আকৃষ্ট করেন দিন। অর্থাৎ, মানুষের অন্তরে এর ভালোবাসা ভরে দিন।

নিজের সন্তান ও পরিবার-পরিজনের জন্যেও এমন দোয়া করবেন, হে আল্লাহ আমার সন্তানাদিকেও দুনিয়াতে ইজ্জত দান করুন, হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর মতো আমরা বলবো–

وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সন্তানদেরকে সেরা পবিত্র ও অফুরন্ত রিজিক দান করুন! নানান ফলমুল দান করুন!"

لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (তারা যেনো নামাজ কায়েম করতে পারে), এবাদত-বন্দেগি করতে পারে। ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর সাথে সুর মিলিয়ে বলবেন–

لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ

"আর তারা যেনো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারে", তাদেরকে কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন।

দেখুন, দোয়া করার একটি বিষয়বস্তু এখানে পেয়ে গেলেন, এভাবে চলতে থাকলে একের পর একদোয়া বের হয়ে আসবে হৃদয় থেকে, আর যেহেতু উপযুক্ত সময় সুযোগ মিলে গেছে, তাই তা কবুল হওয়ার আশা রাখাই যায়।

সন্তানহীন মহিলারা এভাবে দোয়া করবে–"হে আল্লাহ! হজরত হাজেরাকে যেমন হজরত ইসমাইলের মতো সন্তান দিয়েছিলেন আর তাঁর মায়ের ব্যাকুলতা আপনার খুব পছন্দ হয়েছিলো বলে তাদের জন্যে পানির ফোয়ারা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, আমাকেও তেমনি ছেলেসন্তান দান করুন।"

তবে দোয়া করার সময় তা অবশ্যই অন্তরের অন্তস্থল থেকে বের হতে হবে। শুধু বাইরের মুখ থেকে উচ্চারিত হলে চলবে না।

ব্যস, আপনি সায়ি করতে থাকবেন, হৃদয়ের কিতাব পড়তে থাকবেন আর আকুতি মিনতি করে দোয়া করতে থাকবেন, তাহলে দেখতে পাবেন আপনা আপনিই আপনার মাঝে একধরনের বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

মনে রাখবেন, সন্তানহারা মাকে কাঁদানোর জন্যে শোকগাঁথা গাওয়ার প্রয়োজন পরে না। সে নিজ থেকেই কাঁদতে থাকে, তার হৃদয়ের ব্যথা-বেদনাই তাকে সবকিছু থেকে বিরত রাখে, খাওয়া-দাওয়া কিছুই করতে পারে না, অন্যদের চাপাচাপিতে একপর্যায়ে খাওয়ার চেষ্টা করে, তবুও সে খাবারের সময়ও কেঁদেই যায়। কথাবার্তার সাথেও কান্না চলতেই থাকে। কারণ, তার কলিজার টুকরো যে তার থেকে দূরে কোথায় কীভাবে আছে তা জানা নেই।

তেমনি ব্যথিত মনে আন্তরিকতার সাথে কেঁদে কেঁদে যদি বলেন, হে আল্লাহ! যেহেতু আপনার ঘরে আসার মতো এমন বিশাল অনুগ্রহ দান করেছেনই, জানি না ভবিষ্যতে কখনো এখানে আসার সুযোগ হবে কী-না। আমার মাথার ওপর পাপের পাহাড়, যা ক্ষমা করিয়ে নেয়ার জন্যে এখানে এসেছি। হৃদয়ের বেদনা জাগ্রত হলে অশ্রু প্রবাহিত করার জন্যে কোনো দোয়া পড়ার দরকার হয় না। বিরহের কবিতা আবৃতি করতে হয় না, এমনি এমনি অশ্রুর ভাষায় দোয়া বেরিয়ে আসে। অন্যরা মুখের ভাষায় দোয়া করলে আপনারা করবেন অশ্রুর ভাষায়। কারণ, হৃদয়ের অশ্রু তার নিরব বা শব্দহীন ভাষায় বার্তা পাঠায়।

جیوا لطف ہے روون اندر، وہ وچ بیان نہ آوے

[জিয়ো লুফত হায় রুউন আন্দর, ওহ্ ওচ বয়ান না আওয়ে]

কান্না মাঝে কী যে মজা
জানে প্রেমিকজন
মনের কথা দেয় যে বলে
করে আপনজন।

এই কান্নার মাঝে আছে এক আশ্চর্য মজা, ভিন্ন স্বাদ। এই কান্না হৃদয়ের ময়লা পরিষ্কার করে দেয় আর অসন্তুষ্ট প্রিয়তমকে সন্তুষ্ট বানিয়ে দেয়। তাই আপনি যখন অন্তর থেকে দোয়া করবেন, তখন দেখবেন, আল্লাহপাকের রহমত ঝরবে, তিনি সব পাপ মাফ করে দেবেন। সেই সাথে প্রত্যাশার চেয়ে আরও বেশি দান করবেন।
সাফা পাহাড়ে দোয়া কবুল হয়। মারোয়া পাহাড়ে কবুল হয়। দু'য়ের মাঝে সবুজ বাতি জ্বালানো জায়গায় যেখানে এসে পুরুষদেরকে দ্রুতো দৌড়াতে হয়, সেখানেও দোয়া কবুল হয়। এগুলো হচ্ছে দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ জায়গা। এভাবে এখানে সাত চক্কর দেয়ার পর মারোয়ায় গিয়েও দোয়া করবেন। এরপর হারামশরিফে এসে দু'রাকাত শুকরিয়ার নামাজ আদায় করবেন। কারণ, আল্লাহপাক ভালোবেসে সব আমল সম্পন্ন করার সুযোগ দিয়েছেন।

চুল কাটা

এরপর চুল কেটে ফেলতে হবে। এই চুলকাটার কাজ দু'ভাবে করা যায়: এক. পুরোপুরি ন্যাড়া হওয়া। যেটিকে পরিভাষায় 'হলক' বলা হয়। আরেকটি কাঁচি বা মেশিন দিয়ে চুল ছেঁটে ছোটো করা, যাকে 'কসর' বলা হয়। এই দুই পদ্ধতির কথাই পবিত্রকোরআনে এভাবে এসেছে–

مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ

"তোমরা তোমাদের মাথা হলক (ন্যাড়া) করবে আর চুল কেটে ছেঁটে খাটো করবে।"

তবে যেহেতু হলক করার কথা আগে বলা হয়েছে আর কসর করার কথা বলা হয়েছে পরে এবং বিদায় হজের দিন নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] নিজেও হলক (ন্যাড়া) করেছেন, তাই এটি সবচেয়ে বেশি ভালো এবাদত। সমস্যা না থাকলে পুরুষেরা হলক করবে। মহিলারা কসর করবে। অর্থাৎ, সব চুল একত্রিত করে তার একপাশ থেকে একইঞ্চির মতো চুল নিজেরাই কেটে নেবে। পুরো একগোছ পরিমাণ কাটবে না। এই চুল কাটার ক্ষেত্রেও কয়েকটি জিনিস পরিষ্কার হওয়ার দাবি রাখে। যেমন পুরুষেরা তো নাপিতের কাছে সেলুনে গিয়ে চুল কেটে আসতে পারে; কিন্তু মেয়েরা এ ক্ষেত্রে কী করবে?
এক্ষেত্রে মহিলার সাথে যদি কোনো বিয়ে বৈধো নয় এমন পুরুষ থাকে, তাহলে তিনি তার চুল কেটে দেবেন আর যদি বিয়ে বৈধো নয় এমন পুরুষ না থাকে আর অন্যসব মহিলা এমন, যারা ওমরা/হজের সব কাজ শেষ করে ফেলেছে, শুধু এই চুল কাটাই বাকি রয়ে গেছে, তাহলে তারা নিজেরা নিজেদের চুল নিজেই কাটতে পারবে। হ্যাঁ, নিজে কাটতে যদি সমস্যা থাকে, তাহলে অন্য এমন কোনো মহিলা দিয়ে তা কাটিয়ে নেবে, যিনি তার ওমরা/হজের সব কাজ শেষ করে ফেলেছেন, শুধু চুল কাটা বাকি থাকলে সে অন্যের চুল কেটে দিতে পারবে। পুরুষের বেলাও এই একই মাসয়ালা। অর্থাৎ, তারাও এই অবস্থায় একে অন্যের চুল কেটে দিতে পারবে।

গতোকালই খেয়াল করলাম, একলোক আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছে, দুই লোকই ওমরা সম্পন্ন করেছে, এমন অবস্থায় একজন অন্যজনের চুল কেটে দিয়েছে, তাহলে এর হুকুম কী? এমন সময় একজন আগ বাড়িয়ে বলে দিলো, এ অবস্থায় তাদের ওপর দম দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।
অথচো সঠিক মাসয়ালা হলো, যদি কেউ চুল কাটা ছাড়া হজ/ওমরার সব কাজ শেষ করে ফেলে, তাহলে সে অন্যের চুল কেটে দিতে পারবে। এ জন্যে তাকে দম দিতে হবে না।
এই চুল কাটা/ন্যাড়া করাটাও একটি এবাদত। অনেক সময় নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কাছে কেউ এসে ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তাকে বলতেন, মাথা ন্যাড়া করে ফেলো। এর দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে যেনো একথা বুঝানো হতো, এই চুলের সাথে সাথে তার সব পাপও ঝরে গেলো।
এখন আমাদের ওমরা পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। এরপর গোসল করে কাপড় বদলিয়ে নেবে। সেলাই করা কাপড় পরবে। এতোক্ষণ পর্যন্ত এহরামের কারণে যেসব বৈধো কাজ নিষিদ্ধ ছিলো, আল্লাহপাকের তরফ থেকে এখন জায়েজ হয়ে গেলো। স্বামী স্ত্রীও একত্রে মেলামেশা করতে পারবে। খোশবু লাগাতে পারবে। এককথায় এহরামের কারণে নিষিদ্ধ হওয়া সব কাজ বৈধো হয়ে যাবে।

শিহরণ জাগানিয়া কথা

মানুষের মাঝে শয়তানি, নফসানি, পশুত্ব ও কুপ্রবৃত্তি থাকার কারণে আল্লাহপাক সতর্কতামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আগেই তার দরোজা বন্ধ করে দিয়েছেন। এ জন্যে বিয়ে বৈধো নয় এমন পুরুষ ছাড়া নারী পুরুষের একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। দুই শ্রেণীর কর্মক্ষেত্র আলাদা আলাদা করে দিয়েছেন। এমন কি অন্যসব এবাদত-বন্দেগিতেও আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করেছেন; কিন্তু তাওয়াফের ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা রেখেছেন। এখানে অন্যজায়গার হুকুম প্রযোজ্য নয়। এখানে নারী-পুরুষ একসাথে তাওয়াফ করতে পারবেন, দিনে-রাতে সবসময়। নামাজের আগে-পরে, যখন ইচ্ছা, তবে নারীরা একটু সাইড ঘেষে তাওয়াফ করবে আর পুরুষরা চলবে মাঝখান দিয়ে, তাও আবার বাধ্যতামূলক নয়; এর কারণ কী? কোন রহস্যের ভিত্তিতে আল্লাহপাক এখানকার ব্যাপার স্বতন্ত্র রাখলেন? এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, এখন আবার একটু করছি। আপনারা জেনে থাকবেন, পৃথিবীর অন্যকোনো জায়গায় মানুষ পাপকাজের চিন্তা বা নিয়ত করলেই তার আমলনামায় তার পাপ লেখা হয় না, যতোক্ষণ না সে তা বাস্তবায়ন করে এবং এর আগে তাকে সে জন্যে সাজাও ভোগ করতে হয় না; কিন্তু হারামশরিফের ব্যাপারটা ভিন্ন, এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেছেন–

وَمَنْ يُّرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

"আর যে হারামশরিফে পাপকাজের ইচ্ছে করবে, আমি তাকে বেদনাদায়ক সাজা ভোগ করাবো।"

বোঝা গেলো, অন্যসব জায়গায় পাপের কারণে সাজা ভোগের সম্পর্ক অঙ্গ বা দেহের সাথে আর কাবাশরিফে শাস্তি যোগ্য পাপের সম্পর্ক মনের সাথে। তাই অন্যসবজায়গায় দৈহিকভাবে দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর কাবাশরিফে পাপ থেকে আত্মিক বা অন্তরের দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়েছে। সেজন্যে এখানে দৈহিকভাবে পাশাপাশি হতে নিষেধ করা হয়নি। এর মাধ্যমে আল্লাহপাক দেখতে চান তাঁর বান্দা-বান্দিরা তাঁর ঘরে এসে কতোটুকু মনের পবিত্রতা রক্ষা করে চলে। তারা আমার ভালোবাসায় ডুবে থাকে, না-কি অন্যদিকে তাদের নজর যায়। তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা আমার ঘরে এসে আমার ভালোবাসায় ডুবে একসাথে তাওয়াফ করতে থাকো।

আমরা বহু পরীক্ষা করে দেখেছি। মাতাফে গিয়ে তাওয়াফের সময় পুরুষরা ভুলে যায় তাদের পুরুষত্বের কথা আর নারীরা ভুলে যায় তাদের নারীত্বের কথা, সে সময় সবার ভেতর থেকে যৌনোচাহিদা বিদায় নিয়ে যায়, সবাই শুধু এক আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকে, একে অন্যের দিকে খেয়াল করার মতো পরিবেশ ও অবস্থা থাকে না, সবাই শুধু আল্লাহর দরবারে পাপ মার্জনাসহ নানারকম ফরিয়াদ করে চলে এবং সবকিছু হয় আল্লাহপাকের নির্দেশেই। কারণ, এর মাধ্যমে তিনি ফেরেশতাদের লক্ষ করে বলেন, দেখো, আমার বান্দা-বান্দিরা একত্রিত হওয়ার পরও নিজেদের সব চাহিদা ভুলে কীভাবে আমার প্রেমে মগ্ন হয়ে গেছে, অথচো এদের সৃষ্টি করার আগে তোমরা বলেছিলে, এরা না-কি দুনিয়ায় এসে ফেতনা-ফাসাদ করবে?! অথচো দেখো ফেতনা করা তো দূরে থাক, সুযোগ থাকার পরও একজন আরেকজনের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। পুরুষরাও পাগলের মতো কাঁদছে, নারীরাও কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে।

فرشتوں کو دکھا نا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں

[ফেরেশতোঁ কো দেখা না থা বাশার এ্যয়সে ভী হোতে হেঁ]

মানুষ কেমন হয় রে প্রেমে
জানুক ফেরেশতারা
প্রেমে পাগল পতঙ্গকেও
জানুক ফেরেশতারা।

ফেরেশতাদের দেখানোর উদ্দেশ্য ছিলো, মানুষ এমনও হয়, এরা সবকিছু থেকে ভালোবাসা ছিন্ন করে পতঙ্গের মতো আমার ঘরের চারপাশে সমবেত হয়ে ঘুরে চলেছে। এরা আমার প্রেমের পতঙ্গ, এরা বাড়ি থেকে বের হয়ে আমার জন্যে স্লোগান দিতে দিতে এখানে এসেছে। পাগল হয়ে এসেছে, উন্মাদ হয়ে এসেছে। দেখো, এরা কীভাবে আমার ঘর তাওয়াফ করে চলেছে? আমার ভালোবাসা ছাড়া তারা আর কিছুই চায় না। এজন্যে তিনি বলেছেন–

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"আর তোমরা হজ ও ওমরা পালন করো একমাত্র আল্লাহর জন্যেই।" আর আল্লাহর জন্যে করা হজ-ওমরা বান্দার ক্ষমার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ওয়াশিং মেশিন

আপনারা মনে করতে পারেন কাবাশরিফ হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনের মতো। ওয়াশিং মেশিনের ভেতর ময়লা কাপড়-চোপড় দিলে তা পরিষ্কার হয়ে বের হয়ে আসে, তেমনি কোনো মানুষ বায়তুল্লাহশরিফ তাওয়াফ করলে তার ভেতরকার সব ময়লা (পাপ) দূর হয়ে যায়। তবে অবশ্যই সব শর্ত মেনে সঠিক উপায়ে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হবে, অন্তরে একমাত্র আল্লাহর ভালোবাসা রেখে তাওয়াফ করতে হবে। আল্লাহপাক আমাদেরকে তেমনিভাবে খোদাপ্রেমে ডুবে ওমরা-হজ আদায় করার সুযোগ দিন এবং আমাদের সবধরনের আমল কবুল করে নিন! আমিন!!

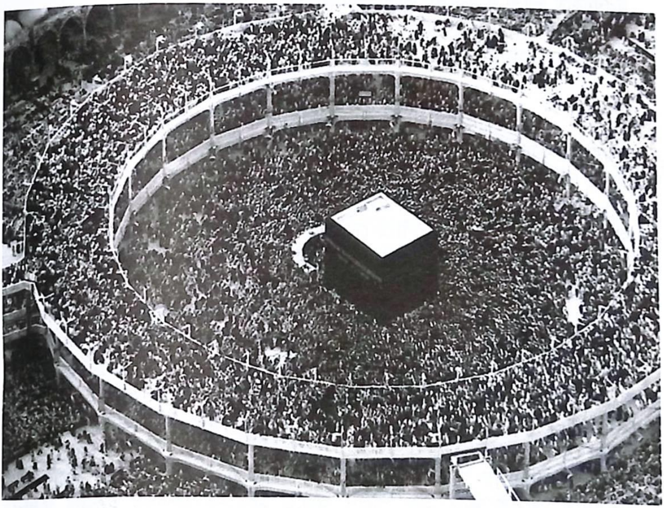

আমি তাওয়াফের উদ্দেশ্যে কাবাশরিফ এলাম

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

"যখন আমি কাবাঘরকে মানুষের মেলার জায়গা শান্তির ঘর করলাম; আর তোমরা ইবরাহিমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাজের জায়গা বানাও... ।"

ইবরাহিমি ডাকে আত্মাদের সাড়া– লাব্বাইক!

সাইয়েদুনা হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] বায়তুল্লাহশরিফ নির্মাণকাজ শেষ করলে আল্লাহপাকের তরফ থেকে নির্দেশ আসে–হে আমার বন্ধু! আপনি

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ

"লোকদের মাঝে হজের জন্যে ঘোষণা করে দিন।"

হজরত ইবরাহিম বিস্মিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ! আমার ডাক (ঘোষণা) তো গোটা দুনিয়ায় পৌঁছবে না! আল্লাহপাক বলেন, হে আমার বন্ধু! আপনার কাজ শুধু ঘোষণা করা, আহবান জানানো আর আমার দায়িত্ব হচ্ছে তা কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের রুহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া।

এরপর হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] ঘোষণা করে দেন, আহবান জানান, আল্লাহপাক সেই আহবান আগত সব আত্মার কাছে পৌঁছে দেন, সবাই তাঁর এই ঘোষণা শুনতে পায় আর সেই সময় যাদের আত্মা যতোবার লাব্বাইক বলেছিলো, পরবর্তীতে তারা ততোবার হজ ও ওমরা করার সুযোগ পেয়েছে এবং পাবে। সে সময় কেউ একবার বলেছে, কেউ দু'বার, কেউ পাঁচ, দশ, বিশ, কেউ আবার শোনার সাথে সাথে সেই যে বলা শুরু করেছে আর ছাড়াছাড়ির কারবার নেই। যার কারণে তারা জীবনে কতোবার হজ-ওমরা করেছে, তার কোনো হিসাব নেই।

আমাদের দাদাপির খাজা আব্দুল মালেক সিদ্দিকি সাহেব–যখন পানিপথে দীর্ঘসময়ে অনেক কষ্টে হজ পালন করতে হতো–সাতাশবার হজব্রত পালন করেছেন। আমাদের পির সাহেবও জীবনে শেষদিকে এসে প্রতিবছরই হজ লন করতেন। আমার একজন পরিচিত লোকও প্রায় সাতাশবার হজ আদায় রছেন!!

হজের সেঞ্চুরি!

দু'তিন বছর আগের কথা। গণমাধ্যমে খবর প্রচারিত হয়েছিলো, ইয়েমেনের একসৌভাগ্যবান লোক বলেছিলেন, "আমি হজ শুরু করার পর থেকে আর কোনো বছর তা বাদ যায়নি, আল্লাহর মেহেরবানিত প্রতিবছরই একবার করে হজব্রত পালন করে চলেছি, এখন আমার বয়স একশো কুড়ি বছর। মাত্র কুড়ি বছর বয়স থেকে আমি হজ পালন শুরু করেছি!"

সোবহানাল্লাহ! তার মানে এতোদিনে তিনি হজের সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন, সেই সাথে তিনি একটি মজার তথ্য দিয়েছিলেন আর তা ছিলো তিনি প্রতিটি হজই পদব্রজে করেছিলেন।

আল্লাহু আকবার! আল্লাহপাকের এমনও বান্দা রয়েছেন, যারা জীবনে বহুবার হজ করেছেন। আসলে এসব হচ্ছে খোদাপ্রেমের সফর।

اگر ہیں آپ مخلص اپنے اقرار محبت میں
[আগার হেঁ আপ মুখলিছ আপনে একরারে মোহাব্বত মেঁ]
طلب خود کر لئے جائیں گے دربار محبت میں
[তলব খোদ কর লিয়ে জায়ে গে দরবারে মোহাব্বত মেঁ]

প্রেমদাবিতে সত্য হলে
খুলবে মনের দোর
নেবেন তিনি নিজেই ডেকে
দেখবে সুখের ভোর।

খাজা সিরাজুদ্দিনের মক্কায় অবস্থান

এখানে (মক্কাশরিফে) আমাদের মুরুব্বিরা বড়ো আগ্রহ নিয়ে ব্যাকুল হয়ে ভালোবাসার সাথে আগমন করতেন। হজরত খাজা সিরাজুদ্দিন [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] আমাদের সিলসিলার একজন উঁচুমানের বুজুর্গ আর শীর্ষ আলেম ছিলেন। বড়ো বড়ো আলেম-ওলামার শায়েখ ছিলেন।

তিনি হজের উদ্দেশ্যে মক্কাশরিফে তেরো দিন অবস্থান করেন। সে সময় তাঁর বিশেষ একটি কারামত প্রকাশ পায়, তিনি একাধারে সেই তেরো দিন কোনো দানাপানি মুখে না দিয়েই কাটিয়ে দেন। কোনো পেশাব-পায়খানারও প্রয়োজন পরেনি, দিন-রাত শুধু এবাদত-বন্দেগিতেই কাটিয়ে দেন। তেরো দিন পর সেখান থেকে চলে আসেন।

কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হজরত! আপনি কিছুই পানাহার করেন না কেনো? তিনি বলেন, আমি কিছু পানাহার করলে অবশ্যই পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে আর আমি এটি পছন্দ করি না যে, আমার মতো একটি কালো কুত্তা (অধম) এই পবিত্র শহরকে (পেশাব-পায়খানা দিয়ে) নাপাক করে রেখে যাই!

সেই যুগে এধরনের টয়লেটের ব্যবস্থা ছিলো না। সেটি ছিলো তাঁর বিশেষ কারামাত। আল্লাহপাক তাঁকে এতোদিন খাওয়া-দাওয়া ছাড়াই সুস্থ-সবল রেখেছিলেন এবং পেশাব-পায়খানার চাপ থেকেও নিরাপদ রেখেছিলেন। যার ফলে তিনি লাগাতার আমল অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন।

আল্লাহু আকবার! দেখুন, কার ভালোবাসার মাত্রা কেমন ছিলো?

একমহিলার কান্নাকাটি

একবার আমরা মুলতাজামে হাজির হওয়ার জন্যে (সুযোগের) অপেক্ষা করছিলাম, হঠাৎ পেছন দিক থেকে হেঁচকি দিয়ে কান্নার শব্দ শুনতে পাই। ত্বরিৎ

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"যখন আমি কাবাঘরকে মানুষের মেলার জায়গা শান্তির ঘর করলাম; আর তোমরা ইবরাহিমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাজের জায়গা বানাও... ।"

ইবরাহিমি ডাকে আত্মাদের সাড়া– লাব্বাইক!

সাইয়েদুনা হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] বায়তুল্লাহশরিফ নির্মাণকাজ শেষ করলে আল্লাহপাকের তরফ থেকে নির্দেশ আসে–হে আমার বন্ধু! আপনি

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

"লোকদের মাঝে হজের জন্যে ঘোষণা করে দিন।"

হজরত ইবরাহিম বিস্মিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ! আমার ডাক (ঘোষণা) তো গোটা দুনিয়ায় পৌঁছবে না! আল্লাহপাক বলেন, হে আমার বন্ধু! আপনার কাজ শুধু ঘোষণা করা, আহবান জানানো আর আমার দায়িত্ব হচ্ছে তা কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের রুহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া।

এরপর হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] ঘোষণা করে দেন, আহবান জানান, আল্লাহপাক সেই আহবান আগত সব আত্মার কাছে পৌঁছে দেন, সবাই তাঁর এই ঘোষণা শুনতে পায় আর সেই সময় যাদের আত্মা যতোবার লাব্বাইক বলেছিলো, পরবর্তীতে তারা ততোবার হজ ও ওমরা করার সুযোগ পেয়েছে এবং পাবে। সে সময় কেউ একবার বলেছে, কেউ দু'বার, কেউ পাঁচ, দশ, বিশ, কেউ আবার শোনার সাথে সাথে সেই যে বলা শুরু করেছে আর ছাড়াছাড়ির কারবার নেই। যার কারণে তারা জীবনে কতোবার হজ-ওমরা করেছে, তার কোনো হিসাব নেই।

আমাদের দাদাপির খাজা আব্দুল মালেক সিদ্দিকি সাহেব–যখন পানিপথে দীর্ঘসময়ে অনেক কষ্টে হজ পালন করতে হতো–সাতাশবার হজব্রত পালন করেছেন। আমাদের পির সাহেবও জীবনে শেষদিকে এসে প্রতিবছরই হজ পালন করতেন। আমার একজন পরিচিত লোকও প্রায় সাতাশবার হজ আদায় করছেন!!

হজের সেঞ্চুরি!

দু'তিন বছর আগের কথা। গণমাধ্যমে খবর প্রচারিত হয়েছিলো, ইয়েমেনের একসৌভাগ্যবান লোক বলেছিলেন, "আমি হজ শুরু করার পর থেকে আর কোনো বছর তা বাদ যায়নি, আল্লাহর মেহেরবানিত প্রতিবছরই একবার করে হজব্রত পালন করে চলেছি, এখন আমার বয়স একশো কুড়ি বছর। মাত্র কুড়ি বছর বয়স থেকে আমি হজ পালন শুরু করেছি!"

সোবহানাল্লাহ! তার মানে এতোদিনে তিনি হজের সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন, সেই সাথে তিনি একটি মজার তথ্য দিয়েছিলেন আর তা ছিলো তিনি প্রতিটি হজই পদব্রজে করেছিলেন।

আল্লাহু আকবার! আল্লাহপাকের এমনও বান্দা রয়েছেন, যারা জীবনে বহুবার হজ করেছেন। আসলে এসব হচ্ছে খোদাপ্রেমের সফর।

اگر ہیں آپ مخلص اپنے اقرار محبت میں
[আগার হেঁ আপ মুখলিছ আপনে একরারে মোহাব্বত মেঁ]
طلب خود کر لئے جائیں گے دربار محبت میں
[তলব খোদ কর লিয়ে জায়ে গে দরবারে মোহাব্বত মেঁ]

প্রেমদাবিতে সত্য হলে
খুলবে মনের দোর
নেবেন তিনি নিজেই ডেকে
দেখবে সুখের ভোর।

খাজা সিরাজুদ্দিনের মক্কায় অবস্থান

এখানে (মক্কাশরিফে) আমাদের মুরুব্বিরা বড়ো আগ্রহ নিয়ে ব্যাকুল হয়ে ভালোবাসার সাথে আগমন করতেন। হজরত খাজা সিরাজুদ্দিন [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] আমাদের সিলসিলার একজন উঁচুমানের বুজুর্গ আর শীর্ষ আলেম ছিলেন। বড়ো বড়ো আলেম-ওলামার শায়েখ ছিলেন।

তিনি হজের উদ্দেশ্যে মক্কাশরিফে তেরো দিন অবস্থান করেন। সে সময় তাঁর বিশেষ একটি কারামত প্রকাশ পায়, তিনি একাধারে সেই তেরো দিন কোনো দানাপানি মুখে না দিয়েই কাটিয়ে দেন। কোনো পেশাব-পায়খানারও প্রয়োজন পরেনি, দিন-রাত শুধু এবাদত-বন্দেগিতেই কাটিয়ে দেন। তেরো দিন পর সেখান থেকে চলে আসেন।

কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হজরত! আপনি কিছুই পানাহার করেন না কেনো? তিনি বলেন, আমি কিছু পানাহার করলে অবশ্যই পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে আর আমি এটি পছন্দ করি না যে, আমার মতো একটি কালো কুত্তা (অধম) এই পবিত্র শহরকে (পেশাব-পায়খানা দিয়ে) নাপাক করে রেখে যাই!

সেই যুগে এধরনের টয়লেটের ব্যবস্থা ছিলো না। সেটি ছিলো তাঁর বিশেষ কারামাত। আল্লাহপাক তাঁকে এতোদিন খাওয়া-দাওয়া ছাড়াই সুস্থ-সবল রেখেছিলেন এবং পেশাব-পায়খানার চাপ থেকেও নিরাপদ রেখেছিলেন। যার ফলে তিনি লাগাতার আমল অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন।

আল্লাহু আকবার! দেখুন, কার ভালোবাসার মাত্রা কেমন ছিলো?

একমহিলার কান্নাকাটি

একবার আমরা মুলতাজামে হাজির হওয়ার জন্যে (সুযোগের) অপেক্ষা করছিলাম, হঠাৎ পেছন দিক থেকে হেঁচকি দিয়ে কান্নার শব্দ শুনতে পাই। ত্বরিৎ

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি বেশ কিছু পুরুষের মাঝে একজন মহিলা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছেন আর তার কান্নার শব্দ হেঁচকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে একটু সরে দাঁড়ালাম, সামান্য ফাঁকা পেয়ে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি ছিলেন একজন আরবি মহিলা। তার উদ্দেশ্য মুলতাজামের সাথে জড়িয়ে যাওয়া, দায়িত্বরতো পুলিশরা মহিলাদেরকে সেখানে যেতে দিতে চায় না। একলোক মুলতাজাম জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করছিলেন। ক্ষাণিক পর তিনি পেছন হটলে সেই ভদ্রমহিলা এগিয়ে যান, পুশিল তাকে বাধা দিলে তিনি বলে ওঠেন, এই বেটা ভাগ, এটি তোর বাপের ঘর নয়। তারপর তিনি মুলতাজাম জড়িয়ে ধরে বিলাপ করে কাঁদতে শুরু করে দেন, তা দেখে আমি হয়রান হয়ে ভাবতে লাগলাম, হায় আল্লাহ! তোমার বান্দা-বান্দিরা কতো আঁবেগ-আকাঙ্খা আর তাড়না নিয়ে, প্রেম-ভালোবাসার পসরা সাজিয়ে তোমার ঘরে হাজির হয়। কেমন নিখাঁদ তাদের আকুতি?

রহমতের নালা থেকে কয়েক ফোঁটা

এখন বৃষ্টি নামলে 'হাতিম' বন্ধ করে দেয়, লোক সমাগম বেশি হওয়ায় ভিড়ের মাঝে পিছলে পড়ে আহত হওয়ার আশঙ্কায়। আগের যুগে ভিড় কম থাকায় এতো বিধি-নিষেধ ছিলো না। একবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে আমিও হাতিমে পৌঁছে গেলাম। উদ্দেশ্য মিজাবে রহমত (কাবাশরিফের ছাদের পানি পরার নালা) থেকে কিছু বরকতের পানি সংগ্রহ করা; কিন্তু ততোক্ষণে সেখানে প্রচণ্ড ভিড় জমে গেছে, একজনের ওপর দিয়ে আরেকজন এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করছে, সবার উদ্দেশ্য একটাই। এমন সময় খেয়াল করলাম, এক আফ্রিকান মহিলাও–কোলের সন্তানকে পিঠের সাথে সুন্দরভাবে বেঁধে নিয়ে চলাফেরা এবং সবধরনের কামকাজ করে। এই টেকনোলজি বা প্রযুক্তি তাদের খুব ভালোভাবে রপ্ত করা আছে–মিজাবের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছেন; কিন্তু সেখানে পুরুষদের প্রচণ্ড ভিড় থাকায় তিনি একদম মিজাবের নালার নিচে আসতে ব্যর্থ হন, তখন তিনি একটি ওড়নার মতো কাপড় বের করে তার একমাথায় গিরা দিয়ে অন্যমাথা একহাতে ধরে রেখে যেখানে মিজাবের (কাবাশরিফের ছাদের) পানি পরছিলো, সেদিকে ছুড়ে মারেন, যেভাবে সুতার একমাথায় পাথর বেঁধে ছুড়ে মারা হয়, তাতে সামান্য পানি সে কাপড়ে লেগে যায়। এতেই তিনি ভীষণ খুশি হয়ে পেছন দিকে সরে গিয়ে বসে পরেন। আমি তার এমন প্রচেষ্টা দেখে কৌতুহলী হয়ে খেয়াল করলাম তিনি সেই পানি কী করেন? তিনি তার শিশুটিকে কোমড় থেকে নামিয়ে কোলের ভেতর নিলেন এবং সেই কাপড়ে লেগে থাকা মিজাবের পানিটুকু চিপে চিপে শিশুটির মুখে দিতে লাগলেন। আমার বিস্ময়ের সীমা রইলো না। ভাবতে লাগলাম, একেই বলে মায়ের মমতা। নিঃস্পাপ সন্তানের মুখে কাবাশরিফের ছাদের বরকতপূর্ণ কয়েক

ফোঁটা পানি তুলে দিতে এমন প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা? তাহলে এখানে আসা খোদাপ্রেমিকরা কেমন প্রভুপ্রেম নিয়ে এখানে হাজির হয়?

ঘরে কাম হারামশরিফে এনাম!

এখানে আসার জন্যে কেউ কেউ তাহাজ্জুদ পড়ে পড়ে দোয়া করেছে। খোদাভীতিপূর্ণ জীবনযাপন করেছে, জানা নেই কে কী পরিমাণ ভালোবাসা আর আবেগ-অনুভূতি নিয়ে এসেছে? কারণ, এটি হচ্ছে প্রেমপূর্ণ সফর। প্রত্যেকেরই নিজস্ব অবস্থা আর ধরন থাকে, যেমন গতোকালই বলেছি, হজরত ইবরাহিম বিন আদহাম [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] প্রতি কদমে দু'রাকাত করে নামাজ পড়তে পড়তে পায়ে হেঁটে হজে এসেছিলেন, সেটি ছিলো একবিস্ময়কর ব্যাপার!! ভালোবাসা তথা খোদাপ্রেমের পারদ কী পরিমাণ থাকলে এমন করা সম্ভব?

আসল বাস্তবতা হলো, যার খোদাপ্রেমের পরিমাণ যতো বেশি আর মজবুত হবে, তার প্রতি সে অনুপাতে আল্লাহর রহমত ঝরবে। বরকত নামবে এবং পুরস্কার পাবে। এ কারণেই বলা হয়, 'ঘরে মে কাম, হারাম মে এনাম!' যে নিজ বাড়িতে থেকে দীনের ওপর আমল করে, সুন্নত মতো জীবন চালায়, খোদাভীরুতা আর একাগ্রমনে এবাদত-বন্দেগি করে হারামশরিফে আসে, সে সেই অনুপাতে এনাম বা পুরস্কার লাভ করে, আল্লাহপাকের তরফ থেকে তার জন্যে বিশেষ রহমত ও বরকত ঝরে। তাই এই প্রেমের সফরটি শিখে আসতে হয় এবং সবকিছু আগ্রহ নিয়ে করতে হয়।

یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا
[এহ হাসরত রাহ গায়ী পহলে সে হজ কর না নাহ সিখা থা]
کفن پر دوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا
[কাফন পর দোশ জা পঁহচে মাগার মর না সিখা থা]
یہ دیوانے کچھ ہوشیار اگر پہلے سے ہو جاتے
[এহ দিওয়ানে কুছ হুশিয়ার আগার পহলে সে হো জাতে]
حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے
[হরম মেঁ বন কে মুহরিম সাহেবে আসরার হো জাতে]

হজের বিধান হয়নি শেখা
করছি তবু হজ
এটাই আমার দুঃখ কেনো
হয়নি শেখা হজ!

হয়নি শেখা মরতে তবু
জড়িয়ে কাফন গায়
ডাকছি তাঁকে বারেক যদি
দেখা পাওয়া যায়।

প্রেমমত্ত প্রেমিক যদি
জাগতো খানিক আগে
নানা রঙের ফুটতো যে ফুল
মনের গোলাপবাগে।

হজের জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুতি

বক্সিং প্রতিযোগিতায় যারা অংশ নিতে চায়, তারা আগ থেকেই সেজন্যে প্রস্তুতি নিয়ে থাকে, তারা নিয়মিত জিমে যায়, জগিং করে। চামড়ার তৈরি থলের সাথে বা বালুর বস্তার সাথে বক্সিং প্রাকটিস করে। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ভাই, এসব কী করছো? তাহলে বলে, প্রস্তুতি নিচ্ছি, অনুশীলন করছি। যারা যতো বেশি হোমওয়ার্ক বা অনুশীলন করবে, মূল প্রতিযোগিতায় গিয়ে তারা ততো বেশি সফলতা অর্জন করবে, উন্নত মানের নৈপুণ্য প্রদর্শন করবে। প্রস্তুতি ভালো হলে পারফরমেন্সও ভালো হবে। আর প্রস্তুতি শূন্য হলে, পারফরমেন্সও শূন্য হবে। ঠিক তেমনি আমরা যদি বাড়িতে থেকে খোদাপ্রেমপূর্ণ ও সুন্নতমতো জীবনযাপন করতে পারি, তাহলে এখানে (কাবাশরিফে) এসেও সে অনুপাতে পুরস্কার পাবো। পারিবারিক জীবন যদি সুন্দর শরিয়ত মতো পরিচালিত না হয়, তাহলে আল্লাহর ঘরে গিয়েও বঞ্চিতই থাকতে হবে।

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت
[না-শূদ নসীবে দুশমন কেহ শাওয়াদ হালাকে তিগত]
سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی
[সার দোস্তানে সালামত কেহ তু খঞ্জর আজমায়ী]
بطواف کعبہ رفتم بحرم راہ نہ دادند
[বতাওয়াফে কা'বাহ রফতম বহরম রাহ নাহ দাদান্দ]
کہ بروں چہ کار کردی کہ درون خانہ ائی
[কেহ বেরোঁ চেহ কার করদী কেহ দরুন খানাহ আয়ী]

দুশমনেরই ভাগ্যে তো নেই
প্রেম আঘাতে মরা
কারণ তারি জীবনজুড়ে
চলছে এখন খরা।

বন্ধু সেতো নিরাপদেই
থাকবে জীবনভর
কারণ তারি চারপাশেতে
শান্তি বাঁধে ঘর।

করতে তাওয়াফ গেলাম আমি
ওই না কাবার দ্বারে
কিন্তু আমায় পথ দিলো না
চাপতে কাবার দ্বারে।

উল্টো আমায় জিজ্ঞাসিলো
কী করেছো কাজ
কেনোই তবে আমার কাছে
আসলে তুমি আজ?

গ্রহণীয় জায়গায় তওবা

আমরা তো পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে এখানে হাজির হয়েছি। এ অবস্থায় আমাদের একটাই করণীয় হচ্ছে, আল্লাহর দরবারে আমাদের পাপের জন্যে খাঁটি আর আন্তরিক তওবা করা। আল্লাহকে রাজি করবো, দোয়া কবুল হওয়ার মতো যতো জায়গা আছে, সেগুলোতে গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবো। দোয়া কবুল হওয়ার সেসব জায়গার মধ্যে একটি হচ্ছে মুলতাজাম। অর্থাৎ, হাজরে আসওয়াদ আর কাবাশরিফের দরোজার মাঝখানের সামান্য একটু জায়গা। হাদিসশরিফে এসেছে, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] যখন সেখানে যেতেন, তাঁর বরকতময় সিনা (বুক) দেয়ালের সাথে লেপ্টে দিতেন, জড়িয়ে নিতেন, গালও লাগিয়ে দিতেন। শিশুরা যেমন তাদের মায়ের বুকের সাথে নিজেদের লাগিয়ে নেয়, জড়িয়ে দেয়, আল্লাহপাকের প্রিয়নবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]ও সেভাবেই মুলতাজামের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিতেন।

হজরত ওমর ফারুক [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, আমি নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর পেছনেই ছিলাম, যখন তিনি দোয়া করে সরে আসেন, তখন খেয়াল করি তাঁর পবিত্র চোখদুটি পূর্ণ আর্দ্র ছিলো, তাতে অশ্রু টলমল করছিলো। আমাকে দেখে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বললেন, এটি সেই জায়গা, যেখানে অশ্রু বিসর্জন দিতে হয়। আসলেও এমনই। যেনো স্বীয় প্রিয়তমের বুকের সাথে সে জড়িয়ে গেছে।

আমার এক সৌদি প্রবাসী বন্ধু ছিলেন, তিনি ওমরা করতে এসে মুলতাজাম জড়িয়ে ধরে দোয়া করেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার সন্তানকে পবিত্রকোরআনের হাফেজ বানিয়ে দিও। দোয়া শেষে বাইরে এসে ভাবলাম, আমার স্ত্রী সন্তানেরা তো পাকিস্তানে আছে, তাই স্ত্রীকে ফোন করে ব্যাপারটি জানিয়ে দিয়ে বলি, আমি তো এভাবে সন্তানের জন্যে দোয়া করছি। তুমিও আল্লাহর কাছে দোয়া করো এবং এ জন্যে প্রাথমিকভাবে যেসব পদক্ষেপ ও প্রস্তুতি নেয়া দবকার, সেগুলো নিতে শুরু করো। তিনি বলেন, এরপর বাসায় এসে দরোজা খোলামাত্রই ফোন

বেজে ওঠে। দৌড়ে দিয়ে রিসিভ করিঃ কে জিজ্ঞেস করতেই ও প্রান্ত থেকে আমার স্ত্রীর উৎফুল্লকণ্ঠ ভেসে ওঠে, আমি কুশলাদি বিনিময়ের পর কেনো ফোন করেছো জিজ্ঞেস করার আগেই সে আনন্দচিত্তে বলে ওঠে, ওগো শুনেছো? আমার মন খুব করে চাচ্ছিলো আমাদের ছেলেটিকে কোরআনের হাফেজ বানাবো, তাই আজই না তাকে মাদরাসায় নিয়ে গিয়ে কারি সাহেবের কাছে রেখে এসেছি। আমার কী যে ভালো লাগছে। আমার মন এখন ফুরফুরে। আর সেই সুখরবটি দেয়ার জন্যেই তোমাকে ফোন করেছি। আল্লাহু আকবার! এদিকে আমি মুলতাজামে দোয়া করে গেলাম, ওদিকে আল্লাহপাক আমার স্ত্রীর অন্তরে তার প্রভাব সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যার কারণে সে সন্তানকে মাদরাসায় ভর্তি করে দিয়ে এসেছে। এভাবেই সেখানে দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

উইন্ডো অপারেশন

একসময় আমাদের দেশে প্রাইভেট পাওয়ার জেনারেশন চালু হয়েছিলো। বড়ো বড়ো শিল্পকারখানার মালিকেরা এর মাধ্যমে নিজস্বভাবে বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন করতেন, যাতে করে দেশ বিদ্যুৎখাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকতে পারে। লোডশেডিং বন্ধ হয় যায়। সেই সময় সরকার আরেকটি সেবা ব্যাপকভাবে চালু করে, যার নাম দেয়া হয় উইন্ডো অপারেশন। একটি স্বতন্ত্র দপ্তর খোলা হয়, যেখানে সব বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির থাকতেন। সেখানে কেউ কোনো ফাইল নিয়ে যাওয়ামাত্রই তা সম্পন্ন করে দেয়া হতো। ফলে দ্রুতো কাজ হয়ে যাওয়ায় সরকারি কাজে ভীষণভাবে গতিশীলতা ফিরে আসে। এক 'জানালায়' সব কাজ হয়ে যেতো বলেই তার নামকরণ করা হয়েছিলো 'ওয়ান উইন্ডো অপারেশন।' তার চেয়ে আরও উন্নত গতিশীল একটি জানালা হচ্ছে বায়তুল্লাহশরিফ, যা দিন-রাত চবিশ্ব ঘণ্টা খোলা থাকে। এখানে যে যখনই যে ফাইল নিয়ে আসে, তা সেরে দেয়া হয়।

দুনিয়া আখেরাতের যেকোনো সমস্যার সমাধান হয় এখান থেকে, কারও আর্থিক সমস্যা, কারও স্বাস্থ্যগতো সমস্যা, কারও ব্যবসা কেন্দ্রিক সমস্যা, এককথায় যে যে সমস্যা নিয়েই আসুক না কেনো, সবকিছুর সমাধান হয়ে যার এখান থেকে, অন্যকোনো জানালা বা দরোজায় যেতে হয় না কাউকেই, আল্লাহতায়ালা সেখান থেকেই তার সব সমস্যার সমাধান করে দেন। তবে সেজন্যে পূর্বশর্ত হলো, পরম আস্থা, আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা নিয়ে সেখানে ধর্ণা দিতে হবে, একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে, তবেই তাঁর বরকত পাওয়া যাবে।

নাস্তিকের দোয়াও কবুল হয়েছে

আমি যখন একটি বেসরকারি কারখানায় ইলেকট্রিক্যাল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলাম, সেখানে আরেকজন ম্যানেজার এসে যোগদান করেন। তিনি

ছিলেন বয়সে তরুণ, আগে সেনাবাহিনীতে ছিলেন। সেখান থেকে ইস্তেফা দিয়ে এই বেসরকারি কোম্পানিতে এসেছিলেন। আমার জীবনে কখনও তার মতো এতো সুন্দর সুঠাম সুডৌল পুরুষ দেখিনি, মনে হতো তিনি সবসময় বডি বিল্ডিং করতেন তার সিনার (বুকের) প্রসস্ততা দেখে মানুষ হয়রান হয়ে যেতো, তার চলার সময় মানুষ থমকে দাঁড়িয়ে তার দিকে অপলক চোখে চেয়ে থাকতো। সত্যি বলতে কী, তার কায়িক গঠন ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গেলে মনে হবে আমি যেনো উপন্যাসের কোনো নায়কের বর্ণনা করছি। তাই এককথা বলা যায়, তার মতো অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী সুঠামদেহী সুদর্শন যুবক এর আগে আর কখনো আমার নজরে পরেনি।

তিনি যোগদানের পর আমি খুব খুশিই হলাম। ভাবলাম, একজন বনেদি পরিবারের সুশিক্ষিত সুদর্শন তরুণ ম্যানেজারের সাথে কাজ করতে মজাই হবে; কিন্তু কিছুদিন পরই জানতে পারি, তিনি একজন কট্টর নাস্তিক। কারণ, মি. ভুট্টোর যুগে সে শিক্ষালাভ করেছে। তখন চলছিলো কমিউনিজমের রমরমা উত্থান, সবুজ শ্যামল এশিয়ার ওপর ছিলো তাদের শ্যেনদৃষ্টি। অবস্থাদৃষ্টে তো মনে হচ্ছিলো, এই বুঝি কমিউনিস্টরা গোটা পৃথিবী জয় করে নিলো। সেই সময় এই তরুণ ভদ্রলোক কমিউনিস্টদের সাথে ওঠাবসা মেলামেশা করতে শুরু করে। একপর্যায়ে তাদের শিকারে পরিণত হয়ে যান। রূপান্তরিত হয়ে যান একজন খাঁটি কমিউনিস্টে। যে কমিউনিস্টরা বলে, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেনি; বরং মানুষই আল্লাহর কল্পনা সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহকে একেবারেই অস্বীকার করে। ধর্মকে বলে আফিম বা নেশাদ্রব্য। আরও বলে, যারা এই ধর্ম নামের আফিম নেশা সেবন করে, তারা আর কিছুই বুঝে না।

আল্লাহর মহিমায় আরেকজন ইঞ্জিনিয়ার আমাকে বলেদিয়েছিলেন এই সুদর্শন তরুণ ম্যানেজার একজন খাঁটি নাস্তিক এবং বলেন (তিনি একবার সেই ইঞ্জিনিয়ারের সাথে চা পান করতে করতে বলেছিলেন,) আপনারা আল্লাহকে যেমন ভয় করেন, আমরা তেমন ভয় করি না। এমন ধৃষ্ঠতা দেখাতে কেউ না পারলেও সেই তরুণ নাস্তিক ম্যানেজার ঠিকই দেখিয়েছেন।

এরপর আমি অফিসের (কোম্পানির) সবাইকে বুঝিয়ে বলি, তারা যেনো সেই (নাস্তিক) ম্যানেজারের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠতা গড়ে না তোলে, খুব মেলামেশা না করে, নিরব থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যায়। সময় সুযোগ হলে আমি নিজে তার সাথে আলাপ আলোচনা করবো। আমার সাথে তার সবসময় ওঠা বসা হয়। কথাবার্তা চলে। কারণ, তিনি ছিলেন মেকানিক্যাল ইনর্চাজ আর আমি ছিলাম ইলেকট্রিক্যাল ইনচার্জ। ফলে দু'জনকে একসাথে মিলেমিশে কাজ করতে হতো। প্রতিটি প্রজেক্ট বা প্রকল্পও আমরা একসাথে তৈরি ও সম্পন্ন করতাম। এ জন্যে আমাদের দিনে কমপক্ষে বিশ-পঁচিশবার কথাবার্তা বলতে ও পরামর্শ করতে হতো। এভাবে দিন এগিয়ে যেতে থাকে; কিন্তু কিছুদিন পর ধীরে ধীরে তার বোধ বিশ্বাস ও দর্শনের প্রকাশ ঘটতে শুরু করে।

একদিন একজানাজা থেকে ফিরে গিয়ে প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে বলেন, আমি অমুক জায়গায় জানাজা পড়তে গিয়ে সেই গোরস্তানের পনেরো বিশটি কবরের ওপর হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি, সেগুলোর একটি কবরের মাটিও গরম পাইনি। একথা বলে তিনি বুঝাতে চাচ্ছিলেন, আপনারা যেসব কবর আজাবের কথা বলে থাকেন, এগুলো একদম বানোয়াট, অনর্থক, ধারণামাত্র। এছাড়া আমার সামনেও তিনি দু'-একবার ডারইউনের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু আমিও যেহেতু ডারইউন থিউরি খুব ভালোভাবে পড়েছিলাম, তাই যখন তার কাছে 'লাইফ অফ ন্যাচারাল সিলেকশন'সহ নানান প্রসঙ্গের গভীরের কিছুবিষয় তুলে ধরতাম, তখন তিনি উপলব্ধি করতে পারেন, আমিও এসব বিষয়ে তার চেয়ে পিছিয়ে নই। তাই আমি কোনো ইজি টার্গেট (সহজ লক্ষবস্তু) হবো না। ফলে তখন থেকে আমার সাথে কথা বলতে একটু হিসাব নিকাশ করতেন, সাবধানতা অবলম্বন করতেন, অনেকটা ভয়ও পেতেন। যার কারণে অন্যছেলেদের সাথে বেশি কথা বলতে চেষ্টা করতেন; কিন্তু আগেই আমি তাদেরকে সতর্ক করে দেয়ার ফলে তারা কৌশলে তাকে এড়িয়ে চলতো। আমার কাজ আপন গতিতে চলতে থাকে। আমি নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় মাঝে মধ্যে বলতাম, আসুন ভাই, আপনিও একটু নামাজের মজা উপভোগ করুন। এভাবেই হালকা পাতলা কিছু বলতাম, আল্লাহপাকের কী মহিমা! একদিন আরেক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমার পাশে বসে তার ব্যক্তিগতো কিছু কথাবার্তা বলছিলেন, বাসায় এই সমস্যা, ওখানে এই পেরেশানি, আয়-উপার্জন না বাড়লেও খরচের পরিমাণটা বেড়েই চলেছে হু-হু করে আর কুলিয়ে উঠতে পারছি না ইত্যাদি।

এমন সময় তিনি আগ বাড়িয়ে বলেন, কীসব পেরেশানি আর চিন্তা করছেন যে, টাকা-পয়সা আসবে কোত্থেকে? আর আমি পেরেশানে আছি, এতোসব টাকা-পয়সা খাটাবো কোথায়? কোন কাজে লাগাবো? তার এমন বলার পেছনে কারণ ছিলো, তার বড়ো ভাই ছিলেন একজন মেজর। তাদের বিশাল এলাকাজুড়ে ফসলী জমি ছিলো সের গোদা এলাকায়। সেই সাথে তিনি নিজেও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তার দু'ভাই যা বেতন পেতেন, তা সোজা জমা হয়ে যেতো ব্যাংক একাউন্টে। তারা চাকরি করার আগ থেকেই বিশাল সম্পদের মালিক ছিলেন, এখন তার পরিমাণ আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে।

তার এমন দাম্ভিকতাপূর্ণ মন্তব্য শুনে আমি বলি, তা যাই হোক, তবে মনে রাখবেন, আল্লাহর লাঠি একেবারে শব্দহীন। আপনি যে কথাগুলো বললেন, এগুলো আল্লাহপাকের কাছে খুবই অপছন্দনীয়, এগুলো অহঙ্কারী কথা, দাম্ভিক মন্তব্য, তাই আপনার তওবা করে নেয়া ভালো। জবাবে তিনি বলেন, তওবা তো তখনই করবো, যখন আমি আল্লাহকে মেনে নেবো, তাকে বিশ্বাস করবো! আমি বললাম, এরপর যখন সময় এসে পরবে, তখন ঠিকই মানবেন, ঠেলায় পরলে

ঠিকই মানতে বাধ্য হবেন)। তবে জানি না সেই সময়ের মানা কোনো উপকারে আসবে কী-না? কিন্তু মানতে হবে অবশ্যই। কারণ, ফেরাউনও বলেছিলো, আমি মুসা ও হারুনের প্রভুর প্রতি ইমান আনছি। বড়ো ফেরাউনও যেমন মানতে বাধ্য হয়েছে, তেমনি ছোটো ফেরাউনরাও বাধ্য হবে অবশ্যই। একথা শুনে তিনি চুপ হয়ে যান।

আল্লাহর মহিমা দেখুন, তার বয়স প্রায় ছাব্বিশ সাতাইশ বছর হয়ে গিয়েছিলো, এখন বিয়ে করা দরকার; কিন্তু তিনি যেহেতু অর্থশালী সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারের সুঠাম সুডৌল সুদর্শন পাত্র ছিলেন। ভালো অবস্থানে উচ্চপদে চাকরি করেন। আল্লাহপাক তাদেরকে সবদিক দিয়েই দুনিয়ার মানসম্মান আর মর্যাদা দান করেছিলেন, তাই মুখ দিয়ে বিয়ের কথা বের করার সাথে সাথে চারদিক থেকে মৌমাছির মতো বিয়ের প্রস্তাব আসতে শুরু করে। তখন তিনি তার মনের কথাগুলোও আমার সাথে শেয়ার করতে থাকেন। বলেন, এই মুহূর্তে শতাধিক প্রস্তাব এসেছে। আম্মাও খুব পেরেশান কীভাবে কী করা যায়? আচ্ছা বলুন তো এই অবস্থায় আমি কী করতে পারি? আমি বলি, এই লম্বা লিস্টকে একটু যাচাই বাছাই করে একটি সট লিস্ট তৈরি করুন, যাতে যাদের সাথে আত্মীয়তা করা যায়, এমন বাকি দশটি পরিবারের নাম থাকবে। এরপর বিশেষভাবে খোঁজখবর নিয়ে তাদের ভেতর থেকে দেখা শোনার মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি বলেন, ঠিক আছে। তারপর তিনি তার মাসহ পরিবারের সবাই বিয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন এবং আমার পরামর্শ মতো এগুতে থাকেন।

সেই সময় আমি একদিন অফিসে গিয়ে জানতে পারি, গতোকাল তার একটি ছোটোখাটো এক্সিডেন্ট ঘটে গেছে। যার কারণে তিনি আজ অফিসে আসতে পারেননি। এরপর আমরা বেশ ক'জন অফিসার তাকে দেখতে যা ই। হ্যাঁ, তার শরীরের দু'একজায়গায় ছোটোখাটো কিছু আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, তবে বড়ো ধরনের কোনো জখমের চিহ্ন নেই।

তাকে জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে? কেনো এবং কীভাবে হয়েছে? তিনি বলেন, সড়ক একদম ফাঁকা ছিলো, বেশ দ্রুতো গতিতে গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একসময় জিমুনি চলে আসে, মনে হয় যেনো জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি। এরপর আর কিছুই মনে করতে পারিনি। যখন বুঝতে পারি, তখন দেখি আমি নিচে পরে আছি।

তৃতীয় দিন জানতে পারি, আসলে গাড়ি দুর্ঘটনার মতো কিছু ঘটেনি। মূলত যা ঘটেছিলো, তা হলো, তিনি তার বাড়ির সামনের লেনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে পরে যান, নিজ থেকেই এবং তাতে সামান্য আহত হন; কিন্তু তার পরে যাওয়ার ধরনটা তাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে। তিনি ডাক্তারের কাছে যান, ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলেন, আপনার ডান ও বাম দিকে চলাচলের যে সিগনাল সিস্টেম আছে, তাতে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেটি ভালোমতো কাজ করছে না।

বেশ কিছুদিন এভাবে চলে যায়। এরপর দেখা দেয় আরেক নতুন সমস্যা, তার হাত দিয়ে শুধু ঘাম ঝরতে থাকে বিরামহীনভাবে, চার পাঁচটি হাত রুমালেও কোনো কাজ হয় না, একটির পর আরেকটি ভিজে যেতে থাকে। এতে তিনি আরও বিচলিত হয়ে পরেন। ছুটে যান ডাক্তারের কাছে। হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বসে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করেন, এরপর সবাই মিলে একটি লম্বা অপারেশন চালান। প্রায় আট নয় ঘণ্টাব্যাপী আস্তে আস্তে ঘাম ঝরা কিছুটা কমে আসে; কিন্তু কথায় বলে, "আল্লাহর মার দুনিয়ার বার।" অন্যভাবে যাকে বলে, "আল্লাহর লাঠি বড়োই নির্বাক।" এরপর দেখা দেয় আরেক নতুন সমস্যা, সেটি এবার চোখে, তার মানে, একটি জিনিসকে দু'টি বলে মনে হতে থাকে। সামনে একজন মানুষ দাঁড়ালে তিনি দেখেন দু'জন দাঁড়িয়ে আছে! মহাসমস্যা, এখন এর কী চিকিৎসা করা যায়? এদিকে কারখানার মালিক জানিয়ে দেন এভাবে দু'মাস চলে গেলো, আপনি কারখানার ভেতর একটু ঘুরেও দেখতে পারেন না, কর্মচারীদের কাজের তদারকি করতে পারছেন না, তাই এখন আপনি দীর্ঘ মেয়াদি ছুটি নিয়ে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, তারপর সুস্থ হয়ে উঠলে আবার কাজে যোগ দেবেন। তিনি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নেন; কিন্তু আল্লাহর কী ইচ্ছে? এরপর তিনি আবার ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পরেন। যেহেতু তার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পরেছিলো, ফলে জ্বর আর ছাড়তেই চাচ্ছিলো না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, তিনি কয়েক মাসের জন্যে বাড়িতে চলে গেছেন। দু'মাস পর আমার খেয়াল হয়, তিনি তো শুধু আমার সহকর্মী নন। তিনি আমার বন্ধুও বটে, অথচো এতোদিনে কোনো খোঁজখবর নেই! কোনো ধরনের যোগাযোগও নেই। তাই তার খোঁজ নেয়া খুবই জরুরি। এরপর আমি তার বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করে সেখানে চলে যাই; কিন্তু তাকে দেখে একেবারেই চেনার উপায় ছিলো না। তার শরীরের ওজন একদম সর্বনিম্নপর্যায়ে চলে এসেছিলো, যেনো একটি কিশোর বিছানায় শুয়ে আছে আর তিনি এতোটাই দুর্বল হয়ে পরেছিলেন যে, নিজ থেকে একটু পাশও বদলাতে পারছিলেন না। কাপড় বদলিয়ে দিতেন তার মা। এমনকি খাবারটাও মুখে তুলে দিতে হতো। শব্দ করে কিছু বলতে পারতেন না। টিবি রোগের কোনো রোগীকেও আমি এতোটা দুর্বল হতে কোনোদিন দেখিনি। কিছুদিন আগেই যার স্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহকে আদর্শ স্বাস্থ্য বা দেহ হিসেবে উপস্থাপন করা হতো। যাকে বলা হতো সুন্দর স্বাস্থ্যের নমুনা। তাকে আজকের এই করুণ অবস্থায় দেখে আমার চোখ বেয়ে অশ্রু গরিয়ে আসে। আমি তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিই, চিন্তা করবেন না, আল্লাহপাক আপনাকে সুস্থ করে তুলবেন। তিনি চুপচাপ আমার কথা শুনতে থাকেন। সে সময় আমার মনে একটি খেয়াল আসে, আমি আমাদের কারখানার মালিকের সাথে একটু কথা বলে দেখি না কেনো, এমন একজন মেধাবী তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের জন্যে সর্বশেষ পর্যায়ের চিকিৎসার চেষ্টা করা দরকার। কারণ, এরা দেশের অমূল্য সম্পদ। তার কাছে আমার এমন ভাবনার কথা ব্যক্ত করলাম, সেই সাথে আরও বললাম, মালিকের সাথে আমার ব্যক্তিগতোভাবে ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আমার বিশ্বাস, তিনি

আমার দাবি রক্ষা করবেন। তিনি সম্মতি দিলে আমি আপনাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেবো উন্নত চিকিৎসার জন্যে। তবে আমার সাথে একটি ওয়াদা করতে হবে। তিনি বলেন, কী সেই ওয়াদা? বলি, সেটি হলো, চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পথে একটু ওমরা হজ পালন করে আসবেন। তিনি তো আল্লাহকেই মানেন না; কিন্তু বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁসূচক সম্মতি জানান। এরপর ফিরে এসে আমি আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবকে নানাভাবে বুঝিয়ে রাজি করি। তিনি বলেন, তাহলে ভালো করে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ করে নিন তাকে কোন দেশে কিসের চিকিৎসা করতে হবে? বাকিটা আমি দেখছি। তারপর উচ্চপর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডা. সাহেব বলেন, তার এই রোগটিকে দুরারোগ্য হিসেবে ধরা হয় এবং এর কোনো সাধারণ চিকিৎসাব্যবস্থা এখনো বের হয়নি, তবে আমার জানা মতে, কানাডার একডাক্তারের স্ত্রীর এই রোগ হয়েছিলো, তারপর তিনি এটি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালান এবং একপর্যায়ে তাতে সফলতা লাভ করেন, এরপর না-কি তিনি আরও আটজন রোগীর চিকিৎসা করেছেন, আপনারা তার সাথে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন। আমরা সেই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করি। তবে এজন্যে তিনি অস্বাভাবিক পরিমাণ টাকা দাবি করেন, কোম্পানির মহৎপ্রাণ মালিক শুনে বলেন, ঠিক আছে, আমি টাকার ব্যাপারটা দেখছি, আপনারা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

এরপর তার ভাইয়ের সাথে সৌদি এয়ারলাইন্সে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেসময় তার ভাইকেও বলি, যেহেতু জেদ্দা হয়েই ফিরে আসতে হবে, তাই আসার পথে তাকে একটু ওমরা করিয়ে আনবেন।

একমাস পর জানতে পারি, তিনি সুস্থ হয়ে কানাডা থেকে ফিরে এসেছেন। তখন খুশি মনে তার সাথে দেখা করতে যাই। আল্লাহর কী মহিমা, তার সাথে দেখা করতে গেলে তিনি মুচকি হেসে আমাকে তার কাছে বসিয়ে নেন, প্রায় আগের মতো চেহেরা ফিরে পাওয়া দেখে আমার মন খুশিতে ভরে যায়। কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি আমার কাছে জানতে চান, এখন খাবারের সময় হয়ে গেছে, আবার নামাজের সময়ও চলে এসেছে, তো বলুন, আগে কোনটি সেরে নিতে চান? তার মুখে নামাজের কথা শুনে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। বলি, ঠিক আছে, আগে নামাজ পড়ে নিই, এরপর খাবার খাওয়া যাবে। আমরা একসাথেই নামাজ আদায় করি। এরপর খাওয়া দাওয়া। এরপর তিনি শুরু করেন এতোদিনে ঘটে যাওয়া গল্প। এ যেনো গল্প নয়, ঠিক যেনো এক রোমাঞ্চকর উপখ্যান।

তিনি বলে যেতে থাকেন, আপনি যখন আমাকে বলছিলেন, ফিরে আসার সময় ওমরাটা করে আসবেন, তখন আমি আমার জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যেনো আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই শুধু কথাগুলো বলছিলেন। যেহেতু আমার জীবনে আপনাকে একজন খাঁটি নিস্বার্থ বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম, সে জন্যে শুধু আপনার খাতিরেই তখন হ্যাঁ বলেছিলাম। কানাডা যাওয়ার পর ডাক্তার আমাকে আইসিইউতে ঢুকিয়ে দেন।

সব কাপড় খুলে শরীরে নানান ধরনের তার সংযোজন করে দেন। যার কারণে একেক জায়গা থেকে একে রকমের সঙ্কেত আসতে থাকে, আমার শরীরে ফিট করা বিশটি তার নিয়ে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ করে দেয়া হয় এবং কম্পিউটার প্রতিটি তার থেকে আসা সিগনাল বা সঙ্কেতগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। কয়েকদিন পর ডাক্তার সাহেব আমার শরীরের সব রক্ত সেন্ট্রিপিউজের মাধ্যমে পরিষ্কার (শোধন) করে নেয়। আর তা এভাবে সম্পন্ন করে, একদিক থেকে আমার শরীরের রক্ত মেশিন টেনে নিয়ে সেন্ট্রিফিউগলের ভেতরে ঢুকায়, সেখান থেকে রক্তের প্লাজমা আলাদা হয়ে যায়, এরপর তা শরীরে ঢুকিয়ে বাকি রক্ত বের করে নেয়া হয় এবং সেগুলো একই প্রক্রিয়ায় শোধন করা হয়।

পনেরো দিনের মধ্যে এভাবে পরপর তিনবার আমার রক্ত শোধন করা হয়। অবশেষে আমার ভইকে ডেকে ডাক্তার সাহেব বলেন, এতোদিন এভাবে একবার সেন্ট্রিফিউজ করার পরই সব রোগী সুস্থ হয়ে যেতো; কিন্তু এই রোগীকে পরপর তিনবার তা করার পরও কোনো ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। আমার দৃষ্টিতে এ এখন বিছানায় শুয়ে থাকা একটি লাশের মতো সামান্য কয়েক দিনের মেহমানমাত্র! ফোনে মাকে ডাক্তারের এমন রিপোর্ট জানানোর পর তিনি বলেন, সে যদি কয়েকদিনের মধ্যে মরেই যায়, তাহলে মৃত লাশ বয়ে আনার চেয়ে তার জীবিত ধরটাই নিয়ে এসো। তাকে একটু একনজর দেখতে পাবো, সাথে দু'একটি কথা বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবো। তারপর ডাক্তারের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে আমরা সেখান থেকে চলে আসি। অনেক কষ্টে প্লেনের সিট বুকিং দেয়া হয় শুধু জেদ্দা পর্যন্ত। তখন জেদ্দা থেকে লাহোরে প্লেন চলাচল করতো সপ্তাহে একদিন। যার কারণে জেদ্দায় এসে আমাদের কয়েকদিন আটকে থাকতে হয়। বড়ো ভই আমাকে নিয়ে জেদ্দার একটি হোটেলে উঠেন, একসময় তিনি আমাকে বলেন, তোমার ওই সেই মোলভি বন্ধুটা না বলেছিলো তোমাকে ওমরা করিয়ে নিয়ে যেতে, তুমি কী বলো? তোমাকে কি হারামশরিফে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবো? আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই। বড়ো ভাই আমাকে হুইল চেয়ারে করে হারামশরিফে নিয়ে যান। আমি মাতাফে বায়তুল্লাহর সামনে বসে বসে দেখতে থাকি আর ভাবি, লোকেরা এসব কী করছে? বলা হয় সবাই তাওয়াফ করছে। এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে যাই। মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকে তাওয়াফ কী জিনিস আর কেনো সবাই এভাবে করছে? আমি তো এসব কিছু, এমন কি আল্লাহকেই মানতাম না, তারপরও বেশ কিছু সময় বসে থাকি, থাকতে থাকতে মনের ভেতর একটি বিষয় উদয় হয়, তারপর বলি, হে আল্লাহ! তুমি যদি সত্যিই থেকে থাকো, তাহলে আমাকে সুস্থতা দাও, ভালো করে তুলো। তাহলে আগামীকাল আমি পায়ে হেঁটে এই তোমার ঘর তাওয়াফ করবো। এই দোয়া করার পর কোনোধরনের ওষুধ না খাওয়ার সঙ্কল্প করি। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসি। ভাইকে বলি, আমি

আর কোনো ওষুধ খাবো না। এরপর রাতে ঘুমিয়ে পরি, পরদিন সকালে ওঠে নিজেকে বেশ সুস্থ মনে হয়। ভাইকে বলি, আমাকে আজও নিয়ে চলুন। তিনি আমাকে আবার হারামশরিফে নিয়ে যান। আমি হুইল চেয়ার ছেড়ে পায়ে হেঁটে তাওয়াফ শেষ করি।
এরপর মনে মনে চিন্তা করি, দয়াময় আল্লাহপাক তো আমার কথা শুনেছেন, আমার আশা পুরো করে দিয়েছেন, এখন আমার প্রতিজ্ঞা পালন করা দরকার। এরপর আমি বায়তুল্লাহর দিকে তাকিয়ে বলি, হে এই ঘরের মালিক! আমি তোমাকে আমার খোদা হিসেবে স্বীকার করে কালেমা পড়ে মুসলমান হচ্ছি। ইসলামধর্ম গ্রহণ করছি।
সোবহানাল্লাহ! হারামশরিফে বসে করা একজন নাস্তিকের দোয়া যদি আল্লাহ কবুল করে নেন, তাহলে কোনো ইমানদার মুসলমান তাঁর ঘরের সামনে বসে তাঁর সামনে আঁচল বিছিয়ে দোয়া করে, তাহলে তার মালিক সে দোয়া কবুল করবেন না কেনো?

দোয়া কেনো প্রভাবহীন হয়ে পরেছে?

এজন্যে মূল কারণ বা সমস্যা হচ্ছে আমাদের অন্তর অন্যজায়গায় আটকে আছে, হারামশরিফে পৌঁছার পরও এর খেয়াল, ওর খেয়াল, তার চিন্তা, অমুকের ধান্দা, একে মেসেজ দেয়া, ওকে ফোন দেয়া, অমুকের কলের অপেক্ষা, তমুকের লাইক দেয়ার প্রতীক্ষা, এখানে আসার পরও যদি অন্যকিছু থেকে মন পরিষ্কার না হয়, তাহলে কীভাবে দোয়া কবুল হবে। নামাজ পড়তে যাচ্ছে, অথচো হারামশরিফে আসা নারীদের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে! হারামে এসেও যদি অন্যকিছুর ওপর লালসা জন্মে, তাহলে আল্লাহপাক তার ঝুলিতে কীভাবে দেবেন? এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে অন্তরে গেঁথে নেবেন–আল্লাহপাক দেয়ার জন্যে ডেকেছেন, অথচো এখানে আসার পর শয়তান আমাদের অন্যকিছুর দিকে ঝুকে দিয়েছে আর অন্যদিকে ঝুঁকে যাওয়ার কারণে আমাদের দোয়াও ক্রিয়াহীন হয়ে পরেছে, প্রভাব নষ্ট হয়ে গেছে। মুখে তাদের চাইতে দেখা যায়; কিন্তু এ চাওয়া মনের চাওয়া নয়। মনের চাওয়াই তো সত্যিকারে কাজে আসে।

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

[দিলসে জু বাত নিকালতী হায় আছর রাখতী হায়]

پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

[পর নেহী তাকাত পরওয়ায মাগার রাখতী হায়]

মনের থেকে হয় যে কথা
প্রভাব আছে তার
একপলকেই ভুলবে জখম
মুক্তি মিলে যার।

আমাদের দেহ হাজির হলেও অন্তর হাজির হয় না। অথচো আল্লাহপাকের ঘরে হাজিরা দেয়ার পূর্বশর্ত এটি। তিনি বলেন, হে আমার বান্দা! তোমার অন্তর আমার কাছে হাজির করো। তোমার হৃদয় কেবল আমার প্রেমে পূর্ণ করে নাও। অন্যসবকিছুর মোহ-ভালোবাসা থেকে তা মুক্ত করে রাখো। তোমরা আঁচল বিছিয়ে দিলে আমি তা ভরিয়ে দেবো।

খাঁটি তওবা করে দেখুন, বলুন, হে মাওলা! আমি সব লাত-মানাত ছেড়েছি, এখন শুধু আপনার খাঁটি ভালোবাসা আমার হৃদয়ে জায়গা দিয়ে রেখেছি। এরপর দেখতে পাবেন, আল্লাহপাকের তরফ থেকে কী ধরনের রহমত ঝরতে থাকে। যে আল্লাহ একজন নাস্তিকের দোয়া কবুল করে দেখিয়ে দেন, সেই আল্লাহপাকই একজন কালেমাপড়ুয়া মুসলমানের দোয়া কবুল করবেন না, তা কী করে হতে পারে?

যেমন সেলফোনে লক থাকে, যদি সেটি লেঘে যায়, তাহলে আপনি যে বাটনই চাপুন না কেনো, কোনোভাবেই তাতে কল ঢুকবে না। তেমনি মানুষের এই পার্থিব মোহ বা প্রেমও হচ্ছে দোয়া কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে একটি লকের (তালার) মতো। এটি লেগে যাওয়ার পর আপনি যতোই বাটন চাপতে (দোয়া করতে) থাকুন না কেনো–আল্লাহ এই দাও, আল্লাহ ওই দাও–সিগনালই যাবে না। সিগনাল পাঠাতে হলে আগে সেই লক খুলতে হবে। যা একান্ত জরুরি।

ইসমেআজম কী?

এ জন্যে আল্লাহপাক বলেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার ঘরে হাজির হয়েছো, এখন তোমার অন্তরকে আমি ছাড়া অন্যসবকিছু থেকে খালি করে নাও। একমাত্র আমার দিকেই মনোনিবেশ করো। এরপর এমন অবস্থায় যখন আল্লাহপাকের কাছে চাইতে থাকবেন যে, আপনার অন্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্যকোনো জিনিসের ভালোবাসা অবশিষ্ট থাকবে না, সে অবস্থায় আল্লাহপাক তার দোয়াকে কোনোভাবেই ফিরিয়ে দেবেন না। এ কারণেই আমাদের মুরব্বিরা লিখেছেন, যখন অন্তর অন্যকিছু থেকে মুক্ত হবে আর পেট হারাম সম্পদ থেকে খালি থাকবে, তখন তার মুখ থেকে বের হওয়া সব ইসমই ইসমেআজম হিসেবে গণ্য হবে। আমরাও তেমনি দোয়া করে একটু দেখি না কেনো?

আমেরিকান এক তরুণীর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

আমেরিকার একটি স্টেটের (রাজ্যের) নাম ওয়াশিংটন, সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো। একদিন বয়ানের পর মসজিদের মোতাওয়াল্লি বললেন, এখানে একজন আমেরিকান নওমুসলিম নারী রয়েছেন, তিনি খুবই পাক্কা ইমানদার, তার ইমান আমল দেখে উদাসীনতায় ডুবে থাকা মুসলিম নারীরাও নেককার হয়ে যায়। তার ধীরস্থির ও একান্ত একাগ্রতার সাথে নামাজ পড়া দেখলে আত্মা জুড়ে যায়। গুরুত্বের সাথে খুব সুন্দরভাবে ওজু করেন, এরপর খুবিই সুন্দর মার্জিত নামাজের আলাদা পোশাক পরে নামাজে দাঁড়ান। পবিত্রকোরআনের নির্দেশ–

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"তোমরা প্রতি নামাজের সময় সুন্দর বেশ ধারণ করো (সুন্দর পোশাক পরে নামাজে দাঁড়াও)।"

এর প্রতি আমল করেন, জায়নামাজে দাঁড়ানোর সময় ভালোভাবে ওজু করে খোশবু লাগান। তারপর নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যান। অনেক সময় নিয়ে নামাজ পড়েন, এমনকি একবেলা নামাজের জন্যে প্রায় পোনে একঘণ্টা সময় ব্যয় করেন। বাড়ির সদস্যরা বলে যায়, তুমি এভাবে কতোক্ষণ বসে থাকবে। ওদিকে তিনি এসব কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে সেজদায় লুটিয়ে থাকেন। অন্যদের আপত্তির মুখে তিনি শুধু বলেন, নামাজের সময় আমার প্রভুর সাথে কেমন অবস্থা বিরাজ করে তা তোমরা কী বুঝবে? তিনি আপনার সাথে একটু কথা বলতে চান। তারপর নামাজ শেষে পর্দার আড়াল থেকে তিনি আমাকে বেশ কিছুবিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। আমি ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর জবাব দিয়ে যাই। তার বেশিরভাগ জিজ্ঞাসা ছিলো দীন ইসলাম, বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতা নিয়ে। জিজ্ঞাসা জবাবের পর্বটা পরিণত হয়ে যায় আলোচনা পর্যালোচনায় আর তা ঘণ্টা পর্যন্ত চলতে থাকে। একপর্যায়ে এসে তিনি বলেন, আজ আল্লাহপাক আমার অন্তর চওড়া করে দিয়েছেন। এতোদিন যেসব জিজ্ঞাসা মনে আর মাথায় ঘুরপাক খেতো, এখন সেগুলোর অবসান হয়ে গেলো। আলোচনার শেষপর্যায়ে আমি বলি, এতোক্ষণ শুধু আমি জাবাব দিয়ে গেলাম, এখন আপনি একটু জবাব দিন, আচ্ছা বলুন তো, আপনি কেনো কীভাবে মুসলমান হলেন? সব নওমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের পেছনে শিক্ষণীয় বহু কিছু থাকে।

তিনি বলতে শুরু করেন, আমি ছিলাম খ্রিস্টান আর আমার স্বামী ছিলেন ইহুদি। আমরা দু'জনই ইঞ্জিনিয়ার (প্রকৌশলী) ছিলাম এবং আমরা একই অফিসে কাজ করতাম। সে সময় আমাদের কোম্পানিটি জেদ্দায় নতুন অফিস খুলে এবং সার্কুলার জারি করে বলে, যারা জেদ্দায় অফিসে যোগ দেবে, তাদের দ্বিগুণ বেতন ভাতাসহ সবধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। তখন আমরা দু'জন চিন্তা করলাম, সেখানে গেলে মন্দ হয় না। বেতন-ভাতাও ডাবল পাওয়া যাবে, আবার নতুন একটি দেশও ঘুরে দেখা যাবে।

সেখানে কাজে যোগদান করি। চাকরিটা খুব উপভোগ করতে থাকি। মাঝে মধ্যে ডিনার বা অন্যকোনো কাজে বের হলে হোটেলগুলোর আশপাশে এমন কিছুলোক দেখতে পেতাম, যাদের মাথা খালি, সাদা রঙের চাদর শরীরে জড়ান। আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করতাম, এরা কারা? এভাবে কোথায় যায়? তিনি বলতেন, এরা মুসলিম, এই পাশের শহরেই একটি জায়গায় একটি স্থাপত্য করেছে, যাকে মুসলমানরা 'কাবাশরিফ' বলে। আল্লাহর ঘর হিসেবে বিশ্বাস করে। এরা এই পোশাকে সেখানে এবাদত করার জন্যে যায়। আমি বলি, তাহলে সেই জায়গাটি

দেখা দরকার। চলো না একদিন সেখান থেকে বেড়িয়ে আসি। তিনি বলেন, কিন্তু সেখানে যে মুসলিম ছাড়া অন্যকোনো ধর্মের লোকদের যেতে দেয় না। কথাটা শুনে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। ভাবতে থাকি, কীভাবে কী করা যায়? কারণ, ততোক্ষণে আমার মনের ভেতর সেই জায়গাটি পর্যটন করার জন্যে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। একপর্যায়ে আমার মাথায় একটি পরিকল্পনা চলে আসে। স্বামীকে বলি, আচ্ছা, একটা কাজ করা যাক, আমি মুসলিম মহিলাদের মতো হিজাবঅলা একটি পোশাক কিনি আর তুমি ওদের মতো একটি টুপি মাথায় দাও। তাহলে আর কেউ কিছু মনে করবে না। আর যদি পুলিশ ধরেই ফেলে, তাহলে সেখান থেকেই ফিরে আসবো। আর না ধরলে তো কোনো সমস্যাই নেই। পরিকল্পনা মতো পোশাক পরে একদিন আমরা মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা করি। আমাদের গাড়ি যখন চেক পোস্টে এসে পৌঁছে, তখন সেখানের দায়িত্বরতো পুলিশদের শিফট পরিবর্তন চলছিলো। সেই সুযোগে কোনোরকম বাধা ছাড়াই পার হয়ে যাই। মক্কা নগরীতে গিয়ে লোকজনকে জিজ্ঞেস করি, কাবাশরিফ কোন দিকে? তাদের দেখিয়ে দেয়া পথে অল্পক্ষণেই সেখানে পৌঁছে যাই। জায়গামতো গাড়ি পাকিং করে সরাসরি ঢুকে পড়ি হারামশরিফে। বায়তুল্লাহশরিফের ওপর আমাদের দৃষ্টি পড়ামাত্রই আমরা একদম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরি। সেদিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারি না। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! মনে হতে থাকে যেনো আকাশ থেকে একধরনের আলোর বিচ্ছুরণ এসে পরছে সেই কাবাঘরের ওপর। আর তাওয়াফকারীদের মনে হতে থাকে, তারা যেনো আল্লাহর ফেরেশতা। বিস্ফারিত চোখে আমরা কাবাশরিফের দিকে তাকিয়েই থাকি। কিছুক্ষণ পর যখন আমরা কাকতালীয়ভাবে একই সময় সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দু'জনে দৃষ্টি বিনিময় করি, তখন দেখতে পাই দু'জনের চোখই পুরোপুরি ভেজা আর সেখান থেকে অশ্রু টপকে পরছে। আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে? তিনি আচমকা বলে ওঠেন, its sometlaeing real (ইট্‌স সামথিং রিয়েল) "এটিই খাঁটি সত্য।" আমি বলি, যদি এটিই সত্য হয়, তাহলে তা গ্রহণ করতে বাধা কিসের? দেরি কেনো? আমরা শুধু বায়তুল্লাহর দিকে তাকিয়েছিলাম আর মাত্র একনজর প্রেমের দৃষ্টিতে দেখার কারণে আল্লাহপাক আমাদেরকে ইমানের আলো দান করেছেন।

প্রিয়সুধী! যদি বায়তুল্লাহর ওপর দৃষ্টি দেয়ার কারণে একজন কাফেরকে আল্লাহপাক মুসলমান বানিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমরা ইমানদাররা সেদিকে তাকালে আল্লাহপাক আরও কতো অনুগ্রহ দান করবেন!

এই মুহূর্তে আমরা জীবনের সবচেয়ে সেরা আর খুবই দামি সময় পার করছি। জানি না ভবিষ্যতে কেউ আর এমন সময় পাবো কী পাবো না। তাই এখনও যে সময়টুকু হাতে রয়েছে, তা মাতাফে কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি। যে যে জায়গায় দোয়া কবুল হয়, রাতে সেসব জায়গায় গিয়ে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি।

আল্লাহতায়ালাকে খুশি করি। আল্লাহপাক তো তাঁর বান্দাকে মায়ের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি ভালোবাসেন। তিনি সীমাহীন দয়ালু; কিন্তু আমাদের অযোগ্যতাগুলো আমাদের দোয়ার পায়ে রশি বেঁধে রেখেছে। যার কারণে আমাদের দোয়াগুলো ওপর দিকে উঠতে পারে না।

ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لئے
[হায় আমল লাযেম তাকমীলে তামান্না কে লিয়ে]
ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے
[অরনাহ রঙ্গীন খেয়ালাত সে কিয়া হোতা হায়]
بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے
[বে আমল দিল হো তো জযবাত সে কিয়া হোতা হায়]
دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے
[ধরতী বনজার হো তো বরসাত সে কিয়া হোতা হায়]

মনের চাওয়া করতে পূরণ
আমল করা চাই
নয়তো শুধু চাওয়া দিয়ে
পাবে কী যা চাই!

মনে যদি ফিকির না রয়
আবেগ কিসে লাগে
চাইলে ফসল বৃষ্টি ছাড়াও
মাটির শক্তি লাগে।

তাই আমরা আমাদের হৃদয়ভূমিকে অনুর্বর বানাবো না; বরং নিষ্ঠার সাথে বায়তুল্লাহশরিফের পাশে গিয়ে ধীরস্থিরভাবে শান্ত মেজাজে দু'রাকাত নামাজ আদায় করবো। গোটা জীবনের নামাজ তো শুধু ছুটোছুটির ওপর দিয়ে তাড়াহুড়ো করে সেরে এলাম। হাতে যতোই সময় থাক, কোথাও যাওয়ার কোনো প্রয়োজন না থাকলেও, শরীর সুস্থ থাকা সত্ত্বেও সেজদায় গিয়ে যে ওই তিনবার করে তাসবি পড়া, তাতে আর কোনো বর্ধন টর্ধন নেই। তিনবার পড়ার গড়ে ওঠার অভ্যাস আর পরিবর্তন হবে না; কিন্তু একটু বেশি করে তাসবি পড়ে দেখি না? নামাজে কেমন মজা পাওয়া যায়?

আমি এমন একজন বুজুর্গকে দেখেছি, যিনি প্রত্যেক নামাজের (নফল) প্রতি সেজদায় একুশবার করে তাসবি পড়তেন। নামাজে তিনি কী যে মজা পেতেন!

আমরাও একটু সেভাবে মাত্র দু'রাকাত নামাজ পড়ে দেখি না এবং তারপর আল্লাহপাকের কাছে বিশেষভাবে দোয়া করবো। তাওয়াফের সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করবো, মুলতাজাম জড়িয়ে ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া করবো, হাজরে আসওয়াদের সামনে বসে দোয়া করবো। কাবাশরিফের দরোজার কাছে,

মাকামেইবরাহিমে, হাতিমের ভেতরে ঢুকে দোয়া করবো।

সোবহানাল্লাহ! আল্লাহপাক আমাদেরকে এতোগুলো দোয়া কবুলের জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যদি আমরা সঠিকপন্থায় দোয়া করতে পারি, তাহলে আল্লাহপাকের তরফ থেকে তা কবুল হতে দেরি হবে না। খাঁটি তওবা করে পরম আন্তরিকতার সাথে দোয়া করবো। আর মাত্র সামান্য কয়েকটি দিন বাকি আছে। আসার সময় অনেক আশা-আকাঙ্খা নিয়ে এসেছিলাম যে, অনেকদিন থাকতে পারবো; কিন্তু আজ হয়রান হয়ে বসে আছি যে, আগামীকালই মদিনাশরিফে রওয়ানা করতে হবে, এরপর সেখান থেকে ফিরে সবাই যার যার মতো করে কেটে পরবে। হাতে সময় খুবই অল্প, তাই এই সময়টুকু দামি মনে করে আমার আল্লাহপাকের কাছে খুবই আত্মা ভরে হৃদয় উজার করে প্রার্থনা করবো আর তাঁর কাছে ফরিয়াদ করে বলবো, হে আল্লাহ–

رہے طلب میں سوار سب ہیں

[রাহে তলব মেঁ সাওয়ার সব হেঁ]

پیا وہ مثل غبار میں ہوں

[পায়া ওহ মেছলে গুবার ম্যাঁয় হোঁ]

تیرے گلستاں میں گل تو سب ہیں

[তেরে গুলিস্তাঁ মেঁ গুল তো সব হেঁ]

بس اک اگر ہے تو خار میں ہوں

[বস এক আগার হায় তো খার ম্যাঁয় হোঁ]

مجھے بھی کچھ فکر آخر ہو

[মুঝে ভী কুছ ফিকর আখের হো]

بہت ہی غفلت شعار میں ہوں

[বহুত হী গাফলত শেআর ম্যাঁয় হোঁ]

رہا میں بے کار زندگی بھر

[রাহা ম্যাঁয়বে কার যিন্দেগী ভর]

بس اب تو مشغول کار میں ہوں

[বস আব তো মাশগুলে কার ম্যাঁয় হোঁ]

گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا

[গের পড় কে এহাঁ পঁহচা মর মর কে উসে পায়া]

چھوٹے نا الٰی اب سنگ در جانا ناں
[ছুটে না ইলাহী আব সঙ্গে দর জানা নাঁ]

চাওয়ার পথে আমরা সবাই
আজ হয়েছি সাওয়ার
ধূলোর মতো আছি ভেবে
কী-বা আছে চাওয়ার!

তোমার দয়ার ওই বাগানে
দেখছি সবাই ফুল
আমি কেবল একটি কাঁটা
নই বাগানের ফুল।

আখেরেরই চিন্তা এবার
ধরলো বুঝি জেকে
কিন্তু উদাস মনটাকে আর
কেবা দেবে ডেকে।

জীবন পুরোই নষ্ট হলো
কাটলো বেকার কাজে
মনটা এবার ঠিক করেছি
লাগবো এবার কাজে।

হোঁচট খেয়ে কতোখানে
এলাম তাঁরি কাছে
জীবন দিতে তাঁর নামেতে
এলাম তাঁরি কাছে।

হে আল্লাহ! বহু দূর-দূরান্ত থেকে অনেক দেরিতে এসেছি, তোমার দরোজার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে বলছি, হে আল্লাহ! তোমাকে খুশি করার জন্যে এসেছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পাপগুলোকে সোয়াবে পরিণত করে দিতে পুরোপুরি সামর্থ্যবান। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দোয়া কবুল করে নাও। আমাদের এই সফরকে সফলতা লাভের উসিলা বানিয়ে দাও! আমিন!!

আল্লাহর পুরস্কার

হজের উদ্দেশ্য

আল্লাহপাকের সাথে তাঁর সব বান্দারই ভালোবাসার সম্পর্ক আছে। যে কালেমা তাইয়েবা পড়েছে, তার সাথে তো আল্লাহপাকের ভালোবাসা অবশ্যই রয়েছে। কারো কম, কারো একটু বেশি; কিন্তু যারা পূর্ণাঙ্গ মোমিন, তাদের পরিচয়ই হলো (কোরআনের ভাষায়)–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

"আর যারা ইমান এনেছে, আল্লাহর জন্যে তাদের অপরিসীম প্রগাঢ় ভালোবাসা।"

তারা আল্লাহপাকের সাথে চুটিয়ে পিরিত করে। হৃদয়ের গভীর থেকে প্রভুকে ভালোবাসে। ভালোবাসা দিয়ে যখন কোনো কাজ করা হয়, তখন তাতে এক অপার্থিব স্বাদ আর প্রশান্তি পাওয়া যায়। হজ ও ওমরার আমল (কাজ) আমরা একমাত্র আল্লাহপাকের খুশির উদ্দেশ্যে করা দরকার। যেমনটি তিনি নিজেই পবিত্রকোরআনে বলেছেন–

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

"তোমরা হজ ও ওমরা একমাত্র আল্লাহর জন্যে পালন করো।"

তাঁকে খুশি করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে একটি দর্শন মনে রাখবেন, যখনই কেউ তার প্রিয়তমার কাছে তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে, তাকে ভালোবাসে বলে দাবি করে, তখন সে তার দাবিকে যাচাই বাছাই করে, তার দাবি আর ভালোবাসার সত্যতা ও গভীরতা মেপে জোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাজিয়ে দেখেন।

মোমিনের পরীক্ষা

প্রধানত দু'ভাবে মোমিনের পরীক্ষা নেয়া হয়, একটি অর্থনৈতিক (ধন-সম্পদের), অন্যটি জীবন বা প্রাণসংক্রান্ত। মোমিনের অর্থনৈতিক পরীক্ষা নেয়ার সময় প্রধানত রজব ও শাবান মাস। অবশ্য অন্যসময়েও তা নেয়া যায়। মোমিনদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা তোমাদের সম্পদের জাকাত আদায় করে দাও। যেসব মোমিন সঠিকভাবে হিসাব করে জাকাত আদায় করে দেবে, তারা যেনো প্রথমপত্র পরীক্ষায় পাস করে গেলো। বাকি থাকলো ২য়পত্র। এই ২য়পত্রে পরীক্ষা নেয়া হবে জীবন ও প্রাণ বিষয়ে। যেখানে প্র্যাকটিক্যালও করতে হবে। এই ২য়পত্রের পরীক্ষাসূচি ঘোষণা করা হয়েছে রমজান মাসে। রমজান মাসে ২য়পত্রের পরীক্ষা নেয়া হয়। সেই পরীক্ষার ধরন আর নিয়ম হচ্ছে, রমজান মাসের দিনের বেলায় (সোবহেসাদিক থেকে সন্ধা পর্যন্ত) কোনো ধরনের পানাহার করা যাবে না। স্বামী স্ত্রীর মিলনও ঘটানো যাবে না। যেকোনো উপায়ে যৌনোচাহিদা পুরো করা যাবে না; হারাম পন্থায় তো নয়ই; বরং অন্যসময় যেসব কাজ বৈধো ছিলো, রমজানে সেসবের ওপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। তাই যেসব মোমিন গোটা রমজান মাস রোজা রাখবে, তারা ২য়পত্রেও পাস করে

যাবে। অর্থাৎ, দু'টি পত্রেই উত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে। আর পরীক্ষায় পাস করলে তাকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীকে আল্লাহপাক পুরস্কার দেয়ার জন্যে তার রাজভবনে আমন্ত্রণ জানান। যেখানে তাদেরকে পুরস্কার দেয়ার পাশাপাশি বিশেষ সংবর্ধনাও দেয়া হয়।

পুরস্কারের মাস

আমাদের বুজুর্গানেকেরাম সংক্ষেপে এভাবে বলেন, রমজানুলমোবারক হচ্ছে শ্রম বিনিয়োগের মাস আর জিলহজ হচ্ছে পারিতোষিক বা পুরস্কার প্রদানের মাস। অর্থাৎ, রমজান হলো এবাদতের মাস আর জিলহজ মাস হচ্ছে হজের মাধ্যমে আল্লাহপাকের কাছ থেকে বিনিময় বা পুরস্কার নেয়ার মাস। তাই রমজান মাস শেষ হওয়ার পরের মাস থেকেই (ইচ্ছে করলে এহরাম বাঁধা যায়) আল্লাহপাক তাঁর বান্দাদেরকে নিজ ঘরের দিকে ডাকেন। বলেন, এসো, এসো আমার ঘরের দিকে। এখান থেকেই আমার তাজাল্লি (দ্যুতি) লাভ করতে পারবে, আমার সন্তুষ্টি লাভ করবে।

প্রেম-উন্মাদনার সফর

এ হজের সফরকে বলা হয় এশক ও মাস্তির সফর, প্রেম-উন্মাদনার সফর। কোনো প্রেমিক যেমন তার প্রেমিকার সাথে দেখা করার জন্যে তার সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশে যায়, সে সময় তার অন্তরে প্রবল আশা, তীব্র আকাঙ্খা, প্রচণ্ড বাসনা, গভীর ইচ্ছে দোলা দিয়ে যায়। কল্পনার ক্যানভাসে কতো ছবি আঁকে–আমি এভাবে দেখা করবো, এভাবে পাশে দাঁড়াবো, এভাবে হাতে হাত রেখে এগিয়ে গিয়ে কোমল দুর্বা ঘাসের ওপর বসে এভাবে আলাপ করবো, এভাবে হারিয়ে যাবো একে অন্যের ভেতর। ঠিক তেমনি এমন আবেগ আর আগ্রহ নিয়ে মোমিনরা হজের সফর করে। তাই এটিকে বলা হয় আশেকানা সফর, প্রেমপূর্ণ যাত্রা। আপনারা দেখে থাকবেন, যেসব প্রেমিক প্রেমের চূড়ান্ত পাগলামি পর্যায়ে পৌঁছে যায়, একদম মজনু হয়ে যায়, তাদের কোনো কিছুরই খবর থাকে না। ভালো সাজগোছ আর সুন্দর পোশাকের দিকে ভ্রুক্ষেপ থাকে না। একদম সাদামাটা পোশাকেই তার প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে ছুটে চলে। তেমনি আল্লাহপাকও তাঁর বান্দাকে হজের সফরের জন্যে নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন, কোনো সাজগোছ চলবে না, শুধু সাদা দু'টি কাপড় শরীরে জড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে, তাও আবার সেলাইবিহীন। তাছাড়া অন্যকোনো সৌন্দর্য বহনকারী কিছু ব্যবহার করা যাবে না। খোশবু তেল, সাবান লাগানো যাবে না। এমনকি শরীরের চুল গোঁফ নখ কিছুই কেটে পরিপাটি করা যাবে না। এসব কিছু পরিহার করে আসাকেই আশেকানা সফর বলে, প্রেমপূর্ণ ভালোবাসার যাত্রা বলে, যেভাবে প্রকৃত প্রেমিকরা তাদের প্রেমিকাদের সাথে চূড়ান্ত সাক্ষাতের জন্যে গিয়ে থাকে, সে সময় অন্যকোনো দিকে মনোযোগ থাকে না। কারও দিকে খেয়াল থাকে না।

কারও সাথে ঝগড়া বাঁধানো বা কাউকে কটুবাক্য বলার মানসিকতা থাকে না। অন্যকারও রূপ-সৌন্দর্যের দিকে কামুক চোখে তাকানো বা কারও প্রেমে জড়িয়ে পড়ায় আগ্রহ থাকে না, তেমনি এই মৌলিক তিনটি কাজ বা অপরাধের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে আল্লাহপাক হজকারীদের লক্ষ্য করে বলেছেন–

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

"আর হজের মাঝে (সময়) যৌনোসংক্রান্ত পাপ, শরিয়ত লঙ্ঘনীয় কাজ আর বিশৃঙ্খলা সম্পর্কীয় অন্যায় কোনো কাজ নেই (করা যাবে না)।"

এখানে রাফাস, ফুসুক আর জিদাল শব্দ তিনটি ব্যবহার করা হয়েছে। রাফাস বলে, যৌনোতাসংশ্লিষ্ট সবধরনের পাপ, যেমন, কারও দিকে কুদৃষ্টি, কুকল্পনা, কুপ্রস্তাব দেয়া ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। আর ফুসুক বলে, শরিয়ত নির্দেশিত আমল লংঘনের কথা বলা হয়েছে। যেমন, হজে গিয়েও নামাজ না পড়া, হারাম মাল খাওয়া ইত্যাদি আর জিদাল বলে, নির্দেশ দেয়া হয়েছে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী। পরস্পরে বিবাদ সৃষ্টিকারী কাজ পরিহার করার প্রতি, যেমন, কাউকে গালি দেয়া, কটুকথা বলা, একজনকে জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসা, ইত্যাদি। এসব কাজ শুধু তারাই করতে পারে, যারা ভেতরে ভেতরে নিজে নিজেকে মেরে ফেলে।

জানা গেলো, আল্লাহপাক বলছেন, তোমরা আমার ঘরে আসার সময় নিজেদের রিপুকে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করো, নিজের আমিত্বকে এভাবে দমন করো, যেমন কোনো অন্ধ লোক নিজেকে দুনিয়ার সবধরনের ঝামেলা থেকে গুটিয়ে রাখে। তোমরাও দুনিয়া থেকে তোমাদের মানোযোগ সরিয়ে রাখো। কেউ যদি তোমাদের সাথে বাড়াবাড়িই করে বসে, তবুও তা হাসিমুখে সহ্য করে যাও। এদিক ওদিক কোনো কিছুর দিকে তাকাতে যাবে না। চোখ তুলেও তাকাবে না। কারণ, তোমাদের উদ্দেশ্য তো অন্যকিছু, তোমরা যদি এই তিনটি পাপের কাজ থেকে বিরত থাকতে পারো আর সুন্দরভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে হজের সব কাজ শেষ করতে পারো, তাহলে সেটি তোমাদের জন্যে হজ্জেমাবরুর হিসেবে গণ্য হবে, যাকে বলা হয় কবুল হজ।

হাদিসশরিফে এসেছে, এই মাবরুর হজ শেষ করা লোক সদ্যজাত নিস্পাপ শিশুর মতো (পাপমুক্ত হয়ে) বাড়িতে ফিরে আসে। এজন্যে সবাইকে চেষ্টা করতে হবে, তাদের হজ যেনো মাবরুর হজ হয়। এজন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। তবেই সফল হবে এশক ও উন্মাদনার সফর।

প্রেমপূর্ণ আমল

হজব্রত পালন প্রকৃতপক্ষে খোদাপ্রেমের চূড়ান্ত সিঁড়ি। এর মাধ্যমেই বান্দা তার প্রেমের চূড়ান্ত পাওনা আদায় করে সর্বশেষ আকাঙ্খা মিটায়। প্রেমিকার সাথে প্রেমিকের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটার ক্ষেত্রে যেমন কিছু করণীয় থাকে, কিছু পর্ব শেষ

করতে হয়, তেমনি খোদাপ্রেমের চূড়ান্ত পর্যায়ের পর্বগুলো সম্পন্ন হয় এই হজের মাধ্যমে। এটি হচ্ছে দুনিয়াতে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের রূপক মহড়া, দুনিয়ার প্রেমিক যেমন তার ভালোবাসার মানুষের সাথে সাক্ষাতের সময় প্রথম মোসাফা সেরে হাতে ভালোবাসার চুমু এঁকে দেয়, তেমনি আল্লাহপাকও বান্দার জন্যে তাঁর হাতে চুমু খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, হাজরে আসওয়াদ তার ডান হাত। তাই তাওয়াফ শুরু করার আগে তাতে চুমু দিতে হয়। তার মানে, বান্দা গিয়ে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাত করে। দুনিয়ার নিয়ম হলো, প্রিয়জনের সাথে দেখা করে মোসাফার পর আবার মোয়ানাকা (কোলাকুলি) করা হয়। তেমনি হাজিরা কাবাশরিফের মুলতাজামের সাথে জড়িয়ে যায়। যেনো তারা আল্লাহর সাথে মোয়ানাকা (কোলাকুলি) করছে। হাদিসশরিফে এসেছে, যে মুলতাজাম জড়িয়ে ধরে দোয়া করবে, সে যেনো আল্লাহপাকের সাথেই মোয়ানাকা (কোলাকুলি) করলো। কাবাশরিফের গেলাফ ধরা মানে তার মালিক আল্লাহপাকের আঁচল ধরেই ফরিয়াদ করার শামিল।

এরপর পতঙ্গপাল যেভাবে বাতির চারপাশে প্রদক্ষিণ করে, সেভাবে মোমিনদেরকেও কাবাশরিফের চারপাশে প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে তাওয়াফকালে তারা আল্লাহর সাথে প্রেমালাপ করতে থাকবে। বলতে থাকবে, لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ (তোমার দরবারে হাজির হে প্রভু, হাজির...!)। বার বার মনে করিয়ে দেয়া হেয়েছে, তোমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো, সবকিছু ছেড়ে সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহপাকের দিকে মনোযোগী হয়ে বলা—লাব্বাই লাব্বাইক.. আমি হাজির তোমার দরবারে, হাজির হে প্রভু, হাজির...!

শরিয়তের সৌন্দর্য

মোমিনরা এখানে এসে তাওয়াফ করে, অন্যান্য এবাদত করে, এরপর সবাইকে আরাফার ময়দানে গিয়ে কিছুসময় অবস্থান করতে হয়। যেটি হজ সম্পাদনের প্রধান একটি ফরজ কাজ। এটি ছাড়া, উকুফে আরাফা ছাড়া হজ আদায় হয় না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখুন, শরিয়তের সৌন্দর্য কেমন? শরিয়ত যদি ফরজ করে দিয়ে বলতো, আরাফার ময়দানে দু'রাকাত নামাজ আদায় করতে হবে, তাহলে সেটি ভীষণ কষ্টকর হয়ে যেতো। অসম্ভব হয়ে পরতো অনেকের হজ পালন করা। কারণ, বহু মহিলা হাজার হাজার টাকা খরচ করে এখানে আসার পর হয়তো দেখা গেলো সে আর নামাজ পড়ার যোগ্য নেই। ফলে তার সবকিছু বৃথা যাবে, হজ পালন থেকে বঞ্চিত রয়ে যাবে। অনেক বুড়ো মানুষের দেখা গেলো জামাতের সময় ওজু ভেঙ্গে গেলো, তাহলে তাকেও হজ পুরো করা থেকে বঞ্চিত থেকে যেতে হবে। আল্লাহপাকের দয়া দেখুন আর শরিয়তের সৌন্দর্যের দিকে খেয়াল করুন, মানুষের জন্যে কতো সহজ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কেউ জিলহজের ৯ তারিখে বেলা গড়িয়ে যাওয়ার পর থেকে

সূর্যাস্ত পর্যন্ত যেকোনো সময় আরাফার ময়দানে হাজির হতে পারলেই তার ফরজ আদায় হয়ে যাবে, হজ সম্পন্ন হবে।

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, হে রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]! হজ কী জিনিসি? জবাবে তিনি বলেছিলেন–

اَلْحَجُّ اَلْعَرَفَةُ

"আরাফার ময়দানে হাজির হওয়াটাই মূল হজ। প্রধান ফরজ।"

কেমন দয়া করুণাময় আল্লাহপাকের, আমাদের মতো দুর্বল অধমদেরকেও আজ এই আরাফার ময়দানে হাজির হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আজকের দিনে মহান আল্লাহপাকের রহমতের ভরা যৌবনকাল। কারণ, এটি ছিলো প্রেমের সফর।

একটি সূক্ষ্মদিক

তাওয়াফে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তাওয়াফ করতে হয় ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। যাতে মানুষের মন সবসময় কাবার কাছে থাকে। না হয় সাধারণভাবে মানুষ ঘড়ির মতো বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘুরে; কিন্তু তাওয়াফে এর উল্টো। এমনটি করার কারণ? কারণ একটাই। আল্লাহ বলেন, যাতে তাওয়াফের সময় তোমাদের মন কাবার কাছে থাকে। আল্লাহপ্রেমের কেমন মজা!

সাক্ষাতকেন্দ্র

আল্লাহপাকের তরফ থেকে তাঁর বান্দার ওপর কী পরিমাণ রহমত, কী পরিমাণ দয়া ঝরে তা বলে শেষ করা যাবে না। গোটা পৃথিবীর প্রতিটি দেশের নানান জাতি বর্ণ ও গোত্রের আল্লাহপ্রেমিক মানুষগুলো আজ এই আরাফার ময়দানে হাজির হয়েছে। মনে করতে পারেন এটি আল্লাহপাকের প্রধান সাক্ষাতকেন্দ্র। এই সাক্ষাতকেন্দ্রে আজ আমরা সবাই অপেক্ষা করছি। আমরা সবাই তাঁর সাক্ষাতপ্রত্যাশী, তাঁর ভালোবাসাপ্রার্থী। এই সাক্ষাতকেন্দ্রে আল্লাহপাক আজ আমাদের সমবেত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। হাজির করেছেন। মানুষ যার কামনা করে, (কবি বলেন)–

سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا

[সুনা কাল তেরে দর পর হুজুমে আশেকাঁ হোগা]

اجازت ہو تو آکر میں بھی شامل ان میں ہو جاوں

[এজাযত হো তো আকর ম্যাঁয় ভী শামেল উন মেঁ হো জাউঁ]

কালকে না-কি তোমার ঘরে

করতে হয়, তেমনি খোদাপ্রেমের চূড়ান্ত পর্যায়ের পর্বগুলো সম্পন্ন হয় এই হজের মাধ্যমে। এটি হচ্ছে দুনিয়াতে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের রূপক মহড়া, দুনিয়ার প্রেমিক যেমন তার ভালোবাসার মানুষের সাথে সাক্ষাতের সময় প্রথম মোসাফা সেরে হাতে ভালোবাসার চুমু এঁকে দেয়, তেমনি আল্লাহপাকও বান্দার জন্যে তাঁর হাতে চুমু খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, হাজরে আসওয়াদ তার ডান হাত। তাই তাওয়াফ শুরু করার আগে তাতে চুমু দিতে হয়। তার মানে, বান্দা গিয়ে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাত করে। দুনিয়ার নিয়ম হলো, প্রিয়জনের সাথে দেখা করে মোসাফার পর আবার মোয়ানাকা (কোলাকুলি) করা হয়। তেমনি হাজিরা কাবাশরিফের মুলতাজামের সাথে জড়িয়ে যায়। যেনো তারা আল্লাহর সাথে মোয়ানাকা (কোলাকুলি) করছে। হাদিসশরিফে এসেছে, যে মুলতাজাম জড়িয়ে ধরে দোয়া করবে, সে যেনো আল্লাহপাকের সাথেই মোয়ানাকা (কোলাকুলি) করলো। কাবাশরিফের গেলাফ ধরা মানে তার মালিক আল্লাহপাকের আঁচল ধরেই ফরিয়াদ করার শামিল।

এরপর পতঙ্গপাল যেভাবে বাতির চারপাশে প্রদক্ষিণ করে, সেভাবে মোমিনদেরকেও কাবাশরিফের চারপাশে প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে তাওয়াফকালে তারা আল্লাহর সাথে প্রেমালাপ করতে থাকবে। বলতে থাকবে, لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ (তোমার দরবারে হাজির হে প্রভু, হাজির...!)। বার বার মনে করিয়ে দেয়া হেয়েছে, তোমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো, সবকিছু ছেড়ে সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহপাকের দিকে মনোযোগী হয়ে বলা–লাব্বাই লাব্বাইক.. আমি হাজির তোমার দরবারে, হাজির হে প্রভু, হাজির...!

শরিয়তের সৌন্দর্য

মোমিনরা এখানে এসে তাওয়াফ করে, অন্যান্য এবাদত করে, এরপর সবাইকে আরাফার ময়দানে গিয়ে কিছুসময় অবস্থান করতে হয়। যেটি হজ সম্পাদনের প্রধান একটি ফরজ কাজ। এটি ছাড়া, উকুফে আরাফা ছাড়া হজ আদায় হয় না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখুন, শরিয়তের সৌন্দর্য কেমন? শরিয়ত যদি ফরজ করে দিয়ে বলতো, আরাফার ময়দানে দু'রাকাত নামাজ আদায় করতে হবে, তাহলে সেটি ভীষণ কষ্টকর হয়ে যেতো। অসম্ভব হয়ে পরতো অনেকের হজ পালন করা। কারণ, বহু মহিলা হাজার হাজার টাকা খরচ করে এখানে আসার পর হয়তো দেখা গেলো সে আর নামাজ পড়ার যোগ্য নেই। ফলে তার সবকিছু বৃথা যাবে, হজ পালন থেকে বঞ্চিত রয়ে যাবে। অনেক বুড়ো মানুষের দেখা গেলো জামাতের সময় ওজু ভেঙ্গে গেলো, তাহলে তাকেও হজ পুরো করা থেকে বঞ্চিত থেকে যেতে হবে। আল্লাহপাকের দয়া দেখুন আর শরিয়তের সৌন্দর্যের দিকে খেয়াল করুন, মানুষের জন্যে কতো সহজ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কেউ জিলহজের ৯ তারিখে বেলা গড়িয়ে যাওয়ার পর থেকে

সূর্যাস্ত পর্যন্ত যেকোনো সময় আরাফার ময়দানে হাজির হতে পারলেই তার ফরজ আদায় হয়ে যাবে, হজ সম্পন্ন হবে।
নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, হে রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]! হজ কী জিনিসি? জবাবে তিনি বলেছিলেন–

اَلْحَجُّ اَلْعَرَفَةُ

"আরাফার ময়দানে হাজির হওয়াটাই মূল হজ। প্রধান ফরজ।"
কেমন দয়া করুণাময় আল্লাহপাকের, আমাদের মতো দুর্বল অধমদেরকেও আজ এই আরাফার ময়দানে হাজির হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আজকের দিনে মহান আল্লাহপাকের রহমতের ভরা যৌবনকাল। কারণ, এটি ছিলো প্রেমের সফর।

একটি সূক্ষ্মদিক

তাওয়াফে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তাওয়াফ করতে হয় ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। যাতে মানুষের মন সবসময় কাবার কাছে থাকে। না হয় সাধারণভাবে মানুষ ঘড়ির মতো বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘুরে; কিন্তু তাওয়াফে এর উল্টো। এমনটি করার কারণ? কারণ একটাই। আল্লাহ বলেন, যাতে তাওয়াফের সময় তোমাদের মন কাবার কাছে থাকে। আল্লাহপ্রেমের কেমন মজা!

সাক্ষাতকেন্দ্র

আল্লাহপাকের তরফ থেকে তাঁর বান্দার ওপর কী পরিমাণ রহমত, কী পরিমাণ দয়া ঝরে তা বলে শেষ করা যাবে না। গোটা পৃথিবীর প্রতিটি দেশের নানান বর্ণ ও গোত্রের আল্লাহপ্রেমিক মানুষগুলো আজ এই আরাফার ময়দানে হয়েছে। মনে করতে পারেন এটি আল্লাহপাকের প্রধান সাক্ষাতকেন্দ্র। সাক্ষাতকেন্দ্রে আজ আমরা সবাই অপেক্ষা করছি। আমরা সবাই তাঁর তপ্রত্যাশী, তাঁর ভালোবাসাপ্রার্থী। এই সাক্ষাতকেন্দ্রে আল্লাহপাক আজ দের সমবেত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। হাজির করেছেন। মানুষ যার না করে, (কবি বলেন)–

سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا
[সুনা কাল তেরে দর পর হুজ্জুমে আশেকাঁ হোগা]

اجازت ہو تو آکر میں بھی شامل ان میں ہو جاوں
[এজাযত হো তো আকর ম্যাঁয় ভী শামেল উন মেঁ হো জাউঁ]
কালকে না-কি তোমার ঘরে

করতে হয়, তেমনি খোদাপ্রেমের চূড়ান্ত পর্যায়ের পর্বগুলো সম্পন্ন হয় এই হজের মাধ্যমে। এটি হচ্ছে দুনিয়াতে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের রূপক মহড়া, দুনিয়ার প্রেমিক যেমন তার ভালোবাসার মানুষের সাথে সাক্ষাতের সময় প্রথম মোসাফা সেরে হাতে ভালোবাসার চুমু এঁকে দেয়, তেমনি আল্লাহপাকও বান্দার জন্যে তাঁর হাতে চুমু খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, হাজরে আসওয়াদ তার ডান হাত। তাই তাওয়াফ শুরু করার আগে তাতে চুমু দিতে হয়। তার মানে, বান্দা গিয়ে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাত করে। দুনিয়ার নিয়ম হলো, প্রিয়জনের সাথে দেখা করে মোসাফার পর আবার মোয়ানাকা (কোলাকুলি) করা হয়। তেমনি হাজিরা কাবাশরিফের মুলতাজামের সাথে জড়িয়ে যায়। যেনো তারা আল্লাহর সাথে মোয়ানাকা (কোলাকুলি) করছে। হাদিসশরিফে এসেছে, যে মুলতাজাম জড়িয়ে ধরে দোয়া করবে, সে যেনো আল্লাহপাকের সাথেই মোয়ানাকা (কোলাকুলি) করলো। কাবাশরিফের গেলাফ ধরা মানে তার মালিক আল্লাহপাকের আঁচল ধরেই ফরিয়াদ করার শামিল।

এরপর পতঙ্গপাল যেভাবে বাতির চারপাশে প্রদক্ষিণ করে, সেভাবে মোমিনদেরকেও কাবাশরিফের চারপাশে প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে তাওয়াফকালে তারা আল্লাহর সাথে প্রেমালাপ করতে থাকবে। বলতে থাকবে, لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ (তোমার দরবারে হাজির হে প্রভু, হাজির...!)। বার বার মনে করিয়ে দেয়া হেয়েছে, তোমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো, সবকিছু ছেড়ে সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহপাকের দিকে মনোযোগী হয়ে বলা–লাব্বাই লাব্বাইক.. আমি হাজির তোমার দরবারে, হাজির হে প্রভু, হাজির...!

শরিয়তের সৌন্দর্য

মোমিনরা এখানে এসে তাওয়াফ করে, অন্যান্য এবাদত করে, এরপর সবাইকে আরাফার ময়দানে গিয়ে কিছুসময় অবস্থান করতে হয়। যেটি হজ সম্পাদনের প্রধান একটি ফরজ কাজ। এটি ছাড়া, উকুফে আরাফা ছাড়া হজ আদায় হয় না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখুন, শরিয়তের সৌন্দর্য কেমন? শরিয়ত যদি ফরজ করে দিয়ে বলতো, আরাফার ময়দানে দু'রাকাত নামাজ আদায় করতে হবে, তাহলে সেটি ভীষণ কষ্টকর হয়ে যেতো। অসম্ভব হয়ে পরতো অনেকের হজ পালন করা। কারণ, বহু মহিলা হাজার হাজার টাকা খরচ করে এখানে আসার পর হয়তো দেখা গেলো সে আর নামাজ পড়ার যোগ্য নেই। ফলে তার সবকিছু বৃথা যাবে, হজ পালন থেকে বঞ্চিত রয়ে যাবে। অনেক বুড়ো মানুষের দেখা গেলো জামাতের সময় ওজু ভেঙ্গে গেলো, তাহলে তাকেও হজ পুরো করা থেকে বঞ্চিত থেকে যেতে হবে। আল্লাহপাকের দয়া দেখুন আর শরিয়তের সৌন্দর্যের দিকে খেয়াল করুন, মানুষের জন্যে কতো সহজ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কেউ জিলহজের ৯ তারিখে বেলা গড়িয়ে যাওয়ার পর থেকে

সূর্যাস্ত পর্যন্ত যেকোনো সময় আরাফার ময়দানে হাজির হতে পারলেই তার ফরজ আদায় হয়ে যাবে, হজ সম্পন্ন হবে।

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, হে রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]! হজ কী জিনিসি? জবাবে তিনি বলেছিলেন–

اَلْحَجُّ اَلْعَرَفَةُ

"আরাফার ময়দানে হাজির হওয়াটাই মূল হজ। প্রধান ফরজ।"

কেমন দয়া করুণাময় আল্লাহপাকের, আমাদের মতো দুর্বল অধমদেরকেও আজ এই আরাফার ময়দানে হাজির হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আজকের দিনে মহান আল্লাহপাকের রহমতের ভরা যৌবনকাল। কারণ, এটি ছিলো প্রেমের সফর।

একটি সূক্ষ্মদিক

তাওয়াফে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তাওয়াফ করতে হয় ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। যাতে মানুষের মন সবসময় কাবার কাছে থাকে। না হয় সাধারণভাবে মানুষ ঘড়ির মতো বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘুরে; কিন্তু তাওয়াফে এর উল্টো। এমনটি করার কারণ? কারণ একটাই। আল্লাহ বলেন, যাতে তাওয়াফের সময় তোমাদের মন কাবার কাছে থাকে। আল্লাহপ্রেমের কেমন মজা!

সাক্ষাতকেন্দ্র

আল্লাহপাকের তরফ থেকে তাঁর বান্দার ওপর কী পরিমাণ রহমত, কী পরিমাণ দয়া ঝরে তা বলে শেষ করা যাবে না। গোটা পৃথিবীর প্রতিটি দেশের নানান জাতি বর্ণ ও গোত্রের আল্লাহপ্রেমিক মানুষগুলো আজ এই আরাফার ময়দানে হাজির হয়েছে। মনে করতে পারেন এটি আল্লাহপাকের প্রধান সাক্ষাতকেন্দ্র। এই সাক্ষাতকেন্দ্রে আজ আমরা সবাই অপেক্ষা করছি। আমরা সবাই তাঁর সাক্ষাতপ্রত্যাশী, তাঁর ভালোবাসাপ্রার্থী। এই সাক্ষাতকেন্দ্রে আল্লাহপাক আজ আমাদের সমবেত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। হাজির করেছেন। মানুষ যার কামনা করে, (কবি বলেন)–

سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا

[সুনা কাল তেরে দর পর হুজুমে আশেকাঁ হোগা]

اجازت ہو تو آکر میں بھی شامل ان میں ہو جاوں

[এজাযত হো তো আকর ম্যাঁয় ভী শামেল উন মেঁ হো জাউঁ]

কালকে না-কি তোমার ঘরে

হবে প্রেমিকমেলা
থাকলে রাজি আমিও তাতে
থাকবো খানিক বেলা।

এখানে আজ আশেকদের ভিড়, প্রেমিকদের জটলা, জানা নেই কতো ধরনের, কতো রকমের, কতো শ্রেণীর নেকবান্দা এখানে হাজির হয়েছে। কতোজন যে কতো বিচিত্র রকমের আমল নিয়ে এসেছে। কেউ এসেছে তার তাহাজুদ নামাজ নিয়ে, কেউ এসেছে তাকওয়া নিয়ে, কেউ এসেছে পবিত্র চরিত্র নিয়ে, কেউ এসেছে হালাল রুজি খেয়ে, এমন হরেক রকমের আমল নিয়ে কতোজন যে হাজির হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। নানাজন নানাভাবে আল্লাহকে খুশি করে অবশেষে এখানে তার বদলা আর পুরস্কার নিতে এসেছে। এককথায়, আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাদের এটি একটি মিলনমেলা।

দোয়া কবুলের সোনালি সুযোগ

এই মহাজনসমুদ্রে আমাদের জন্যে দোয়া কামনা করা, আল্লাহর কাছে চাওয়া খুবই সহজ ব্যাপার। কারণ, কেউ একা একা কিছু চাইলে তার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কা থাকে; কিন্তু অনেক লোক সমবেত হয়ে সম্মিলিতভাবে যখন কোনো কিছু আবেদন করে, তখন তা খুবই দ্রুতো কবুল হয়ে যায়।

একবুজুর্গ সম্মিলিতভাবে দোয়া করার পর বলতেন, আমার দোয়া কবুল হয়ে গেছে! কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলে–হজরত কীভাবে নিশ্চিত হলেন আপনার দোয়া কবুল হয়ে গেছে? তিনি বলতেন, এই ধরো আরাফার ময়দানে সমবেত সব লোক একসাথে যদি কোনো দানশীল লোকের কাছে গিয়ে কিছু আবেদন করে বা মাত্র একটি রিয়াল চায়, তাহলে সেই দানশীল লোক এই বিশাল বাহিনীকে কি খালি হাতে ফিয়ে দিতে পারবে? না পারবে না। তাহলে দয়ার সাগর মহান আল্লাহপাক এতোগুলো মানুষের আবেদন কীভাবে নাকচ করে দেবেন? বরং একজন দুনিয়াদার মানুষের জন্যে একরিয়াল দান করা যতোটা কঠিন, তার চেয়ে হাজার হাজার কোটিগুণ সহজ আল্লাহপাকের কাছে তার বান্দাদের সব গোনাহ মাফ করে দেয়া। তাই এতোগুলো মানুষ যখন সম্মিলিতভাবে আল্লাহপাকের কাছে কোনো কিছুর আবেদন করবে, তখন তিনি তা অবশ্যই কবুল করবেন।

তাই আজ দোয়া কবুল করিয়ে নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ। আজ দয়াময় আল্লাহপাকের বিশেষ রহমত তাঁর বান্দার ওপর ঝরে পড়ে। আজ আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে সাধারণ ক্ষমার দিন। সবার জন্যে আল্লাহপাক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। সরকারও অনেক সময় যেমন (কিছু শর্ত সাপেক্ষে) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে থাকে। যেমন, অনেক সময় বলে, আগামী ১০ তারিখের মধ্যে রিটার্ন জমা দিলে

তাদের আগামী একবছরের সব কর (ট্যাক্স) মাফ করে দেয়া হবে। তেমনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে তাঁর দরবারে ডেকে নিয়ে বলছেন, আজ তোমাদের জন্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলো। আজ যারাই আমার কাছে তওবা করবে, তাদেরকেই চিরতরে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

এমনকি যে যেধরনের আবেদন করবে, তার সেই আবেদনই পুরো করা হবে। আজ সাধারণ ক্ষমার দিন, পুণ্যাত্মাদের যেমন আজ প্রমোশন লাভের (পদন্নোতির) দিন, ঠিক তেমনি আমাদের মতো পাপীদের জন্যে পাপ মোচনেরও দিন। সেসব ভাগ্যবান পুণ্যাত্মার সাথে থাকার কারণে আমাদেরকেও তাদের মতো করে মূল্যায়ন করা হবে।

দেখুন, গমের সাথে রয়ে যাওয়া কাপড় বা ধানের সাথে চলে যাওয়া চিটাও কিন্তু সেই আসল দামেই বেচা হয়ে যায়। অথচো এগুলোকে আলাদাভাবে কেউ পয়সা দিয়ে কেনা তো দূরের কথা, ফ্রি দিলেও নিয়ে যাবে না। তা ছুড়ে ফেলে যাবে। আমাদেরও ঠিক একই অবস্থা। আমরা এককভাবে (আলাদাভাবে) অচল হলেও ভালোদের সাথে মিলে আমরাও আল্লাহপাকের প্রিয়বান্দা হয়ে যেতে পারি, সচল হতে পারি। তাঁদের উসিলায় আমাদের সব পাপ মার্জনা করা হবে। এই আশা বুকে বেঁধে আল্লাহর কাছে আবেদন করে যাবো–"হে খোদা! আমরা তোমার পাপীবান্দা। বহুদূর থেকে অনেক দেরিতে তোমার দরবারে হাজির হয়েছি এবং একমাত্র তোমার দেয়া শক্তি-সামর্থ্যেই এখানে হাজির হতে পেরেছি। তুমি তোমার ঘরে দয়া করে ডেকে এনেছো বলে আসতে পেরেছি। হে খোদা! দুনিয়ার কোনো মানুষও তো কাউকে তার বাড়ি ডেকে এনে খালি হাতে ফেরত পাঠায় না। তারা কেবল তাদের পছন্দের লোককেই বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে আনে, যাকে পছন্দ করে না, তাকে বাড়িতে ডেকে আনা তো দূরে থাক, পাশের গলিতেও তার ছায়া দেখতে প্রস্তুত থাকে না। তাই আশা করতেই পারি, তুমি আমাদের পছন্দ করো আর পছন্দ করো বলেই এখানে ডেকে এনেছো। তোমার বদান্যতা রক্ষা করে আমাদের ক্ষমা করে দাও। আমাদের দোয়া কবুল করো। আমাদেরকে খালি হাতে বঞ্চিত করে ফিরে দিও না।"

প্রিয়সুধী! আল্লাহপাকও কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। তবে সেজন্যে সবকিছু নির্ভর করে আমাদের চাওয়ার ধরন বা কোয়ালিটির ওপর। আমরা কতোটা ব্যাকুল আর বিনয়ী হয়ে, কতোটা আন্তরিকতা আর আস্থা নিয়ে, কতোটা মুখাপেক্ষি হয়ে দোয়া করছি সেটিই বিবেচ্য বিষয়।

দোয়া কীভাবে কবুল হবে?

সবাই একই ধরনের দোয়া করে, আমরাও তেমনই দোয়া করি, ওলি আল্লাহরাও সেই দোয়াই করেন; কিন্তু তাঁদের দোয়া কবুল হয়, অথচো আমাদের দোয়া কবুল হয় না বলে মনে হয়। কিন্তু তা কেনো?

এর কারণ হলো, আমরা যখন কিছু চাই, তখন আমাদের অন্তর অন্যবস্তু থেকে

মুক্ত থাকে না, আমরা আল্লাহর কাছে চাইতে থাকি আর আমাদের দৃষ্টি পরে থাকে অন্যদিকে, এমন দোয়া-আবেদন আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। মনে রাখবেন, আল্লাহর কাছে কেবল সেই দোয়া আর আবেদনই কবুল হবে, যে দোয়া করার সময়, আবেদন জানানোর সময় আবেদনকারীর মন ব্যাকুল থাকে, আল্লাহর দিকে একশোভাগ ধাবিত ও মনোযোগী থাকে, এভাবে দোয়া করলে আল্লাহপাক তা অবশ্যই কবুল করবেন।

আমরা গোটা বছর শুধু মানুষের কাছে অভিযোগ অনুযোগ দিয়ে থাকি, বলে বেড়াই, আমার মেয়ের বিয়ে আসছে না, ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো চলছে না, ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হচ্ছে না। আমরা তো তাদের কাছে আমাদের অভিযোগ জানাচ্ছি, যাদের কাছে তা খণ্ডানোর ব্যবস্থা নেই, দূর করার সামর্থ্য নেই, তারা নিজেরাই তো নানা পেরেশানিতে জড়িত। সমস্যার কথা যদি বলতেই হয়, তবে তা মহান প্রতিপালকের কাছে বলবো, যিনি সমস্যার সমাধান করতে পারেন, যিনি সবার বিপদাপদ দূর করতে পারেন, আমাদের বরকত দিতে পারেন, সফলতা দিতে পারেন, আমাদের কাঙ্খিত সব চাহিদা মেটাতে পারেন, তাই আমরা আমাদের প্রভুর দরবারে খুব বিনীতভাবে আবেদন জানাবো, চাওয়ার বেলায় কম চাইবো না। কারণ, আমরা তো আমাদের প্রভুর কাছেই চাইবো।

একলোক একবার বসে বসে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছিলো, বলছিলো, হে আল্লাহ! আমাকে এতো হাজার কোটি ডলার দাও, এতো লাখ কোটি পাউন্ড দাও, এতোশতো কোটি রিয়াল দাও...। পাশে থাকা আরেক লোক শুনে বলে, আরে ভাই, এতো হাজার হাজার কোটি ডলার রিয়াল দিয়ে কী করবে? এতো বেশি চাচ্ছো কেনো? সে লোক বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, তাতে তোর কী সমস্যা? আমি কি তোর বাপের কাছে চাচ্ছি? আমি চাচ্ছি আমার আল্লাহর কাছে!

তো চাওয়ার সময় বেশি চাইলে সমস্যা কী? চাইবোই যখন, তখন তা বেশি করেই চাইবো, কম চাইতে যাবো কেনো? আমরা তো মুখাপেক্ষী। অভাবী হয়ে কেনো চাইতে লজ্জা করবো? তাছাড়া আমরা অন্যের কাছে কেনো আমাদের অভিযোগ অনুযোগ তুলে ধরতে যাবো। আমরা চাইবো আল্লাহর কাছে।

একটি জরুরি কথা, দুনিয়ার কারো কাছে চাইলে বড়ো জোড় একবার দেবে, দ্বিতীয়বার চাইলে বিরক্ত হবে, ইতস্তত করবে, তৃতীয়বার চাইতে গেলে নিষেধ করে দেবে; কিন্তু দয়াময় আল্লাহর কাছে একবার চাইলে দেবেন, দ্বিতীয়বার চাইলেও দেবেন, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবারও দেবেন, যতোবার চাইবো, ততবার দেবেন, কোনো বিরক্ত হবেন না। এমনকি বেশি চাইলে আরও খুশি হন, তাঁকে আপনি বন্ধু বানিয়ে নিন। তিনি গর্ব করে বলেন, আমার এই বান্দা আমাকে ছাড়া আর কারো কাছেই কিছু চায় না, তাই এ আমার ওলি, আমার বন্ধু।

আল্লাহপাক যখন এতো বেশি বেশি দিতে পছন্দ করেন, তখন আমাদের বেশি বেশি করে তাঁর কাছে চাইতে সঙ্কোচের কী আছে? তাই দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্তগুলোতে আমরা আল্লাহপাকের কাছে চাইতেই থাকবো। তবে সেই চাওয়ার

আগে এদিক ওদিকে তাকানো থেকে মন ফিরিয়ে নেবো, অন্তরের মাঝে আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ভালোবাসাই বিদ্যমান আছে, যেদিকে হৃদয়ের টান রয়েছে, সেগুলো একেবারে ঝেড়ে ফেলবো, মুছে দেবো।

بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے

[বুতূঁ কো তুড় তাখয়ীল কে হোঁ কেহ পাথর কে]

মনের গড়া মূর্তি ভাঙো
ভাঙো পাথরটারে
মনের যতো প্রার্থনা তোর
বল না খোদার দ্বারে।

যে নাগাদ হৃদয় মূর্তিভূমি বা মন্দির হয়ে থাকবে, সে নাগাদ তার কোনো দোয়াই কবুল হবে না। তাই আজ এই পবিত্র মাহফিল থেকেই অন্যকিছু হতে হৃদয় মুক্ত করে নিই।

تَرَكْتُ اللَّاتَ وَالْعُزّٰى جَمِيْعًا

[তারাকতুল্লা-তা ওয়াল ওয্যা জামীআন]

كَذٰلِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ

[কাযা-লিকা ইয়াফআলুর রজুলুল আ-কীলু]

লাত ও মানাত ত্যাগ করেছি
ত্যাগ করেছি উজ্জাকেও
জ্ঞানের ভারে ঋদ্ধ যারা
ত্যাগ করেছে নফসটাকেও।

এই লাত উজ্জা সব কী? কাকে এই প্রতিমা বলা হয়? আসলে যেসব জিনিস আমাদেরকে শরিয়তবিরোধী কাজে উৎসাহ যোগায়, লিপ্ত করে, সেসব কিছুই এই লাত উজ্জা তথা মূর্তির অন্তর্ভুক্ত। আজ আমরা সেসব মূর্তি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে যখন আল্লাহপাকের দরবারে আঁচল বিছিয়ে দেবো, তখন দেখবেন আল্লাহপাক তা কেমন আগ্রহভরে কবুল করে নেন। আমাদের প্রতি অবশ্যই তাঁর কৃপার দৃষ্টি পরবে।

আরেকটি কথা, আল্লাহর বান্দারা এখানে নেক আমল নিয়ে আসে, কতো ধরনের আর কতো রকমের যে সেসব নেক আমল, তার কোনো ইয়ত্তা নেই; কিন্তু আমরা হলাম আল্লাহপাকের পাপীবান্দা, আমরা পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে এসেছি; কিন্তু তারপরও পরম খুশির কথা আর আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে, আমরা এসেছি আল্লাহপাকের দিকেই, তাঁর দরবারেই, আল্লাহ ছাড়া অন্যকারও দিকে যাওয়াটা হতো সীমাহীন বিপজ্জনক আর চরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। তাই বিষয়টা খুবই আশাব্যঞ্জক আর সৌভাগ্যজনক।

وَفَتْتُ عَلَى الْكَرِيْمِ

[ওয়াফাত্তু আলাল কারীমি]

مِنَ الْاَعْمَالِ وَ الْخَلَفِ سَلِيْمٌ

[মিনাল আ'মা-লি ওয়াল খালাফি সালীমুন]

فَاِنْ زَادَ اَقْبَلَهٗ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

[ফাইন যাদা আকবালাহূ মিন কুল্লি শাইয়িন]

اِذَا كَانَ الْوُفُوْدُ عَلَى الْكَرِيْمِ

[ইযা কানাল উফূদু আলাল কারীমি]

ভাগ্যগুণে দাঁড়িয়ে আমি
মহান দাতার দ্বারে
রসদ ছাড়া খুশি না-কি
যায় রে করা যারে।

সঙ্গে রসদ আনলে না-কি
বেজার তিনি হন
এলে কেউ খালি হাতে
খুশি তিনি হন।

তাই এসেছি খালি হাতে
পেতে তাঁরি দয়া
জীবন আমার ধন্য হবে
পেলে তাঁরি দয়া।

আল্লাহপাক সীমাহীন দানশীল, আমরা সেসব নেক আমল করতে পারিনি, যেগুলো করা দরকার ছিলো; কিন্তু তারপরও এখানে তো হাজির হয়েছি! মহান আল্লাহপাক অবশ্যই কৃপা করবেন। তিনি অপরিসীম দয়ালু। যেখানে আল্লাহপাকের এতো বিশাল পরিমাণ নেকবান্দা তাঁর কাছে আবেদন করছেন, সেখানে তাদের সাথে আমাদের মতো পাপীরা হাত তুললে আমাদের দোয়াও কবুল করে নেয়া হবে তাদের সাথে।

ভালো জনপদে আল্লাহর রহমত!

'বোখারিশরিফ'-এর বর্ণনায় এসেছে, বনিইসরাইলের এককুখ্যাত খুনী ছিলো, একশোজন লোক খুন করার পর তার ভেতর অনুশোচনা সৃষ্টি হয়, তারপর তওবা করার উদ্দেশ্যে একজন আলেমের কাছে রওয়ানা করে; কিন্তু পথেই তার মৃত্যু ঘটে যায়। এরপর রহমতের ও আজাবের ফেরেশতার ভেতর তাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু হয়ে যায়। রহমতের ফেরেশতা বলেন, যেহেতু সে তওবা করার জন্যে রওয়ানা করেছিলো, তাই তাকে আমি জান্নাতে নিয়ে যাবো।

আজাবের ফেরেশতা বলে, যেহেতু সে সিরিয়াল কিলার। একশো লোকের হত্যাকারী, তাছাড়া সে তওবা করেও নি, শুধু নিয়ত করেছিলো মাত্র, তাই তাকে আমি জাহান্নামে নিয়ে যাবো। অবস্থা জাটিল আকার ধারণ করায় শেষ পর্যন্ত তা সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। মানে আল্লাহতায়ালার কাছে তা চলে যায়।
আল্লাহপাক (আগে থেকে সব জানেনই, তারপরও) দু'জনের কাছ থেকে শুনানী শেষে রায় প্রদান করেন। গিয়ে মেপে দেখো, যে জনপদে সে তওবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছিলো, তা তার অকুস্থল থেকে কাছে না দূরে? যেদিকের দূরত্ব কম থাকবে, সেদিকে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। অর্থাৎ, তার গন্তব্যস্থল যদি কাছে হয়, তাহলে জান্নাতে যাবে।
সেখানে গিয়ে মেপে দেখা যায় সে একদম মাঝা মাঝি জায়গায় মারা গেছে, তবে মৃত্যুর সময় লাশটা একটু তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে ছিলো, সেই সামান্য এগিয়ে থাকার কারণে তাকে ক্ষমা করে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।
বোঝা গেলো, নেক লোকের জনপদে আল্লাহর রহমত থাকে। তাই আমরা এই নেক লোকের জনসমুদ্রে (আরাফার ময়দানে) রয়েছি। যেখানে আলেম-ওলামা মুফতি, মোহাদ্দিস, পির-বুজুর্গসহ সব শ্রেণীর ভালো মানুষ সমবেত হয়েছে।
তাই আল্লাহর কাছে বলবো, হে আল্লাহ! আমরা তোমার ভালো লোকের জনপদে হাজির হয়েছি, আমরাও তোমার রহমতের প্রত্যাশী। আমাদের আশা পুরো করো। এরপর দেখবেন আল্লাহপাকের তরফ থেকে আমাদের ওপর কেমন রহমত ঝরে, কতো সহজে আর দ্রুতো আমাদের সব পাপ মার্জনা করে দেন।

আস্থা নিয়ে দোয়া করতে হবে

একটি জিনিস খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, আমরা যদি খাঁটি অন্তরে আজ আল্লাহপাকের কাছে দোয়া করতে পারি, তাহলে অবশ্যই তা তিনি কবুল করে নেবেন। হাদিসশরিফে এসেছে, আল্লাহপাক সেই লোকের ওপর খুবই রাগান্বিত হন, যে আরাফার ময়দানে দোয়া করার পর আবার সংশয় প্রকাশ করে, তার দোয়া কবুল হলো কী-না। এটা তার চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার যে, কেউ কোনো হৃদয়বান দানশীল লোকের কাছে গিয়ে কিছু চাওয়ার পর মনে করে হয়তো কিছু পাওয়া যাবে না এখান থেকে। আর একথা জানার পর সেই দানশীল লোক মনে কেমন কষ্ট পাবেন।
আমরা পৃথিবীর সব দানশীলের প্রভুর দরবারে এসে বসে আছি। তাই এটাতো মাথায় আনাই যাবে না, আমার দোয়া কবুল হবে না। আল্লাহপাক যদি আমাদের দোয়া কবুল না-ই করতেন, তবে আমাদেরকে তাঁর এই দরবারে আনতেনই না। নিয়ে যখন এসেছেনই, এটিই তার প্রমাণ, তিনি অবশ্যই আমাদের দোয়া কবুল করবেন।
এখন দেখার বিষয়, তার ধারণ ক্ষমতা কতো? কার সামর্থ্য কেমন, কে কতোটা পাস করিয়ে নিতে পারে। আল্লাহর কাছে যে যতো বেশি চায়, তার ওপর তিনি ততো বেশি খুশি হন। হাদিসশরিফে এসেছে, যে আল্লাহপাকের কাছে চায় না,

দোয়া করে না, তার ওপর আল্লাহতায়ালা অসন্তুষ্ট হন। আর যে আল্লাহর কাছে চায়, দোয়া করে, তার ওপর তিনি খুব খুশি হন। তাই আজ এই আরাফার ময়দানে আল্লাহপাকের কাছে বেশি বেশি চেয়ে, বেশি বেশি দোয়া করে তাঁকে খুশি করে দেয়ার চেষ্টা করবো। তবে যা-ই চাইবো একান্ত আস্থা নিয়ে চাইবো। গভীর ভালোবাসার সাথে দোয়া করবো; কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমরা চাওয়ার পদ্ধতি জানি না, আমরা এমনভাবে চাই, যেনো আল্লাহকে তা দেয়ার জন্যে অর্ডার করছি। কোনো অফিসের অফিসার বা প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি তার অধীনের লোকদের যেমন অর্ডার করে থাকেন, বলেন, তোমাদের আজ এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, অমুক ব্যাংকে যাবে, অমুক বেতন দেবে অথবা কেউ কোনো কোম্পানির কাছে অর্ডার দেয়, আমাকে এ জিনিস এতোটা দেবেন, ওটা এ পরিমাণ দেবেন।

ঠিক তেমনি আমরা যেনো বসে বসে আল্লাহর কাছে অর্ডার করি, আমার সন্তান নেই, একটি সন্তান দিও, কমসংস্থান নেই, একটি চাকরি দিয়ে দাও। সুন্দর বাড়ি ঘরের ব্যবস্থা করে দাও, টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দাও; কিন্তু এভাবে অর্ডার করলে তো কাজ হবে না, আমাদেরকে ভিখিরি সেজে ব্যাকুলচিত্তে বিনয়ের সাথে কেঁদে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। আপদমস্তক সমর্পণ করে দিতে হবে তাঁর পায়ে। এধরনের মানুষের দোয়া আল্লাহপাক কবুল করে থাকে। তাই আজ আমরা তাঁর কাছে প্রাণ খুলে চাইবো। হৃদয় উজার করে দিয়ে আবেদন জানাবো। অন্যকোনো দিকেই তাকাতে যাবো না যে, কেউ দেখলো কী-না? কারও দেখা না দেখা দিয়ে আমাদের কিছুই এসে যায় না, আমাদের প্রয়োজন চাওয়ার, চাইতে থাকবো ছোট্টো শিশুর মতো। ছোটো শিশুরা যেমন তাদের মায়ের আঁচল ধরে শুধু মা মা মা করতেই থাকে, মা মা বলে তার কাছে চাইতেই থাকে, এদিক ওদিক চেয়ে দেখে না যে, তার বড়ো ভাই বা বোন তার মা মা শুনছে অথবা তার বাবা দাদা দাদি খালা চাচি অন্যকেউ শুনছে, একমাত্র উদ্দেশ্য তার কাঙ্খিত বস্তুটি মায়ের কাছ থেকে নেয়া বা তার দাবি আদায় করা। তেমনি আমরাও আল্লাহ আল্লাহ বলে আমাদের প্রভুর রহমতের ফোয়ারা নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে নেবো, আশপাশের কারও দিকে তাকাবো না, শুনতে যাবো না কে কী বলছে? কে কে আমাদের আবেদন শুনছে তা দেখতেও যাবো না। আল্লাহপাক আমাদের সুযোগ দিয়েছেন চেয়ে নেয়ার। আমরা আজ আমাদের জীবনের সেরা সময় কাটাচ্ছি, এ অবস্থায় আমরা যদি এদিক ওদিক দেখতে থাকি, মনোযোগ দিতে যাই, তাহলে আমাদের এই মহামূল্যবান সময়টুকু নষ্ট করে ফেলবো। এজন্যে যখন দোয়া করবো, তখন খুব আস্থা ও বিনয়ের সাথে দোয়া করবো। আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট মনে দোয়া করবো, এরপর দেখতে পাবেন, আল্লাহপাক আমাদের ওপর তাঁর কেমন রহমত ঝরান।

আজকাল আল্লাহর কাছে দুনিয়ার ধন-সম্পদ চাওয়ার লোকও অনেক, কেউ বলে, হে আল্লাহ! আমাকে পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ দাও। যাতে করে বাড়ি গাড়ি

করতে পারি। কেউ চাকরি-বাকরি চায়। কেউ সুন্দর জীবনসঙ্গীনী চায়। কেউ পদ-পদবী চায়। কেউ সম্মান-মর্যাদা চায়। এসব দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আর ধন-সম্পদ কামনা করাও দরকার; কিন্তু সবকিছুর ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে একটি জিনিস চাওয়া দরকার আর তা হচ্ছে, আল্লাহপাকের ভালোবাসা, খোদাপ্রেম।

تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں

[তেরে ইশকে ইনতেহা চাহতা হো]

میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں

[মেরে সাদেগি দেখ কিয়া চাহতা হো]

দেখবো আমি প্রেম কারে কয়
কোথায় যে এর শেষ
দেখবি কি মোর সরলতা
কাটবে কি এর রেশ?

এমন প্রেমপূর্ণ হৃদয় আর আল্লাহর ভালোবাসা যদি অর্জিত হয়, তাহলে জীবনের সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে, সেই সাথে আরেকটি প্রার্থনা করবেন, হে দয়াময় আল্লাহ! আমাকে 'মোস্তাজাবুদ দাওয়াত' (যার সব দোয়া কবুল হয়, এমন প্রাজ্ঞ লোক) বানিয়ে দাও। যাতে করে এরপরে আমি যে দোয়াই করবো, তা-ই যেনো কবুল হয়ে যায়। এধরনের দোয়া করলে আল্লাহপাকের রহমত অবিরাম ঝরতে থাকবে।

প্রভুর সাথে সম্পর্ক কেমন হবে?

বর্তমান যুগের মুসলমানদের আল্লাহপাকের সাথে গড়া সম্পর্কটা শুধু আইনি সম্পর্ক। অথচো আল্লাহপাক চান, তাঁর সাথে তার বান্দার জুনুনী (পাগলের মতো) সম্পর্ক গড়ে উঠুক। একটু উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি। আমরা অনেক পরিবারেই দেখতে পাই স্বামী স্ত্রীর মাঝে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে না, গড়ে ওঠে দু'জনের মাঝে জটিলতাপূর্ণ তিক্ততা। বিয়ের বেশ কিছুদিন পর সন্তানাদি হয়ে গেলে সাধারণত সম্পর্কের এমন মোড় নেয় নানান যৌক্তিক কারণে; কিন্তু ততোদিনে আর করার মতো বেশি কিছু থাকে না বলে রসকষ আর প্রেমবিহীন শীতল সম্পর্ক চলতে থাকে তাদের মাঝে। জীবন কাটাতে হয় বলেই জীবনটা কোনোমতে পার করে দেয় দু'জনে। স্বামী কামাই রোজগার করে এনে দেয়, স্ত্রী রান্নাবান্না করে, ঘর-দোর সামলায়, অথচো সপ্তাহ মাসেও কোনো কথাবার্তা হয় না, যেনো রোবটের মতো জীবন কাটায় তারা। সামাজিকতা রক্ষার খাতিরে অনেক সময় অন্যবিয়ে-শাদি বা কোনো অনুষ্ঠানেও অংশ নেয় তারা; কিন্তু হৃদয় দেয়া নেয়া বা প্রেমপূর্ণ দাম্পত্যজীবনের মধুময় সুখ থেকে বঞ্চিত থাকে তারা। এধরনের সম্পর্ককে বলা হয় আইনি সম্পর্ক, হৃদ্যিক সম্পর্ক নয়। স্বামী স্ত্রীর মাঝে প্রেম-ভালোবাসা ভরা রোমান্টিক

সম্পর্ক তাদের মাঝে অনুপস্থিত। যার কারণে একছাদের নিচে থাকতে বাধ্য হলেও একে অন্যের দিকে তাকিয়ে দেখতেও ভালো লাগে না। কাবিননামার কারণে শুধু আইনি সম্পর্কটুকু রয়েছে, হৃদয়ের সম্পর্ক নেই। আর এর বিপরীত একধরনের সম্পর্ক রয়েছে, যাকে বলে জুনুনি বা পাগলামিসম্পর্ক। এই সম্পর্ক যাদের মাঝে আছে, সেসব দম্পতির একজন আরেকজনকে ছাড়া যেনো বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব। স্ত্রী স্বামীর জন্যে খাবার তৈরি করে বসে আছে সেই সন্ধ্যা থেকে, ওভারটাইম করতে গিয়ে স্বামীর ফিরে আসতে রাত দুপর হয়ে যায়, তবুও স্ত্রী স্বামীর জন্যে না খেয়েই অপেক্ষা করতে থাকে। এদিকে বুভুক্ষ স্বামী খিদে নিবারণের জন্যে কিছু শুকনো খাবার কিনে তা মুখে দিতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিয়েছে। এই ভেবে, তার প্রিয়তমা স্ত্রীও হয়তো দানাপানি মুখে না দিয়ে আমার অপেক্ষায় বসে আছে এতোক্ষণ। ফেরার পথে আরও কিছু উপহার কিনে আনে স্ত্রীর জন্যে। অফিসটাইম বাদে বাকি সময়টুকু একত্রে কাটানোর পরও যেনো তাদের হৃদয়ের তৃষ্টা মেটে না। সুযোগ খুঁজে কোনো নির্জন জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার। একান্ত ঘনিষ্টভাবে নিরিবিলি সময় কাটাবার। সেখানে কেউ তাদের ডিস্টার্ব করবে না। এধরনের সম্পর্ককেই বলা হয় খাঁটি সম্পর্ক, গাঢ় প্রেম, পূর্ণ হৃদ্যিক সম্পর্ক।

প্রেমময় আল্লাহপাকও চান আমার সাথে আমার বান্দার এমনই গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হোক; কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আজকাল আল্লাহর সাথে মুসলমানদের সম্পর্কও শুধু আইনি সম্পর্ক। এর প্রমাণ দেখবেন? ঠিক আছে আমাদের নামাজের দিকে একটু খেয়াল করুন, আমরা ফরজ ও ওয়াজিব নামাজের বেলায় চিন্তা করি, যেহেতু আল্লাহর বিধানে (আইনে) নামাজ পড়া আবশ্যক, তাই এটা পড়তে হবে, সুন্নত, নফল এগুলো তো আইন করে আবশ্যক করা হয়নি, তাই এগুলো না পড়লেও চলবে।

চিন্তা করুন, একজন মোমিন যখন এমন করে ভাবতে পারে, তখন আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক শুধু আইনি সম্পর্ক নয় তো কী? এটাকে কি জুনুনি বা আত্মিক সম্পর্ক বলতে পারবেন। আল্লাহর সাথে আত্মিক সম্পর্ক হলে কি কেউ চিন্তা করতে পারে, কোন কোন নামাজ পড়া আইনে বাধ্যতামূলক? না-কি সে চিন্তা করবে, কোন নফল এবাদত বেশি করলে আল্লাহ বেশি খুশি হবেন। তাঁর ভালোবাসা পাওয়া যাবে। আল্লাহপাক তো আরও গভীর সম্পর্ক কামনা করেন। তিনি বলেন, তোমরা আমার সাথে এমন সম্পর্ক গড়ো,

حَتّٰى يُقَالَ اِنَّهٗ مَجْنُوْنٌ

"যাতে করে লোকেরা তোমাকে দেখে বলে পাগল!"

আল্লাহপাক তাঁর বান্দার কাছে এমন জুনুনি বা পাগলামি সম্পর্ক কামনা করেন, তারা যেনো মনপ্রাণ উজাড় করে দিয়ে তাঁকে ভালোবাসে, যার কারণে তার নাম শোনামাত্রই তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে যায়, বিচলিত হয়ে ওঠে।

এজন্যেই আল্লাহপাক পবিত্রকোরআনে বলেছেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

"নিশ্চয়ই (একমাত্র) মোমিন তারাই, যাদের কাছে আল্লাহর জিকির (আলোচনা) করা হলে তাদের অন্তর শিহরিয়ে ওঠে, স্পন্দিত হয়।"

কারও প্রতি যদি কারও গভীর ভালোবাসা থাকে আর তা থাকে গোপন, এমন সময় যদি হঠাৎ করে তার সামনে তার ভালোবাসার মানুষটির নাম নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাহলে তার নাম (কথা) কানে আসার সাথে সাথে সে আঁৎকে ওঠে, শিহরিয়ে ওঠে শিরা-উপশিরা আর স্পন্দিত হতে থাকে তার হৃৎপিণ্ড। তেমনি যার অন্তরে আল্লাহপ্রেম লুকিয়ে থাকে, তার সামনে আল্লাহর নাম আলোচিত হওয়া মাত্রই সে স্পন্দিত হয়ে ওঠে। আল্লাহপাকও চান তাঁর সাথে তাঁর সব বান্দার এমন জুনুনি (আত্মিক) গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠুক।

আল্লাহপাকের সাথে যদি আমাদের এমন গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাহলে আমরা আল্লাহর কাছে যা চাইবো, নিশ্চয়ই আল্লাহপাক নিজ রহমতে তা আমাদের দান করবেন। এই ভালোবাসার দৌলত যদি অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে ধরে নেবেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো অনুগ্রহ আমাদের ভাগ্যে জুটে গেছে।

যদিও আমরা আজ হজ পালন করছি, তাঁর ভালোবাসা কামনা করছি; কিন্তু যেসব শর্ত মেনে তা করা দরকার, তা করছি না, সীমাহীন অমনোযোগী হয়ে উদাসীনভাবে তা করে চলেছি; কিন্তু আল্লাহঅলারা যা করেন, তার ধরন আর পন্থা অনেকটাই ভিন্ন রকম।

আল্লাহঅলারা হজ কীভাবে করেন?

বিশ্ববিখ্যাত বুজুর্গ হজরত শিবলি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর একমুরিদ বেশ কিছুদিন তাঁর খানকায় অনুপস্থিত ছিলো। বহুদিন পর ফিরে এসে যখন শায়েখের সাথে দেখা করে, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন–

শায়েখ: তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে?

মুরিদ: আমি হজব্রত পালন করতে গিয়েছিলাম।

–এদিকে এসো। আচ্ছা, কীভাবে হজ করলে?

:প্রথমে এহরাম বেঁধেছিলাম।

–আচ্ছা, এহরাম বাঁধার আগে যখন পুরনো পোশাক খুলে ফেলছিলে, তখন কি শরীরের পোশাক খোলার সাথে অন্তর থেকে পাপের পোশাকও খুলে ফেলার নিয়ত করেছিলে?

:জি না হজরত, এমন নিয়ত তো করি নি।

–আচ্ছা, এহরামের কাপড় পরার সময় কি তাকওয়ার পোশাক পরার নিয়ত করেছিলে?

:জি না, তা তো করিনি।

–আচ্ছা, তুমি যখন তালবিয়া পড়ছিলে, তখন লাব্বাইক বলার সময় নিজের দেহ-মন নিয়ে নিজেকে আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করেছিলে?

:না হজরত, এমন নিয়ত তো করিনি।

–আচ্ছা বলো, তাওয়াফ করতে গিয়ে হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের সময় প্রিয় আল্লাহপাকের রহমতের হাতে চুমু দেয়ার মজা উপভোগ করতে পেরেছিলে কি?

:জি না হজরত, এধরনের কোনো কিছু তো উপলব্ধি করতে পারিনি!

–যখন মুলতাজাম জড়িয়ে ধরেছিলে, তখন প্রিয় আল্লাহপাকের সাথে মোয়ানাকা (কোলাকুলি) করার প্রশান্তি বা স্বাদ অনুভব করতে পেরেছিলে কি?

:জি না হজরত, এমন কোনো কিছু অনুভব করতে পারিনি তখন।

–আচ্ছা রমল করার সময় فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ (আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার) পরিস্থিতি কি সৃষ্টি হয়েছিলো?

:জি না হজরত, এমন কোনো পরিস্থিতি কখনও সৃষ্টি হয়নি।

–আচ্ছা, আরাফার ময়দানে পৌছার পর তুমি কি আল্লাহপাকের পরিচয় জানতে পেরেছিলে?

:জি না হজরত, তা লাভ করতে পারিনি।

–আচ্ছা, মুজদালেফায় পৌছার পর বান্দার হক আদায় করার ব্যাপারে কি মনে হয়েছিলো তুমি সেগুলো ঠিকমতো করতে পারো নি?

:না, তা হয়নি।

–আচ্ছা, মিনায় এসে শয়তানকে লক্ষ করে কঙ্কর ছোড়ার সময় মন থেকে শয়তানের সাথে পাকাভাবে শত্রুতা পোষণের সংকল্প করেছিলে কি?

:হজরত! এমন কিছুই তো করিনি।

–আচ্ছা কোরবানি করার সময় কি তোমার ভেতরের পশুটিকে জবাই করার নিয়ত করেছিলে কি?

:হজরত, আমি তো এমন নিয়ত কোনো সময়ই করিনি।

–তাওয়াফে জেয়ারতের জন্যে ফিরে আসার সময় কি প্রেমাস্পদ আল্লাহপাকের তাজাল্লি (দ্যুতি) দেখার সৌভাগ্য হয়েছিলো?

:জি না হজরত, এধরনের কোনো কিছু দেখার ভাগ্যে জুটেনি।

–আচ্ছা বাস্তবতা যদি এমনই হয়, আর এসব কিছু তোমার নসিবে না-ই বা জুটে থাকে, তাহলে নিশ্চিত ধরে নাও তুমি কোনো ধরনের হজই করোনি। এখন চলে যাও। আর আমি যেভাবে তোমাকে বুঝালাম, আগামীতে ঠিক সেভাবে ফের হজব্রত পালন করে এসো।

একটু খেয়াল করুন, হজে আল্লাহঅলাদের মনের অবস্থা কেমন হতো? আর আমাদের অবস্থা কেমন? আমরা কাজ করি বটে, তবে যেভাবে তা করা দরকার ছিলো, সেভাবে করতে পারি না। এ জন্যে আল্লাহপাকের দরবারে বেশি বেশি ক্ষমা চাওয়া দরকার। সেই সাথে তাঁর রহমতও কামনা করতে হবে। সাহায্যও চাইতে হবে। জানি না, এই মহামিলনে কতো রকমের আল্লাহপ্রেমিক হাজির আছেন।

হজরত মালেক বিন দিনারের ঘটনা

হজরত মালেক বিন দিনার [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর সেই প্রসিদ্ধ ঘটনাটি আপনারা বহুবার শুনে থাকবেন, আমিও প্রসঙ্গ এলেই তার আলোচনা করি। তিনি বলেন, গ্রীস্মের প্রচণ্ড দাবদাহ চলছে। ঠিক দুপুরবেলা মধ্য গগন থেকে যেনো আগুনবৃষ্টি ঝরছে, বাতাসের সাথে আসছে আগুনের ফুলকি। তীব্র রোদের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পাখিরা গাছের নেতিয়ে পড়া পাতা-পল্লবের আড়ালে লুকিয়ে জীবন বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। জন্তু-জানোয়ারেরা গাছপালার ছায়ায় বা ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করছে তাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ রক্ষার। মাঠের কিষাণ-কিষাণীরা তাদের কাজ-কাম ফেলে আশ্রয় নিয়েছে যে যেখানে পারে কোনো কিছুর আড়ালে আবডালে। বাইরে কোনো কিছুর নাম নিশানা নেই। এমন অস্বাভাবিক দাবদাহ আর প্রচণ্ড রোদের মাঝেই খুবই জরুরি একটি বিশেষ কাজের জন্যে আমাকে বাইরে বের হতে হয়। সূর্যের অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণের মাঝে একবিজন পথ ধরে চলতে শুরু করি। কিছুদূর যাওয়ার পর খেয়াল করি মাটির সাথে হামাগুড়ি দিয়ে একখণ্ড কাঠের মতো কী যেনো এগিয়ে আসছে। কিছুটা কৌতহূলী হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে যাই। কিছুক্ষণ পর সেটি কাছাকাছি চলে এলে বুঝতে পারি ওটি একটি জ্যান্ত মানুষ, তবে সুস্থ সবল পূর্ণাঙ্গ নয়। অর্ধেক দেহের মানুষ। অর্থাৎ, তার দু'টি পা-ই না থাকায় সে দু'হাতে ভর দিয়ে ঘষতে ঘষতে এগিয়ে আসছে অতি কষ্টে। প্রতিবন্ধী মানুষদের ক্ষেত্রে যেমন হয়। খুব কাছাকাছি চলে এলে খেয়াল করি প্রচণ্ড রোদের তেজে তার অপূর্ণাঙ্গ দেহটি ঘেমে নেয়ে একাকার। পুরনো জামাটি পুরোপুরি ভিজে শরীরের সাথে একদম লেপ্টে গেছে। গন গনে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে তার শরীরের চামড়া পুড়ে যেনো তামা হয়ে গেছে। মুখের রঙ বিবর্ণ। তুবুও বিরামহীনভাবে সামনের দিকে শুধু এগিয়েই চলেছে। তার এ করুণ অবস্থা দেখে আমার ভীষণ মায়া হয়। সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, হে তরুণ! তুমি এভাবে রোদ মাথায় নিয়ে কোথায় চলেছো?

সে খুবই শান্তভাবে বিনম্রকণ্ঠে জবাব দেয়, পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে আমি মক্কাশরিফে যাচ্ছি।

বিস্মিত হয়ে বলি, তবে এভাবেই? হ্যাঁ, এই যেভাবে আপনি দেখছেন।

তা যাবে ঠিক, এই সামান্য দূরেই আমার বাসা, সেখানে গিয়ে সামান্য জিরিয়ে নাও। রোদের তেজ কিছুটা কমলে আবার রওয়ানা দিও।

তরুণ বলে, শুকরিয়া, আপনি ঠিকই বলেছেন; কিন্তু আপনাদের সুস্থসবল দেহ, দু'পাও রয়েছে, যার ওপর ভর দিয়ে খুব দ্রুতো হেঁটে যেতে পারেন; কিন্তু আমি একজন পঙ্গুমানুষ, সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধী, দু'হাতে ভর দিয়ে খুব কষ্টে ঘষতে ঘষতে এগুতে হয়। খুবই ধীর গতিতে। যে কারণে আমার অনেক সময় লেগে যাবে।

তা কোথাও দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেয়ার বা কালক্ষেপণের সুযোগ নেই। সময়মতো হারামশরিফে পৌঁছুতে পারবো কী-না, তা নিয়ে সবসময় ভেতরে একধরনের চাপা শঙ্কা কাজ করছে। সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে যদি সময় পার হয়ে যায়, হজ ধরতে না পারি, তাহলে তো আমার সব চেষ্টা বৃথা যাবে, এই ভয়ে কোথাও একমুহূর্ত দাঁড়াচ্ছি না। বিরতি দিচ্ছি না। এই আপনার সাথে কথা বলতে গিয়েও অনেকখানি পিছিয়ে গেলাম।

তার এমন তীব্র আকাঙ্খা আর প্রবল প্রতিজ্ঞা দেখে বিস্মিত হয়ে যাই। বেড়ে যায় তার ওপর স্নেহ ও মমতার মাত্রা। তাকে বলি, তুমি ঠিকই বলেছো। তবে সামান্য একটু দাঁড়াও। আমি তোমার জন্যে একটি দুরন্ত গতির বাহনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। যাতে চড়ে তুমি খুব তাড়াতাড়ি মক্কাশরিফে পৌঁছে যেতে পারবে।

আর যার কোথায়? কথা শেষ না হতেই আমার দিকে আগুনমূর্তিতে তাকিয়ে বলে ওঠে, আমি এতোদিন আপনাকে একজন জ্ঞানী ও চালাক লোক হিসেবেই মনে করে আসছিলাম। হে মালেক বিন দিনার ভেবেছিলাম আপনার মাথায় কিছু বিবেক বুদ্ধি রয়েছে; কিন্তু আজ আপনি আমার এতো দিনের সুধারণা ভুল প্রমাণ করে দিচ্ছেন। এ কেমন কথা বলছেন? আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, কোনো অপরাধী গোলাম তার মনিবকে খুশি করতে যাওয়ার সময় খুবই বিনয়ী হয়ে পায়ে হেঁটে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চায়, না-কি খুব জাকজমকের সাথে আড়ম্বরভাবে কোনো বাহনে চড়ে তার সামনে হাজির হয়? যদি কোনো বোকা গোলাম এমনটি করেও, তবে তার মালিক তাকে কি ক্ষমা করে দেবেন, না-কি এমন দাম্ভিকতার কারণে তার ওপর আরও রুষ্ট হবেন?

সেই ভীষণ উদ্যোমী খোদাপ্রেমী প্রতিবন্ধী তরুণের কথা শুনে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। দাঁড়িয়ে থাকি নির্বাক। এরপর আর কিছু না বলে সে একই অবস্থায় সামনের দিকে এগুতে শুরু করে। আল্লাহর খাস মেহেরবানিতে সে বছর আমারও হজে যাওয়ার সুযোগ হয়। হজের প্রয়োজনীয় কাজ শেষে শয়তানের উদ্দেশ্যে প্রতীকি পাথর ছোড়ার পর খেয়াল করি সামনের দিকে একটি জটলা লেগে গেছে। বেশ কিছু লোক চারদিক থেকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কী যেনো শুনছে। আমিও কিছুটা কৌতূহলী হয়ে সেদিকে এগিয়ে যাই। জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে? কেনো সবাই এখানে এভাবে জটলা পাকিয়ে আছে?

কেউ একজন বলে, একজন তরুণ এখানে আবেগ তাড়িতভাবে উঁচুস্বরে আল্লাহপাকের কাছে ফরিয়াদ করে চলেছে আর কৌতূহলী জনতা তাকে ঘিরে ধরে তা বিমুগ্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছে। এতে আমার কৌতূহলও আরো একটু বেড়ে যায়। ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাই। গিয়ে দেখি একী? এ যে দেখি সেই প্রতিবন্ধী যুবক। সে এহরাম বাঁধা অবস্থায় আকাশের দিকে দু'হাত তুলে ফরিয়াদ করে বলছে, "হে আল্লাহ! তোমার দেয়া শক্তি-সামর্থ্যে আমি তোমার পবিত্র ঘর দেখেছি, বহু কষ্টে আরাফার ময়দানে অবস্থান করেছি। এই মুহূর্তে শয়তানকে লক্ষ করে কঙ্কর ছুড়েও এলাম, এই প্রতিবন্ধী অবস্থায় এখন সামনে রয়েছে

কোরবানির আমল। সামর্থ্যবানেরা তাদের সামর্থ্যমতো তোমাকে খুশি করার উদ্দেশ্যে তোমার নামে পশু কোরবানি করবে; কিন্তু তুমি তো জানো খোদা, আমি একজন নিঃস্ব, অসহায় মানুষ। এই এহরামের কাপড়টুকু ছাড়া আমার কাছে আর অন্যকিছুই নেই। যা দিয়ে তোমার নামে কোরবানি করবো। তবে হ্যাঁ, অন্যজিনিস আছে আমার কাছে তোমার রাস্তায় কোরবানি দেয়ার মতো আর সেটি হচ্ছে তোমার দেয়া আমার প্রাণ-জীবন, এখন সেই প্রাণটিই তোমার কাছে কোরবানি হিসেবে উপস্থাপন করছি, দয়া করে অধমের এই কোরবানিটুকু তুমি খুশি মনে কবুল করে নাও।

এরপর উঁচুস্বরে কালেমা তাইয়েবা পড়তে পড়তে আস্তে করে মাটিতে লুটিয়ে পরে। সাথে সাথে তাঁর কোরবানি কবুল করে নিয়ে তাঁকে নিজের কাছে টেনে নেন মহান রব্বুল আলামিন।

প্রিয়সুধী! এই হজের সমাবেশে এমনও অসংখ্য আল্লাহপ্রেমী এসে থাকে, তাদের যেকোনো একজনের প্রতি আল্লাহপাকের রহমতের দৃষ্টি ঝরলে তার সাথে আমাদের সবার দোয়া কবুল করে নেবেন। তাই এখানে উপস্থিতির ফায়দা অর্জন করা, এই সুযোগ কাজে লাগানো খুবই জরুরি।

আমরা এখানে এসেছি বটে, তবে আমাদের সেসব আমল নেই, যা থাকা দরকার ছিলো। আজ আল্লাহতায়ালার কাছে সেজন্যে ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন, আল্লাহকে খুশি করা জরুরি। অঙ্গীকার করে নিন, আমরা আজ আমাদের প্রভুকে খুশি করে তবেই এখান থেকে উঠবো। কোনো এককবি কতোই না সুন্দর বলেছেন–

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت

[নাহ্ শূদ নসীবে দুশমন কেহ শাওয়াদ হালাকে তিগত]

سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

[সার দোস্তানে সালামত কেহ তু খঞ্জর আজমায়ী]

زمیں چوں سجدہ کردم ز زمیں ندا برآمد

[যমী চোঁ সিজদাহ করদম য-যমী নেদা বর আমুদ]

کہ مرا خراب کردی تو بہ سجدۂ ریائی

[কেহ মুরা খারাব করদী তু বহ সিজদায়ে রিয়াঈ]

بہ طواف کعبہ رفتم بہ حرم حرم نہ دادند

[বতাওয়াফে কা'বাহ রফতম বহরম হরম নাহ দাদান্দ]

بروں چہ کار کردی کہ درون خانہ آئی

[বেরোঁ চেহ কার করদী কেহ দরুন খানাহ আয়ী]

দুশমনেরই ভাগ্যে তো নেই
প্রেম আঘাতে মরা
কারণ তারি জীবনজুড়ে
চলছে এখন খরা।

বন্ধু সেতো নিরাপদেই
থাকবে জীবনভর
কারণ তারি চারপাশেতে
শান্তি বাঁধে ঘর।

আমার মাথা রাখলে পরে
জমিন আমায় বলে
মূর্তিপূজার এই আমলে
মুক্তি পাওয়া চলে?

করতে তাওয়াফ গেলাম আমি
ওই না কাবার দ্বারে
কিন্তু আমায় পথ দিলো না
চাপতে কাবার দ্বারে।

উল্টো আমায় জিজ্ঞাসিলো
কী করেছো কাজ
কেনোই তবে আমার কাছে
আসলে তুমি আজ?

তওবার প্রয়োজনীয়তা

একটু চিন্তা করে দেখি, আমাদের বাড়িতে আমরা কীভাবে জীবন কাটিয়ে এখানে এসেছি এবং আশা রাখছি এখন আমরা আল্লাহপাকের তাজাল্লি (দ্যুতি) লাভ করে ফেলবো? তবে সেজন্যে একটি পন্থা রয়েছে আর তা হচ্ছে, আমরা আমাদের বিগত দিনের খারাপ কাজের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি মনে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। প্রভুর সাথে সন্ধি করে নেবো, পাকা চুক্তি করবো, মজবুত প্রতিজ্ঞা করবো, আগামী দিনগুলো পুরোপুরিভাবে আল্লাহপাকের হুকুম মতো পরিচালিত করার। তাহলে আল্লাহপাক আমাদের প্রতি মেহেরবানি করবেন এবং আমাদের জীবনকে সুখী-সুন্দর বানিয়ে দেবেন, পরকালকেও সুন্দর করবেন। আমাদের আমলগুলো কবুল করে নেবেন। হে আল্লাহ! আমাদের পাল্লায় এমন কিছু নেই, যা আপনার সামনে উপস্থাপন করতে পারি। তবে উপস্থানের মতো একটি জিনিস আছে আর তা হচ্ছে, এই আপনার প্রিয়বান্দাদের সাথে একত্রে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি, নেক লোকের সঙ্গটাই এখন একমাত্র সম্বল। তাদের বরকতে আমাদের হজটাকেও কবুল করে নাও।

এ অবস্থায় আল্লাহপাক অবশ্যই আমাদের প্রতি কৃপা করবেন। কারণ, আবেদনকারী আবেদন করে তার নিজ হিসাব মতো আর দানকারী দিয়ে থাকে তার নিজস্ব হিসাব মতো, নিজের মর্যাদা ও অবস্থান মতো।

একটি ঘটনা

বিশ্ববিখ্যাত দানবীর হাতেম তায়ি সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশি জানি, যার বদান্যতা ও দানশীলতাকে গোটা বিশ্বে উপমা হিসেবে পেশ করা হয়। তার নামটাই দানশীলতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। একবার একভিখিরি তার কাছে পাঁচ দিনার আবেদন করে, তিনি তার কর্মচারীকে নির্দেশ করেন তোকে পাঁচশো দিনার দিয়ে বিদায় করে দিতে। কর্মচারী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, জনাব, তিনি চাইলেন মাত্র পাঁচ দিনার আর আপনি তাকে দিতে বলছেন পাঁচশো দিনার? এটি কেমন কথা হলো? হাতেম তায়ি বলেন, সে চেয়েছে তার ভাণ্ড মতো আর আমি দিতে বলেছি আমার ভাণ্ড মতো।

দেখুন, একজন দুনিয়ার দানশীল লোক যদি পাঁচের জয়গায় পাঁচশো দিতে পারেন, তাহলে মহান আল্লাহপাক তো সীমাহীন দয়ালু। তাই আজ আমরা যে পরিমাণ চাইবো, তিনি তাঁর মর্যাদা মতো তাঁর মতো করে দেবেন। আমাদের কাছে কেউ আবেদন করলে তাকে একরিয়াল দিতে পারবো, কোনো ধনী লোকের কাছে চাইলে তিনি দেবেন হয়তো একশো রিয়াল, মন্ত্রীর কাছে চাইলে তিনি দেবেন পাঁচশো বা হাজার রিয়াল আর কোনো মহাসম্রাটের কাছে চাইলে তিনি দেবেন হয়তো একলাখ রিয়াল। কারণ, সবাই তাদের নিজ মর্যাদা মতো। তাই আমরা আমাদের আঁচল বিছিয়ে দিয়ে বলবো–হে আল্লাহ! আমাদের বহু প্রয়োজন রয়েছে, আপনি আপনার মর্যাদা আর অবস্থান মতো আমাদের দান করুন। আমরা তো চাইতেও জানি না যে, কীভাবে চাইতে হয়; কিন্তু আপনি তো বাকহীনের ভাষাও বুঝেন, তাই না চাইলেও আপনি আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিন। আমাদের সব চাওয়া কবুল করুন। সব আশা পুরো করুন। দেখবেন, তারপর আল্লাহপাকের তরফ থেকে কেমন রহমত ঝরে?

হাজিদের জন্যে সুসংবাদ

বন্ধুরা আমার! সেই লোকের জন্যে কোনো আফসোস নেই, যে মন্দির থেকে বের হয়ে জাহান্নামে যাবে; কিন্তু বড়োই অনুতাপ আর আক্ষেপ তার জন্যে, যে এমন বরকতময় জায়গায় হাজির হয়েও তওবা ছাড়া ফিরে চলে যায়।

আরে আল্লাহপাক তোমাকে কোথায় কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু তুমি তো তার মূল্যায়ন করোনি, তা কাজে লাগাও নি। খাঁটিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করোনি। অনুতপ্ত হয়ে তওবা করোনি। প্রভুর সামনে মাথা নতো করোনি। তাই আমাদের উচিত, আজ আমরা খাঁটি তওবা করে আল্লাহপাকের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবো, আমাদের আগের পাপ মার্জনা করে দাও, আগামীতে আর পাপ করবো না, ভালো কাজ করবো, খোদাভীরুতার জীবনযাপন করবো। সেই সুযোগ আমাদের দাও।

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমাদের মনের যে অবস্থা, পাপের কারণে কালো পাথর হয়ে গেছে, এই কালো শক্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহর

কাছে কী চাইবো? কীভাবে চাইবো আর তা কবুলই বা হবে কতোটুকু? কিন্তু আমাদের এই করুণ অবস্থার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাদের শেষ নবি দোয়া করেছেন। হাদিসশরিফে এসেছে, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] এখানে এসে আল্লাহপাকের কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ! এসব আগত হাজিদের ক্ষমা করে দিও আর হাজিরা অন্যযাদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে দোয়া করবে, তাদেরকেও ক্ষমা করে দিও।

সোবহানাল্লাহ! আল্লাহপাকের প্রিয়বন্ধুর সাথে সম্পর্ক কাজে দেবে। আমরা পাপী তাপী গোনাহগার ঠিকই; কিন্তু আমাদের প্রিয়নবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর দোয়ার সম্পর্ক রয়েছে। তাই আজ আমরা যার জন্যেই ক্ষমার দোয়া করবো, সেই প্রিয়নবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর দোয়ার খাতিরে আমাদেরকেও ক্ষমা করে দেয়া হবে। সেই সাথে অন্য যাদের ক্ষমার জন্যে আমরা দোয়া করবো, দয়াময় আল্লাহতায়ালা তাদেরও ক্ষমা করে দেবেন।

হে খোদা! আমাদের এই উপস্থিতি কবুল করে নাও, হে আমাদের মালিক! তুমি তো আমাদের ভাগ্য জাগ্রত করেছো, কপাল খুলে দিয়েছো। যার কারণে আমাদের মতো এমন সব পাপী লোক এখানে হাজির হতে পেরেছি। যার ওপর তোমার প্রিয়নবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর দোয়ার ছায়া পরেছে। তিনি দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি এখানে আগত হাজিদের ক্ষমা করে দিও আর তাদেরও ক্ষমা করে দিও, যাদের জন্যে এই হাজি সাহেবরা দোয়া করবে।

দৃঢ় আশা রাখা যায়, আল্লাহপাক অবশ্যই আমাদের দোয়া কবুল করবেন। আমাদের হজের আমলগুলো কবুল করবেন এবং তাতে যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে, সেগুলোও ক্ষমা করে দেবেন। সেই সাথে হজ্জেমাবরুর (কবুল হজ) ভাগ্যে জুটিয়ে এখান থেকে ফিরে নিয়ে যাবেন। শুধু তাই নয়, কেয়ামতের দিন সবধরনের লাঞ্ছনা থেকে হেফাজত করবেন।

মনে রাখুন!

প্রিয়বন্ধুরা আমার! মনে রাখবেন, সামান্য দু'-চারজন মানুষের সামনে লাঞ্ছিত অপমানিত হওয়া আমরা সইতে পারি না, সেখানে কেয়ামত দিনের লাঞ্ছনা গঞ্জনা আমরা কীভাবে সইবো? যেখানে অন্যসবার সাথে স্বয়ং নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]ও হাজির থাকবেন। তাই আজই আমরা প্রভুর কাছে খাঁটি তওবা করে তাঁকে খুশি করে নেবো এবং আমাদের বিগত জীবনের সব গোনাহ মাফ করিয়ে নিয়ে ভবিষ্যতে খোদাভীরুতায় ভরা জীবনযাপনের অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা করবো।

হে আল্লাহ! আজকের এই উপস্থিতিকে তুমি কবুল করে নাও আর আগামীতে খোদাভীরুতায় ভরা জীবনযাপনের সুযোগ দাও! আমিন!!

جو یاد مصطفٰی سے دل کو بہلایا نہیں کرتے
[জো ইয়াদে মোস্তফা সে দিল কো বেহলায়া নেহী করতে]
حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے
[হাকীকত মেঁ ওহ লুফতে যিন্দেগী পায়া নেহী করতে]
زباں پر شکوۂ رنج وا لم لایا نہیں کرتے
[যবাঁ পর শিকওয়ায়ে রঞ্জ ও আলাম লায়া নেহী করতে]
نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے
[নবী কে নাম লেওয়া গম সে ঘাবরায়া নেহী করতে]
یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے
[এহ দরবারে মোহাম্মদ হায় এহাঁ মিলতা হায় বিন মাঙ্গে]
ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے
[আরে নাদাঁ এহাঁ দামান কো ফ্যায়লায়া নেহী করতে]
یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا
[এহ দরবারে মোহাম্মদ হায় এহাঁ আপনোঁ কা কিয়া কেহনা]
یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے
[এহাঁ সে হাথ খালী গায়ের ভী জায়া নেহী করতে]
محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا
[মোহাম্মদ আরশ পর পঁহচে তো খোদ খালেক নে ফরমায়া]
یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے
[এহ আপনা ঘর হায় আপনে ঘর মেঁ শরমায়া নেহী করতে]
گنہگاروں کو ہم بخشے گیں تم سے وعدہ کرتے ہیں
[গুনাহগাঁরোঁ কো হাম বখশে গেঁ তুম সে ওয়াদাহ করতে হেঁ]
محمد! ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے
[মোহাম্মদ! হাম কভী ঝুটি কসম খায়া নেহী করতে]

মোহাম্মদের প্রেমে যেজন
ভাসায় নাতো মন
জীবনেরই আসল মজা
পাবে না সেজন।

মুখে যেনো না শোনা যায়
দুঃখ-বিয়োগ ব্যথা
মোহাম্মদি ভয় করে না
দেখে হাজার ব্যথা।

মোহাম্মদের দরবারে ভাই
চাওয়ার আগেই মিলে
খোদার কাছে চাইতে হবে
বিনয়মাখা দিলে।

আপন যারা তাদের কথা
বলবো কী আর ভাই
পরও কভু যায় ফেরত
এখান থেকে ভাই।

নবি যখন খোদার ডাকে
গেলেন আরশ পরে
বলেন খোদা, নিজের ঘরে
কেউ কখনো ডরে!

করবো ক্ষমা সব পাপীকে
করছি আমি পণ
ভয় পেয়ো না ভাঙ্গি না তো
আমি কোনো পণ।

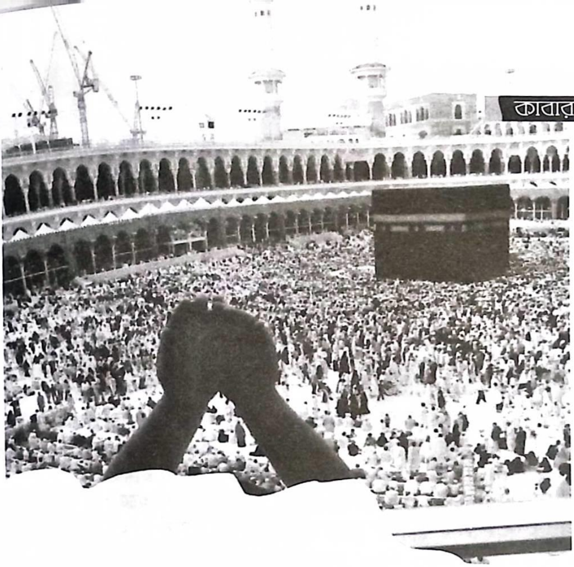

হজ কবুলের চেষ্টা

কষ্ট মাফিক কেষ্ট মিলে

মহান আল্লাহপাক তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তাঁর পবিত্র ঘরে হাজির হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। এই মহতী সফরকে আমরা কতোটুকু ফলপ্রসূ, স্বার্থক ও দামি বানাতে পারবো সেটি আমাদের ওপরই নির্ভরশীল। যতোটুকু চেষ্টা করবো, যে পরিমাণ ত্যাগ ও সাধনা করতে পারবো, সে পরিমাণ এটি স্বার্থক ও দামি হবে। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] হজরত আয়েশা সিদ্দিকা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-কে বলেছিন, তোমার বদলা তোমার কর্মসাধনা মতো দেয়া হবে।

তাই জানা গেলো, মানুষ যতো বেশি চেষ্টা-সাধনা করবে, সে অনুপাতে তাদের হজের সফর সফল ও স্বার্থক হবে। দামি হবে। একটন সোনা একটন রুপা ও একটন পিতল ওজনের দিক থেকে সমপরিমাণ হলেও দামের দিক থেকে এ তিনে রয়েছে বিস্তর ফারাক। আবার একটন লোহা ও মাটির ভেতরও যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। সোনার একদাম, রুপার একদাম, আবার লোহার ও মাটির দাম ভিন্ন। আমাদের হজের ব্যাপারটাও এমনই। আল্লাহপাক কারও হজের দাম ধরবেন সোনার দরে, কাউকে দেবেন রুপার দাম, কারও হজের দাম নির্ধারণ করবেন মাটির সাথে। আবার কারও বা হজের কোনো দামই দেয়া হবে না। তা তাদের মুখের দিকে ছুড়ে মেরে বলবেন, এধরনের হজের আমার কোনোই প্রয়োজন নেই। তাই এদিকে খুব যত্নশীল ও মনোযোগী থাকতে হবে।

শয়াতানের চেষ্টা

শয়তান সবসময় চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে হাজিদের এমনসব অহেতুক ও অবৈধো কাজে জড়িয়ে ফেলতে, যাতে করে তাদের হজ নষ্ট হয়ে যায়।[২] কারও ভেতর ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়, অহেতুক বাক বিতণ্ডতায় লাগিয়ে দেয়। এটার ওপর আপত্তি, ওটাতে অভিযোগ, এটা ভালো হয়নি, এমন খুঁতখুঁতানি স্বভাব তৈরি করে দেয়। গিবত-পরনিন্দায় লাগিয়ে দেয়। তাই এধরনের সব কাজ থেকে দূরে থেকে শুধু ভালো কাজের দিকে মনোযোগী থাকতে হবে। তাহলেই আমাদের হজ মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য হবে।

কিছু সহজ আমল

আজ এমন পাঁচটি আমলের কথা আলোচনা করবো, যেগুলো বাস্তবায়ন করা খুবই সহজ এবং তাতে সোয়াবও অনেক। এমনকি তাদের আমলনামায় সেগুলোর নেকি লিখতে লিখতে ফেরেশতারা ক্লান্ত হয়ে যাবেন। অনেক মহিলা

---

২. এখানে আসার পর শয়তান তাদের হজ না করিয়েই বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে না; বরং সে চেষ্টা করে, এতোসব কষ্ট ও খরচপাতি করার পরও তার হজটা যেনো অকেজো অর্থহীন হয়ে যায় সে জন্যে।–অনুবাদক

এবং কিছু কিছু বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা ওমরা শেষে আর কী করবো? আমাদের কিছু করণীয় (আমল) বলে দিন। আজকের এই মাহফিলে তাদের সেই জিজ্ঞাসার জবাব দেবো।

১. সবার আগে আমরা বেশি বেশি এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করবো। এস্তেগফারের উপকারিতা এতো বেশি, যা আমাদের কল্পনাকেও হার মানায়। নিজের দুর্বলতা, অলসতা, উদাসীনতা আর অমনোযোগিতার প্রতি লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করাকে 'এস্তেগফার' বলে।

হজরত হাসান [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর কাছে একলোক এসে বলে, হজরত! আমি একজন মস্ত বড়ো পাপী, দয়া করে এমন কোনো উপায় বলে দিন, যার মাধ্যমে পাপগুলো মাফ হয়ে যায়। হজরত হাসান [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, এজন্যে বেশি এস্তেগফার করবে। আরেক লোক এসে বলে, হজরত, আমাদের এলাকায় বহুদিন বৃষ্টি হয় না। এমন কোনো আমলের কথা বলে দিন, যার উসিলায় আল্লাহপাক বৃষ্টি দেবেন। তিনি বলেন, বেশি বেশি এস্তেগফার করো। আরেক লোক এসে বলে, হজরত, আমি একজন গরিব অসহায় মানুষ, এমন কোনো আমলের কথা বলে দিন, যার কারণে আল্লাহপাক আমাদের স্বচ্ছলতা দান করবেন। তিনি বলেন, বেশি বেশি এস্তেগফার করতে থাকো। আরেক লোক এসে বলে, হুজুর, আমার কোনো সন্তানাদি নেই, একটি আমলের কথা বলুন, যার বরকতে আল্লাহপাক সন্তান দেবেন। বলেন, বেশি বেশি এস্তেগফার করো। আরেকজন এসে বলে, হুজুর, আমার বাগানে ভালো ফল আসছে না, একটি আমলের কথা বলে দিন, যার কারণে আল্লাহপাক পর্যাপ্ত ফল দান করবেন। তিনি বলেন, বেশি বেশি এস্তেগফার করো। অন্যএকলোক এসে বলে, হজরত, আমাদের এলাকায় মিষ্টি পানির অভাব, এমন একটি আমল বলে দিন, যার বরকতে আল্লাহপাক সুপেয় পানির ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি বলেন, বেশি বেশি এস্তেগফার করো।

তার পাশে বসে বসে একলোক এসব প্রত্যক্ষ করছিলেন, বিস্মিতকণ্ঠে তিনি বলেন, আপনার হাতে তো এক আজব চিকিৎসা রয়েছে। আগত লোকদের প্রয়োজন আর সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবাইকে আপনি একটিই (ওষুধ) সমাধান দিয়ে দিচ্ছেন?

হজরত হাসান [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, দেখো, একথাগুলো আমি নিজের তরফ থেকে দিচ্ছি না, মহান আল্লাহপাক নিজেই এসব সমস্যায় জর্জরিতদের সমাধান দিয়ে দিয়েছেন কোরআনমাজিদে কাকতালীয়ভাবে সেসব সমস্যায় পড়া লোকেরা আজ আমার কাছে এসে পরামর্শ চেয়েছে।

আল্লাহপাক বলেছেন–

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ

"তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও।"

করলে—

إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

"তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন, তিনি ক্ষমাকারী, মহাদয়ালু।"

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا

"আর আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বৃষ্টি ঝরাবেন।"

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِينَ

"আর তোমাদের সহযোগিতা করবেন ধনসম্পদ আর সন্তানাদি দিয়ে।"

وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ

"আর তোমাদের দান করবেন অনেক বাগবাগিচা।"

وَيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا

"আর চালু করে দেবেন তোমাদের জন্যে ঝর্ণা সুপেয় পানি।"

এস্তেগফারের মাধ্যমে এসব অনুগ্রহ লাভের কথা আল্লাহপাক এই আয়াতের ভেতর উল্লেখ করেছেন। আজকাল অনেক মানুষ তাবিজ কবজের জন্যে ফকির কবিরাজদের দ্বারে দ্বারে যে ছুটে বেড়ায়, তাদের বেশিরভাগের মাঝে এসব সমস্যাই ঘুরে বেড়ায়। আমরা যদি বেশি বেশি এস্তেগফার করি, তাহলে আমাদের কারো পেছনেই ছুটে বেড়াতে হবে না। কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে পেরেশান, কেউ পেরেশান ছেলে-সন্তানের জন্যে, কারও সমস্যা আবার অসুখ-বিসুখ। এ সব ধরনের পেরেশানি দূর হবে বেশি বেশি এস্তেগফারের মাধ্যমে। তাই এই বাবার দরবারে, আবার ওই বাবার দুয়ারে ছুটতে ছুটতে জুতার তলা ক্ষয়ে না ফেলে একমাত্র আল্লাহমুখী হয়ে তাঁর নির্দেশ মতো বেশি বেশি এস্তেগফার করতে থাকলে আল্লাহপাক সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। এজন্যে অবশ্য জরুরি গভীরভাবে অনুতপ্ত হয়ে একান্ত মনোযোগের সাথে এস্তেগফার করা, যা সবার জন্যেই জরুরি বটে।

কেউ এমন মনে করবেন না আমি তো একজন নেক আদমি, ভালো ও সৎ মানুষ। আমার আবার এস্তেগফার বা ক্ষমা চাইতে হবে কেনো? আমার কোনো ধরনের এস্তেগফারের দরকার নেই। না সবার জন্যেই এস্তেগফার করা প্রয়োজন, তবে সবাই মূল সমস্যাটাকে প্রাধান্য দিয়ে তা করবে। যেমন, একজন কাফের তার কুফুরির কারণে এস্তেগফার করবে আর মুসলমানদের ভেতর পাপী লোক তার পাপের প্রতি অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে। তওবা এস্তেগফার করবে। যে বড়ো ধরনের পাপকাজে জড়ায় না, তবে অনেকটা উদাসীন থাকে, সে তার উদাসীনতার প্রতি অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইবে। কেউ যদি এমন উদাসীন না হয়, ভেতরে ভেতরে প্ররোচনা জন্মে, তাহলে সে সেই প্ররোচনা বা ওয়াসওয়াসা থেকে তওবা করে এস্তেগফার করবে। এই প্ররোচনা থেকে যেহেতু

কেউ মুক্ত নয়, তাই সবাই কমপক্ষে এই ওয়াসওয়াসা থেকে তওবা-এস্তেগফার করবে। আবার কেউ যদি দাবি করে বলে, আমার ভেতর কোনো ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা কাজ করে না, তাহলে তাকে এস্তেগফার করতে হবে ভেতরে এখলাস (নিষ্ঠা) না থাকার কারণে। কারণ, নিজেকে এমন কুমন্ত্রণা বা ওয়াসওয়াসামুক্ত মনে করা এখলাসে (নিষ্ঠায়) ঘাটতি থাকার প্রমাণ বহন করে। তাই সবাইকে এস্তেগফার করতে হবে, পাপের কোনো না কোনো উপসর্গ সবার ভেতর থাকেই। তাই বোঝা গেলো, কোনো মানুষ যেস্তরেই পৌঁছে যাক না কেনো, যতোই খোদাভীরু হোক না কেনো, তাকে এস্তেগফার করতেই হবে এবং খুবই মনোযোগের সাথে বিনীতভাবে তা করতে হবে। তার একটি সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, সবসময় أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ অন্তর থেকে পড়তে থাকা। এই পড়াটাই যদি কারও পক্ষে পড়তে সমস্যা হয়, তাহলে আপাতত أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ الله পড়তে থাকবে। তাহলেই তার বদলা পেয়ে যাবে। শব্দটা একদম সহজ, তবে মুখে আস্তাগফিরুল্লাহ বলার সময় অবশ্যই তার চোখ কান অন্তর ঠিক থাকতে হবে, এদিক সেদিক করতে পারবে না। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে আবিষ্ঠ থাকতে হবে।

এস্তেগফারের বরকত

এই এস্তেগফার এমন একটি আমল, যার মাধ্যমে মানুষ বালা-মসিবত থেকে উদ্ধার পায়, সব লোকের মনেই এই আকাঙ্খা বিরাজ করে, আমি আল্লাহর আজাব থেকে মুক্তি পাবো। এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে বলে, আমি আল্লাহর আজাবকে পরোয়া করি না (নাউজুবিল্লাহ)। যে এমন কথা বলবে আর যদি তা মন থেকে বলে, তাহলে সে ইমান থেকে বের হয়ে যাবে।

প্রত্যেকের বাসনা

প্রত্যেকেই আল্লাহর আজাব থেকে মুক্তি চায়। আল্লাহপাক বলেন–

مَاكَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

"আল্লাহপাক কখনও সেই জাতিকে আজাব (সাজা) দেবেন না, যাদের মাঝে আপনি অবস্থান করেন।"

وَمَاكَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

"আর আল্লাহপাক তাদেরকেও সাজা দেবেন না, যারা ক্ষমা চায়।"

হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বিদ্যমান না থাকার কারণে আল্লাহর আজাব না নামার সুযোগ আর নেই। তাঁর কারণে আল্লাহর আজাব আটকে থাকার বাধ্য-বাধকতা রহিত হয়ে গেছে। তবে আল্লাহপাকের আজাব ঠেকিয়ে রাখার অন্যউপকরণটি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তার মাধ্যমে আমরা

এখনও আল্লাহর আজাব আটকে দিতে পারি। সেটি হচ্ছে, বেশি বেশি খাঁটি অন্তরে এস্তেগফার করা। নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর জীবদ্দশায় কাফেরসম্প্রদায় দম্ভ করে বড়ো গলায় বলতো, কই, এই এই কাজ করলে বলে আল্লাহর আজাব আসে? তা একটু নিয়ে এসে দেখাও না? কিন্তু শতো নাফরমানি করা সত্ত্বেও তাদের ওপর আল্লাহর আজাব আসতো না।

এ প্রসঙ্গে মুফতি মোহাম্মদ শফি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] তাঁর তাফসিরবইয়ে খুব সুন্দর করে আলোচনা করেছেন। একদিকে দাম্ভিক কাফেররা আল্লাহর আজাবকে আহবান জানিয়ে বলতো, ঠিক আছে, আমরা তোমাকে আল্লাহর নবি হিসেবে স্বীকার করছি না এজন্যে, যদি আজাব আসে তো অ মুক। আগের নবিদের যুগে যেমন আজাব আসতো তেমনি তুমিও তা এনে দেখাও দেখি; কিন্তু এতে তাদের ওপর ব্যাপক বা সাধারণ আজাব অসতো না; কিন্তু কেনো? কী কারণে? তার কারণ হলো, তাদের (কাফেরদের) মাঝে রহমতের নবি বিদ্যমান ছিলেন।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়, তাই যদি হয়, তাহলে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] হিজরত করে মদিনাশরিফে যাওয়ার পরও কেনো মক্কার কাফেরদের মাঝে আল্লাহপাকের আজাব নেমে আসে নি? তার জবাবে তিনি বলেন, হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তাদের মাঝে না থাকলেও দ্বিতীয় কারণে তাদের ওপর আল্লাহর আজাব আসেনি। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এস্তেগফার। কারণ, তখনও মক্কায় অনেক মুসলমান আত্মগোপন করে রয়ে গিয়েছিলেন। যারা সবসময় মহান আল্লাহপাকের কাছে এস্তেগফার করতেন। তাই তাদের কারণে কাফেরদের ওপর আজাব আসেনি।

এরপর আবার প্রশ্ন দেখা দেয়, একপর্যায়ে তো সব মুসলমানই হিজরত করে মদিনায় চলে গেয়েছিলেন, তখন তাহলে ওদের কাফেরদের ওপর আল্লাহর আজাব আসেনি? তার জবাবে তিনি লিখেছেন, হয়তো তখনও গোপনে কোনো ইমানদার রয়েছিলো, তাছাড়া তখনও মক্কায় কাফেররা কাবাশরিফ তাওয়াফ করতো আর তাওয়াফের সময় বলতো–

غُفْرَانَكَ

আর এই 'গুফরনাকা'ও এস্তেগফারের আওতায় পরে। যার খাতিরে হয়তো আল্লাহপাক তাদের আজাব দেননি।

সোবহানাল্লাহ! এস্তেগফারের যখন এমনই প্রভাব যে, আল্লাহর আজাব ঠেকিয়ে দেয়, তখন আমাদের আরো বেশি বেশি এস্তেগফার করা দরকার। আমরা অযথাই কেনো অভিযোগ অনুযোগ করে বেড়াবো, আল্লাহপাক আমার ওপর নারাজ, যার কারণে আমার এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, অমুক হয়েছে? তমুক হয়েছে; কিন্তু আসলে আমরা সঠিক পদ্ধতিতে এস্তেগফার করতে পারি না। যদি তা করতে পারি, তাহলে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কবল থেকে রক্ষা পাবো এবং তার আজাব থেকেও মুক্তি পেয়ে যাবো।

বলছিলাম, সেই পাঁচটি কাজের ভেতর প্রথম কাজটি হচ্ছে, আল্লাহর কাছে বেশি বেশি এস্তেগফার করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা। পবিত্রকোরআনে যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেখানে اِسْتَغْفِرُوْا আদেশসূচক (অনুজ্ঞাবচক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যা আবশ্যিকতা বুঝায়। একটু চিন্তা করে দেখুন, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] ছিলেন পুরোপুরি মাসুম বা নিস্পাপ। একদম পুতঃপবিত্র। আগে পিছের সবধরনের পাপ থেকে আল্লাহপাক তাঁকে হেফাজত করেছেন। বিদায় হজের সময় নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] সব সাহাবার সামনে বলেছিলেন, আমি কি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পেরেছি? সমবেত প্রায় একলাখ চব্বিশ হাজার সাহাবি সাথে সাথে একবাক্যে বলে উঠেছিলেন, হ্যাঁ,

اَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ

"হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই আপনার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব একশোভাগ পালন করেছেন।"

তখন নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] আকাশের দিকে তাকিয়ে আঙুল উঁচিয়ে ধরে বলেছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ

"হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।"

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর এমন সফল ও পূর্ণাঙ্গ জীবনের পরও যখন তিনি সেখান (আরাফার) ময়দান থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন আল্লাহপাকের তরফ থেকে নির্দেশ জারি হয়–

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ. وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ.

"যখন আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য আর মহাবিজয় আসবে, তখন আপনি আল্লাহর তাসবি পড়ুন এবং এস্তেগফার করুন।"

যেখানে স্বয়ং রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে নিস্পাপ হওয়া সত্ত্বেও এস্তেগফার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে আমরা আবার কোন ক্ষেতের গাজর মূলা? কী মূল্য আছে আমাদের? আমাদের তো আরও বেশি বেশি তওবা-এস্তেগফার করা দরকার সবসময়। প্রতিমুহূর্তে আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা দরকার। সে পাঁচ কাজের প্রথমটি হচ্ছে বেশি বেশি এস্তেগফার করা।

ধৈর্য

পাঁচ কাজের দ্বিতীয়টি হচ্ছে ধৈর্য ধরা। আল্লাহপাক এই পৃথিবীকে বলেছে একটি পরীক্ষা কেন্দ্র। অবশ্য পরীক্ষা নানানভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেমন, একটি হলো ছাত্রদের পরীক্ষা। আবার ছাত্রদের সে পরীক্ষাও দু'ভাবে হয়ে থাকে: ১.

শিক্ষকদের (বা বোর্ডের) তরফ থেকে ছাত্রদের কাছে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। সাথে দেয়া উত্তরপত্রে তারা সেসব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়। শিক্ষকরা তা নিয়ে গিয়ে ভালোভাবে মূল্যায়ন করে তাতে প্রাপ্ত নম্বর দিয়ে দেন, এতে কেউ পাস করে, আবার কেউ করে ফেল। আরেক ধরনের পরীক্ষা হচ্ছে, ছাত্রদের নির্দিষ্ট রুমে ডেকে নিয়ে শিক্ষকরা তাদের সরাসরি কিছু প্রশ্ন করেন, তাতে ছাত্রদের তাৎক্ষণিক সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এটিকে ইন্টারভিউ এর আঙ্গিকে মৌখিক পরীক্ষা বলা হয়। আরেকটি পরীক্ষা হচ্ছে, যার কেন্দ্রে আমরা অবস্থান করছি। এর ধরন বুঝার জন্যে কিছুটা ভাবুন। তা এভাবে, আল্লাহতায়ালা বান্দার জীবনে বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে আসেন। কখনো সুখ, কখনো দুঃখ, আবার কখানো দুশ্চিন্তা ও অসুস্থতা। কাউকে ভালোকাজের সুযোগ দিয়ে পরীক্ষা করেন, আবার কাউকে গোনাহের সুযোগ দিয়েও পরীক্ষা করেন। এসব বিচিত্র ধরনের পরিস্থিতি হচ্ছে প্রশ্নপত্র। এসবের সম্মুখীন হয়ে আমরা যে আচরণ করবো, প্রতিক্রিয়া দেখাবো, সেগুলোই হবে তার উত্তরপত্র। আমাদের সেই ক্রিয়াকলাপের মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারিত হবে পাস-ফেল। অপছন্দনীয় কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পর যদি আমরা তাতে ধৈর্য ধরে সন্তুষ্ট থাকি, তাহলে তাতে পাস নম্বর দেয়া হবে। আর যদি তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে কোনো ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য করি, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তাহলে তা ফেল হিসেবে ধরা হবে। আবার আল্লাহপাক যদি কারও সামনে পাপকাজের সুযোগ তৈরি করে দেন; কিন্তু কোনো ধরনের বাইরের প্রতিবন্ধকতা না থাকা সত্ত্বেও যদি সে শুধু আমি আল্লাহকে ভয় করি বলে তা থেকে বিরত থাকে, তাহলে সে গোল্ডেন এ প্লাস নিয়ে পাস করে যাবে। আর যদি সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে বা আল্লাহর ভয় তাকে সে কাজ থেকে বিরত রাখতে না পারে, তাহলে সে ফেল করে বসবে, অকৃতকার্য বলে গণ্য হবে।

তাই আল্লাহপাক কাউকে দিয়ে পরীক্ষা করেন, আবার কাউকে কাউকে না দিয়ে পরীক্ষা করেন। আবার কারও কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এসবগুলোই পরীক্ষা, যদি সামান্য কোনো ব্যাপারেই আমরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বসি, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে, আমরা ভুল উত্তর লিখেছি।

ধৈর্যের সংজ্ঞা

ধৈর্য বলা হয় প্রতিক্রিয়া দেখানোর ক্ষেত্রে সহনশীলতার পরিচয় দেয়া। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করা; বরং ভেবে-চিন্তে, ধীরে-সুস্থে শরিয়ত মতো কাজ করা। একেই বলে সবুর বা ধৈর্য। অথচো আজ আমাদের কী অবস্থা? ছোটো খাটো সামান্য টুকিটাকি বিষয়েই দ্রুতো React (রিয়েক্ট) করে বসি, উত্তেজিত হয়ে প্রতিঘাত করি। মুহূর্তের মধ্যে আত্মীয়তা বা অন্যকোনো গভীর সম্পর্ক পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করতে তৈরি হয়ে যাই। আমাদের জীবনে ধৈর্যহীনতার মাত্রাটা খুবই বেশি। মোহ আর আশা অনেক। এমনকি

লোভের পরিমাণটাও কম নয়। আল্লাহপাক এটা দিক, সেটা দিক, আমরা এমনভাবে চাইতে থাকি যে, গোটা জীবনের জন্যে যা প্রয়োজন, তা একবারেই দিয়ে দিক। অথচো নির্দিষ্ট সময়ের যেসব নামাজ রয়েছে, সেগুলো কিন্তু একসাথেই আদায় করতে পারি না। প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্য ধরা আর অনুকূল অবস্থা বা ভালো সময়ে আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করা এই দু'টি কাজ বান্দার আমলনামায় পাহাড় সমান সোয়াব দিয়ে ভরে দেয়।

আপনি হয়তো বলতে পারেন, আমি তো অনেক শুকরিয়া আদায় করি। না, আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, যে পরিমাণ শুকরিয়া আদায় করা আমাদের প্রয়োজন ছিলো, তা করতে পারি না। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন, প্রত্যেক পছন্দনীয় কাজের জন্যে আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করা, যেমন, সকালে ভালোভাবে ঘুম ভেঙ্গেছে, এটি আল্লাহপাকের একটি অনুগ্রহ ছিলো, এজন্যে কি আমরা আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করেছি? সময়মতো ফজর নামাজ আদায় করতে পেরেছি। এজন্যে কি আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করেছি। আমার স্ত্রী-সন্তানেরা সময়মতো নামাজ পড়তে পেরেছে, সেজন্যে কি শুকরিয়া আদায় করেছি? সময়মতো নাস্তা তৈরি পেয়েছি, এজন্যে কি শুকরিয়া আদায় করেছি? খাওয়ার পর তা সুন্দরভাবে হজম হয়ে গেছে। এজন্যে কি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছি? ঠিক সময়মতো ব্যবসায়িকপ্রতিষ্ঠানে, অফিসে তথা নিজ কর্মস্থলে পৌছতে পেরেছি। সেজন্যে কি আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করেছি? স্ত্রী কোনো সমস্যা করেনি, ছেলে-মেয়েরা কোনো ঝামেলা বা বিরক্ত করেনি। এজন্যে কি আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করেছি? ছেলে-মেয়েরা স্কুলে গিয়ে ঠিকমতো ফিরে এসেছে, ভালোভাবে পড়া তৈরি করেছে। কখনও স্কুল বা মাদরাসায় যেতে আপত্তি করেনি। সে জন্যে কি শুকরিয়া আদায় করেছি? বাবা-মা, নিজ পরিবারে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করছে, এজন্যে কি শুকরিয়া আদায় করেছি? গোটা দিন সুস্থভাবে কাটিয়ে দিয়েছি। এ জন্যে কি আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করেছি? একটু ভেবে দেখন, এমন কতো হাজারও অনুগ্রহ রয়েছে, যা আমরা দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা ভোগ করছি, ব্যবহার করছি। যেগুলোকে আমরা আমাদের অধিকার বলেও মনে করছি; কিন্তু এ জন্যেও যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হয়, তা কি করে থাকি? একটি নিয়ম মনে রাখবেন, যখনই কোনো কাজ নিজের ইচ্ছা বা চাহিদা মতো সম্পন্ন হবে, তখনই বলতে হবে–আলহামদুলিল্লাহ! এই আল-হামদুলিল্লাহ বলার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহপাকের কৃতজ্ঞবান্দা হিসেবে পরিগণিত হয়ে যায়। দেখুন, শব্দটা কতো ছোটো, কতো সহজ, কতো মধুর; কিন্তু তারপরও এটি আমাদের মুখ থেকে ব্যাপকভাবে হরহামেশা বের হয় না। হলেও যে পরিমাণ হওয়া দরকার ছিলো, তা হয় না। আচ্ছা আপনি পানের জন্যে ঠাণ্ডা পানি পেয়ে গেলেন, গরম রুটি পেয়ে গেলেন, সুস্বাদু খাবার পেয়ে গেলেন। অন্যকেউ আপনার সাথে দেখা করে আপনার প্রশংসা করলো, এসব কারণে কি আপনি মনে মনে আপনার প্রভুর

শুকরিয়া আদায় করেছেন? জীবনে এমন অপরিসীম অনুগ্রহ আল্লাহপাক দান করে চলেছেন, যা বলে শেষ করতে পারবেন না। ওলামায়েকেরাম লিখেছেন, মানুষের শরীরে ৩৬০-৩৬৫টি জোড়া রয়েছে, এসব গ্রন্থি সুস্থ সুন্দর নিরাপদ আছে, কোথাও কোনো ব্যথা নেই, এজন্যে কি আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করেছি? আমরা যে লেখাপড়া করি, পড়ার পর তা আবার মুখস্থ করে নেই, মনে রাখি, এজন্যে কি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছি?
আমরা যদি চিন্তা করি, তাহলে দেখা যাবে প্রতিটি মুহূর্ত আমরা আল্লাহপাকের অফুরন্ত অনুগ্রহের মাঝে ডুবে আছি। আল্লাহপাক যেমন বলেছে—

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

"আর যদি তোমরা গণনা বা হিসাব করার চেষ্টা করো, তবে তা কখনই হিসাব করে শেষ করতে পারবে না।"
আমাদের ওপর আল্লাহপাকের অগণিত অনুগ্রহ। এজন্যে কমপক্ষে আমরা এতোটুকু তো বলতে পাড়ি—আলহামদুলিল্লাহ!

শুকরিয়া আদায়ের দু'টি পন্থা

১. মুখে বলে প্রকাশ করা আর ২. কাজের মাধ্যমে আদায় করা। মুখে বলে প্রকাশ করা যায় 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে। যিনি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে দিলেন, তিনি আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করে দিলেন আর আল্লাহপাকের ঘোষণা হচ্ছে—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

"আর যদি তোমরা আমার অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করো, তাহলে আমি তা বাড়িয়ে দেবো।"

অনুগ্রহ পাওয়ায় আল্লাহর ভয়

একবুজুর্গকে আল্লাহপাক পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ, ভোগ-বিলাস দান করেছিলেন; কিন্তু এতোসব অনুগ্রহ পাওয়ার পর তিনি সবসময় শুধু কাঁদতে থাকতেন, এই ভয়ে যে, তাঁকে আখেরাতের ভোগ-বিলাস দুনিয়াতেই দিয়ে শেষ করে দেয়া হচ্ছে না তো? সব আমলের বদলা দুনিয়াতেই পেয়ে যাচ্ছি না তো আবার?
হজরত ওমর ফারুক [রদিয়াল্লাহু আনহু] একবার পানি পান করতে চাইলে তাকে একগ্লাস ঠাণ্ডা শরবত দেয়া হয়। তিনি গ্লাস হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ সে দিকে তাকিয়ে থাকেন। এরপর তা পান করেন; কিন্তু তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে কেউ একজন বলেন, হে আমিরুলমোমিনিন! কী হয়েছে? আপনি কাঁদছেন কেনো? তিনি শীতল নিশ্বাস ছেড়ে বলেন, আমি চাইলাম সাদা পানি আর আমাকে দেয়া হলো সুমিষ্ট শরবত। এ দেখে ভাবছিলাম, আমার

আমলের সব বদলা তো আবার দুনিয়াতে দিয়েই শেষ করা হচ্ছে না? আখেরাতে আবার না বলে দেয়–

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِىْ حَيٰوتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

"তোমরা তোমাদের ভালোটা (প্রতিদান) দুনিয়াতেই নিয়ে নিয়েছো এবং তা উপভোগও করেছো। তাই এখন আর... ।"

এসব ভাবতে গিয়েই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে এসেছে।

সোবহানাল্লাহ! এগুলো ছিলো আমাদের আগের বুজুর্গদের অবস্থা। আমরা তো শুধু বলি, আরও চাই, আরও চাই। আর তাঁরা শুধু বলতেন, ব্যস, ব্যস, হয়েছে, হয়েছে। আর না। আর না। এতোটুকুই যথেষ্ট। বাকিগুলো আখেরাতে পেতে চাই; কিন্তু অনুগ্রহপ্রাপ্তি বন্ধ হওয়ার কোনো নাম গন্ধ নেই। শুধু তা বেড়েই চলেছে।

একদিন মোনাজাতের ভেতর তিনি বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! আমি বলি, ব্যস, ব্যস, আর না, আর না; অথচো আপনি বলেন, আরও আছে, আরও আছে; এর কারণ কী? আল্লাহপাক তাঁকে এলহামের মাধ্যমে বলেন, আমার নিয়ম হলো, কেউ আমার অনুগ্রহ পেয়ে শুকরিয়া আদায় করলে আমি বাড়িয়ে দিই। যেহেতু তুমি অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করেই চলেছো, তাই তা অব্যাহতভাবে বেড়েয়েই চলেছে। যতোদিন তুমি শুকরিয়া আদায় করা বন্ধ করবে না, ততোদিন পর্যন্ত এই অনুগ্রহ প্রদানের ধারা অব্যাহত থাকবে। কারণ, এটা আমার নিয়ম। অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করলে তা বাড়িয়ে দিতে থাকি।

অমনোঃপুত বিষয়ে ধৈয ধরা আর খুশি ও আনন্দের বিষয়ে শুকরিয়া আদায়কারীর জন্যে আলহামদুলিল্লাহ বলা। আর যদি ধৈর্য ধরা হয়, তাহলে আল্লাহপাকের তরফ থেকে অপরিসীম বদলা পাওয়া যায়। যে ব্যাপারে আল্লাহপাক নিজেই বলেছেন–

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"আর নিশ্চয়ই পুরো করে দেয়া হয় ধৈর্যধারণকারীদের বদলা হিসাব ছাড়া।"

আমি আগেও বলেছি, ফেরেশতারা তাদের সোয়াব লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে যাবে। তাহলে জানতে পেলাম, পাঁচটি আমলের মধ্যে একটি হচ্ছে, বেশি বেশি এস্তেগফার করা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ধৈর্য ধরা।

একটু ভেবে দেখলে বেরিয়ে আসবে হজের সফরে আমরা কতোটুকু ধৈর্য ধরতে পারছি? আল্লাহু আকবার! খাওয়ার সময় ঝগড়া, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গাড়িতে ঝগড়া, আমি এখানে বসতে চেয়েছিলাম, আপনি কেনো বসেছেন? এধরনের নানা সব তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে ঝগড়া বেঁধে যায়। ধৈর্য নামের কোনো জিনিসই খুঁজে পাওয়া যায় না। একটুতেই সবাই উত্তেজিত হয়ে পরি।

আমাদের মুরব্বিরা কতো কষ্ট-ক্লেশ সয়ে আগে হজের সফর করতেন। ভাবতে গেলে হয়রান হয়ে যেতে হয়। আজকাল তো বাসা থেকে বের হওয়া মাত্র পাঁচ

ঘণ্টার মধ্যেই সৌদি বিমানবন্দরে পৌঁছে যাই। অথচো আমাদের বড়োরা পবিত্র রমজান মাসের আগ থেকে হজের সফর শুরু করতেন। করাচি ও মুম্বাই (সাবেক বোম্বে) থেকে যেসব নৌজাহাজ ছেড়ে যেতো, সেগুলো রমজানের আগেই রওয়ানা করতো। সমুদ্রের মাঝেই তাদের পবিত্র রমজান মাস কেটে যেতো। কয়েক মাস আগে থেকেই যাত্রা করার প্রধান একটি কারণ ছিলো উত্তাল সমুদ্রে ঝড় বাতাস শুরু হলে নিরাপদ জায়গায় নোঙ্গর করে যাত্রাবিরতি দিয়ে ঝড় থেমে যাওয়া পর্যন্ত বসে থাকতে হতো। এভাবে মাসের পর মাস কষ্ট করে জেদ্দা নৌবন্দরে পৌঁছতে হতো। সেখানে পৌঁছার পরও তিন চারদিন জাহাজ থেকে নামতে দিতো না (প্রথম শুস্ক আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে নিয়ে) এবং মেডিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতো কেউ কোনো ভাইরাসে আক্রান্ত কী-না। কেউ কোনো জীবাণু বা রোগ বয়ে এনেছি কী-না?

মুরব্বিরা বলতেন, জাহাজ থেকে বন্দরের সবকিছু দেখা যেতো; কিন্তু নামতে পারতাম না। তিন চার দিন পর নামার পর আবার জেদ্দা থেকে মক্কা শহরে পৌঁছতেও তিন দিন লেগে যেতো। তখন কোনো সড়ক পথ ছিলো না। পাহাড়ি পথে এগিয়ে যেতে হতো মালসামানাসহ। একবার পাহাড়ের ওপরে উঠতে হতো, আবার নেমে আসতে হতো নিচে। এরপর আরেক পাহাড়ে ওঠা, আবার সেখান থেকে নিচের দিকে নামা। পথে কোথাও কোনো পানির ব্যবস্থা না থাকায় ৩/৪ দিনের প্রয়োজনীয় পানি (খাওয়া, ওজু, গোসল, পশুকে খাওয়ানো) পানি সাথে নিতে হতো। যাদের বেশি টাকা-পয়সা ছিলো, তারা উট ভাড়া করে যেতো। আমাদের মতো লোকদের হেঁটে যেতে হতো। বড়োজোড় কয়েকজন শেয়ারে একটি উট ভাড়া করে তাতে বাড়তি সামানাগুলো উঠিয়ে দিয়ে হালকা-সামানপত্র সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে চলতে হতো।

আগেই বলেছি, রাস্তায় কোনো কোল্ডড্রিংং (ঠাণ্ডা-কোমল পানীয়) বা সুপেয় পানিতো দূরেই থাক, সাধারণ কোনো পানীয়েরই ব্যবস্থা ছিলো না। এমন কষ্টকর সফর করতে হতো তাদের; কিন্তু তখন রাস্তা কাঁচা থাকলেও হাজিরা ছিলেন পাকা। আর বর্তমান যুগে রাস্তাঘাট হয়েছে পাকা আর হাজিরা হয়ে গেছে কাঁচা। জাহাজ এসি করা। এয়ারপোর্ট এসি করা। বেসিন এসি করা। এমনকি সড়কপথও এসি পাওয়া যায় (এসি বাসে উঠলে)। তাছাড়া হারামশরিফও এসি করা। তারপরও অভিযোগের শেষ নেই–এই হলো, সেই হলো, এটা পেলাম না! শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ; কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন, সামান্য তুলনা করুন গিয়ে আগের যুগের সাথে, আল্লাহপাক আমাদের কী পরিমাণ সহজ করে দিয়েছেন, আরামদায়ক ব্যবস্থা করেছেন!!

সূক্ষ্মকথা

এখন একটি চিকন বা সূক্ষ্মকথা বলবো, আমি আলোচনা দীর্ঘ করে ফেলছি; কিন্তু সেই সূক্ষ্ম বিষয়টি বোঝাও জরুরি। আর তা হচ্ছে, যে আল্লাহর বান্দার হজ কবুল হবে, তাকে কোনো না কোনো ধরনের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতেই হবে।

পড়তে হবে কোনো বিড়ম্বনাতে। আমি আমার মুরুব্বিদের কাছ থেকে এমন কথা শুনেছি বলেই আজ তা বলতে সাহস করছি। আসলে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহপাক তাকে নানা ধরনের কষ্ট-ক্লেশে জড়িয়ে দেন। এসবকে বাহানা বানিয়ে তার হজ কবুল করিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করে দেন। অথচো আমরা কী বলি? আমরা বলি, না, কোনো ধরনের দুঃখ-কষ্ট আসা চলবে না; কিন্তু আল্লাহপাক চান ছোটোখাটো বালা-মসিবত দিয়ে তাকে ঝালাই করিয়ে নিয়ে তাকে বড়ো সফলতা দিতে। হজ কবুল করিয়ে দিতে। এজন্যে কাউকে জ্বরে আক্রান্ত করেন। কাউকে সর্দি লাগিয়ে দেন। কারো পেট খারাপ হয়ে যায়। কারো সঙ্গী (সাময়িক) হারিয়ে যায়, কেউ বা নিজেও হারিয়ে যায়, হয় আরাফার ময়দানে, নয় মুজদালিফায় অথবা পাথর ছুড়তে গিয়ে কিংবা অন্যকোথাও থেকে। তো কবুল হজের টিকিট সংগ্রহ করতে তাকে কোনো না কোনো কষ্ট- অসুবিধার সম্মুখীন হতেই হয়। অথচো তা বুঝতে না পেরে আমরা অধৈর্য হয়ে যাই। কামনা করি, কোনো রকম সমস্যার কবলে যেনো না পরতে হয়। এজন্য আগাম এ ব্যবস্থা করি, সে ব্যবস্থা করি। আগেই অস্থির হয়ে পরি সেসব নিয়ে; কিন্তু আল্লাহপাকের ইচ্ছা থাকে অন্যরকম, যার কারণেই তো যে যতো উন্নত মানের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যায়, তার ওপরই নেমে আসে আরও উঁচুপর্যায়ের বিপদ, পরীক্ষা ও সমস্যা।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার একশিল্পপতি ভদ্রলোক দম্পতি আমাদের সাথে হজে আসেন। তিনি নিজেই বলতেন, তার ব্যাংক ব্যালেন্সসহ সব সম্পদের পূর্ণাঙ্গ হিসাব বের করতে একমাস লেগে যাবে।

তিনি মক্কায় পৌঁছার আগেই এখানের একটি ফাইভ স্টার হোটেলে বুকিং দিয়ে রেখেছিলেন। আসার পর লিমোজিন ব্রান্ডের খুব উন্নত মানের একটি বিলাস-বহুল দামি গাড়ি রিজার্ভ করে নেন পুরো হজের সময়ের জন্যে। যা সবসময় হোটেলের সামনে পার্ক করা থাকতো চালকসহ। সেই সাথে একজন স্থানীয় এয়াবিয়ান যুবককে নিয়োগ দিয়েছিলেন গাইড ও সেবক হিসেবে। শুধু তাই নয়। সব কাজ দেখভাল করার জন্যে একজন পার্সোনাল সেক্রেটারিও নিয়োগ দিয়েছিলেন মোটা অঙ্কের বেতনে। তিনি বলতেন, চিন্তা নেই। যাতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় সে জন্যে পানির মতো টাকা খরচ করবো, তবুও কষ্ট করতে পারবো না। প্রয়োজনে আরও টাকা ট্রান্সফার করিয়ে নেবো। পরে জানতে পেরেছিলাম, যে পরিমাণ টাকা তিনি ট্রান্সফার করিয়েছিলেন, তা দিয়ে প্রায় একশোজন লোকের হজ করা যেতো। তার এমন অর্থ নির্ভরতা দেখে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করতাম, দেখুন, এতোসব টাকা-পয়সা আর উপকরণের পেছনে না পরে সবকিছু আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। যেমন করে দেন অন্যদের; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি আমার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে

বলেন, এতোকিছু থাকতে কোনো চিন্তা নেই। টেনশনমুক্ত থাকার জন্যে আরও যা যা করা দরকার সেজন্যেও প্রস্তুত আছি। আমি বলি, তা ঠিক; কিন্তু আল্লাহপাক চাইলে তো আপনি যেসব ব্যবস্থা নেবেন, তার ওপর দিয়েও অন্যকোনো সমস্যায় ফেলতে পারেন; কিন্তু উপকরণের ওপর আস্থাশীল ভদ্রলোক তার মতো করেই সবকিছু চালিয়ে যেতে থাকেন; কিন্তু আল্লাহর কী মহিমা। হজ চলাকালে একদিন হঠাৎ করে ফোন করে বলেন, হুজুর, সর্বনাশ! আমার স্ত্রী হারিয়ে গেছে। এখন আমি কী করবো?! বলি, আরে ভাই! আপনার স্ত্রীতো একজন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান মানুষ। তাছাড়া আগে আরও কয়েকবার হজও করেছেন। প্রায় আধা ডজনবার। তিনি এখান থেকে কীভাবে হারিয়ে যাবেন? তিনি বলেন, জি, তারপরও সে হারিয়ে গেছে। বলি, ঠিক আছে, বিচলিত না হয়ে তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। তিনি সাথে সাথে মক্কার পুলিশ সেন্টার, গোয়েন্দা বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সব বিভাগে যোগাযোগ করা শুরু করেন। মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে মক্কার টেলিভিশনসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে নিখোঁজ সংবাদ প্রচার করেন। তার সন্ধানদাতাকে মোটা অঙ্কের পুরস্কার দেয়ারও ঘোষণা দেন। এমনকি বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে মক্কামোয়াজ্জমার গভর্নরের সাথেও যোগাযোগ গড়েন। তার মাধ্যমে গোটা পুলিশ বাহিনীর কাছে এই বার্তা পাঠান। দু'দিন তাকে আহার নিদ্রা ছেড়ে শুধু কান্নার ভেতর দিয়ে কাটিয়ে দিতে হয়। এতে তার চোখদু'টি ফুলে ড্যাব ড্যাব হয়ে যায়। তিনি আমাকে বার বার করুণ সুরে বলতে থাকেন, এখন আমার কী হবে? আমার স্ত্রী, আমার সন্তানদের কী হবে? কীভাবে চলবে আমাদের জীবন? তাকে বলি, আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম না? এসব নিজের কাঁধে তুলে না নিয়ে একমাত্র আল্লাহর হাওলায় ছেড়ে দিন। এখন একটিই উপায় দু'রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহপাকের কাছে আগে ক্ষমা প্রর্থনা করুন, এরপর আপনার আবেদন পেশ করুন। মহান আল্লাহপাক সীমাহীন দয়ালু আর ক্ষমাশীল। আমার সামনেই তাকে দিয়ে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়িয়ে নিই। এরপর মোনাজাতে লাগিয়ে দিই। তার মোনাজাত এখনও শেষ হয়নি, এমন সময় তার কাছে কল আসে–অমুক হাসপাতাল থেকে আপনার স্ত্রীর ফোন!

আসল ঘটনাটি ঘটেছিলো এমন, প্রচণ্ড গরমের ভেতর তাওয়াফ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যান তার স্ত্রী। সেই অবস্থাতেই দু'রাকাত নফল নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে এক জায়গায় বসে পড়নে। এমন সময় হঠাৎ করে তিনি বেহুঁশ হয়ে পরে যান। যাকে বলে (সান স্ট্রোক)। যেহেতু তখন তার কাছে পরিচয়পত্র বা অন্যকোনো কাগজপত্র ছিলো না, তাই (কোনো অভিভাবক খুঁজে বের করতে না পেরে) পুলিশের লোক এম্বুলেন্সে করে তাকে দূরের একটি হাসপাতাল পাঠিয়ে দেয়। দু'দিন অজ্ঞান থাকার কারণে কর্তৃপক্ষ কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। এরপর কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার পর তিনি ফোনে তার স্বামীর সাথে যোগাযোগ করেন। সেই ভদ্রলোক বলতেন, হজরত আমি এখন একটি সুন্দর

নিয়ম শিখে নিয়েছি–'বান্দার শোভা বন্দিগিতে', সম্পদের প্রাচুর্য চলে এলে সে প্রভু সেজে বসে।
তাই সবসময় মাথায় রাখবেন, হজের সফরে প্রত্যেকের ওপর কোনো না কোনো বালা-মসিবত এসেই পরবে। তার মানে অবশ্য এই নয়, আমরা আল্লাহর কাছে দুঃখ-কষ্ট, বালা-মসিবত কামনা করবো; বরং সবসময় তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। কারণ, আমরা তার উপযুক্ত নই। তারপরও যদি তা এসেই পরে, তাহলে আল্লাহর ওপর ভরসা করে ধৈর্য ধরবো। তাহলে দেখবেন, অল্পতেই কাজ চলে যাবে।
এটি অনেকটা তেমনই, যেমন কোনো সন্তান ভুল করে আর তা থেকে ফিরে না আসে। তখন বাবা তাকে শাসনের উদ্দেশ্যে দু'একটা আস্তে থাপ্পড় মারেন। তাতেও যদি সংশোধন না হয়ে উল্টো জেদ ধরে, তাহলে আরও একটু জোড়ে মারেন। তাতেও যদি কাজ না হয়, তখন রাগে পা থেকে জুতা খুলে হাতে নেন। এরপর ডাণ্ডা উঠান, লাঠি হাতে তুলে নেন। এটাও ঠিক তেমনই। তাই শুরু থেকেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে বলতে থাকবো, হে আল্লাহ! আমি খুবই দুর্বল, তাই আমার সাথে কৃপার আচরণ করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। তাহলে সর্দি জ্বরের ওপর দিয়েই পার হয়ে যাবে।
বলছিলাম পাঁচটি কাজ বেশি বেশি করতে হবে। তার মধ্যে ১. বেশি বেশি এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করবো; ২. ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ঘটে গেলে উত্তেজিত না হয়ে ধৈর্য ধরবো আর ৩. কোনো কিছু ইচ্ছার স্বপক্ষে কামনা মতো হয়ে গেলে বা অনুগ্রহ পেলে আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করবো। শুকরিয়া আদায় করার ফলে আল্লাহপাক তার অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন এবং তার ওপর থেকে বালা-মসিবত হটিয়ে দেন।
যেমনটি তিনি তাঁর পবিত্রকোরআনে বলেছেন–

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ

"তোমাদের সাজা দিয়ে আল্লাহপাক কী করবেন?"

তার মানে তোমাদের আজাব বা সাজা দিয়ে আল্লাহপাকের কী লাভ হবে? তিনি আরও বলেন–

اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

"তোমরা যদি শোকর আদায় করো আর ইমান আনো, তাহলে তিনি সাজা দেবেন না। এতে তাঁর কোনো লাভ নেই।"
জানা গেলো, শুকরিয়া আদায়ের কারণেও আল্লাহপাক এভাবে তার আজাব উঠিয়ে নেন, যেভাবে আজাব হটিয়ে দেন এস্তেগফার করার কারণে।
সেই পাঁচ কাজের মধ্যে আজ প্রথম তিনটির আলোচনা করা হলো, বাকি দু'টির আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ আগামী মজলিসে।

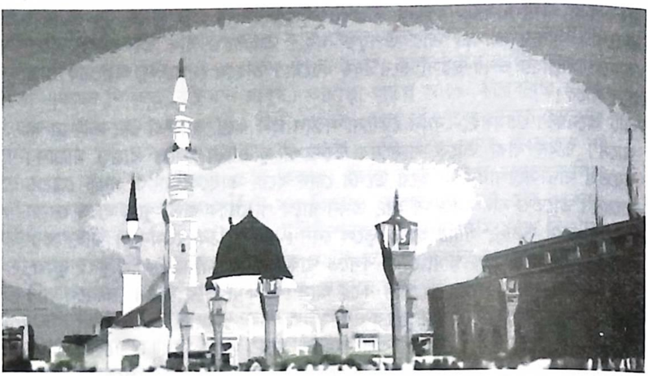

মদিনা

জেয়ারতের আদব

بلا لو اب تو اے آقا ٹھر جانا نہیں اچھا
[বুলা লো আব তো আয় আকা ঠেহের জানা নেহী আচ্ছা]

تڑپ کر یوں دل مضطر کا مر جانا نہیں اچھا
[তড়প কর ইয়োঁ দিলে মুযতর কা মরজানা নেহী আচ্ছা]

مدینہ کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر
[মদীনাহ কা এরাদাহ হো তো ইশ্‌কে নববী পয়দা কর]

تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا
[তাআল্লাক হো নাহ জিন সে উন কে ঘর জানা নেহী আচ্ছা]

নাও না ডেকে আমায় তুমি
ও মদিনার নবি
দাঁড়িয়ে আছি তোমার দ্বারে
ও মদিনার ছবি!

এসেও খানিক দাঁড়িয়ে থাকা
সহ্য করা দায়
এ দুঃখে মনটা আমার
মরে যেতে চায়।

ব্যাকুল মনে তাকিয়ে থাকা
দেখায় নাতো ভালো
বিরহ ব্যথা সওয়ার চেয়ে
মরে যাওয়াও ভালো।

তোমরা কভু ওই মদিনায়
যেতে যদি চাও
ওই মদিনার নবির সাথে
প্রেমটা গড়ে নাও।

কারণ শোভা পায় যাওয়া
যার সাথে নেই প্রেম
তাইতো যেতে গড়তে হবে
নবির সাথেই প্রেম।

দু'টি পবিত্র শহর

এই দুই শহর। দু'টিই নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর শহর। একটির নাম মক্কামোকাররমা, আরেকটির নাম মদিনাতাইয়েবা। একটিতে

আল্লাহর, অন্যটিতে রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ঘর। এ ঘর আবাদ করেছেন খলিলুল্লাহ (হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]), আরেকটি আবাদ করেছেন রাসুলুল্লাহ (মসজিদে নববিকে)।

একটি নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর পবিত্র জন্মভূমি, অন্যটি তাঁর আবাসভূমি। একশহরে শুয়ে আছেন তাঁর পিতৃপুরুষ। অন্যটিতে শুয়ে আছেন তিনি নিজে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা। তাই এই দুই শহরের বড়োত্বও ভিন্ন ভিন্ন। একটিতে জালালি (প্রতাপ ও প্রভা বিস্তারকারী) কড়া রঙ, অন্যটি জামালি (কমনীয় ও কোমল-মোলায়েম) রঙ, যার প্রভাব পরেছে দু'শহরের অধিবাসীদের মাঝে। আপনি যদি মক্কাবাসীদের দিকে খেয়াল করেন, তাহলে তাদের মাঝে জালালিরঙের প্রভাব দেখতে পাবেন, আর যদি মদিনাশরিফের অধিবাসীদের স্বভাবের দিকে তাকান, তাহলে তাদের ভেতর জামালি বা কোমল মোলায়েম রঙের প্রভাব দেখতে পাবেন। যার অর্থ, মক্কাবাসীরা সাধারণত একটু কড়া স্বভাবের আর মদিনাবাসীরা অনেকটা নরম মেজাজের, বিনীয় স্বভাবের হয়ে থাকে। যার প্রমাণ পেয়ে যাবেন মক্কার বাজারে কিছু কেনাকাটা করতে গেলেই।

স্থানীয় দোকানীদের সাথে একটু কথা এদিক সেদিক হলেই একটির বেশি দু'টি কথা বললেই ইয়া আল্লাহ বলে আপনার সাথে পাট চুকিয়ে নেবেন। আবার মদিনাশরিফে গেলে সেখানকার অধিবাসীদের মাঝে দেখতে পাবেন ঠিক এর উল্টো চিত্র। তাদের মাঝে থেকে যেনো নমনীয়তা আর বিনয়ীভাব ঠিকরে পরে। কারণ, এই একটিই। মক্কা শহরে পরেছে আল্লাহপাকের জালালি স্বভাবের প্রভাব, আর মদিনাশরিফে পরেছে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কোমল স্বভাবের বিনয়ী প্রভাব। তবে এই দু'শহরের সাথেই রয়েছে আমাদের আত্মার সম্পর্ক।

بمکہ بینی از توحید نورے
[বমক্কাহ বীনী আয তাওহীদে নূরে]

بیثرب از حبیب اللہ ظہورے
[ইয়াছরিব আয হাবীবুল্লাহ যুহূরে]

گر ایں دو شہر ایماں را نہ دیدے
[গার ঈঁ দো শহরে ঈমাঁ রা নাহ দীদে]

چہ دیدی گر دریں دنیا رسیدے
[চেহ দীদে গার দরী দুনইয়া রসীদে]

মক্কা নামের শহরজুড়ে
ইমান মিশে আছে
ওই মদিনায় শহরজুড়ে
নুর মিশে আছে।

ইমান নিয়ে এ দু'শহর
না যায় যদি দেখা
জন্ম নিয়ে এ দুনিয়ায়
কী-বা হলো দেখা!

দু'টি সম্মানিত আঙ্গিনা

এই মদিনাতাইয়েবাও সম্মানিত, আবার মক্কামোকাররমাও সম্মানিত। আল্লাহপাক তাঁর খলিল হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর দোয়ার বরকতে কাবাশরিফকে সম্মানিত ঘোষণা করেছেন। আর মদিনাশরিফকে সম্মানিত করেছেন তাঁর প্রিয়রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর দোয়ার বরকতে। আজ পর্যন্ত আমি আমার কল্পনার চোখ দিয়ে মদিনাশরিফের সবুজ গম্বুজের দৃশ্য দেখি থাকি। আল্লাহপাক এখন আমাদেরকে সেই সময় আর সুযোগ দিয়েছেন, তা কাজে লাগিয়ে আমাদের প্রতিটি অঙ্গকে চোখ বানিয়ে সেই সবুজ গম্বুজ জেয়ারত করবো, দেখবো।

আমলের সোয়াব

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর মসজিদে হাজির হতে পারা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। একহাদিসে এসেছে, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, যে আমার কবর জেয়ারত করবে, তার জন্যে শুপারিশ করা আমার ওপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। কাবাশরিফে একরাকাত নামাজ আদায় করলে একলাখ রাকাত নামাজের সোয়াব পাওয়া যায় আর এখানে (মসজিদেনববিতে) নামাজ পড়ার সোয়াব দশ হাজার রাকাতের পরিমাণ! এটি মহান আল্লাহপাকের বিশেষ মাহাত্ম্য। এ কারণে এটিকে মদিনাতাইয়েবা বলা হয়। মোনাওয়ারা বলা হয়। কারণ, এই শহরকে আল্লাহপাকের রহমত আলোকিত করে রেখেছে।

মদিনাশরিফের দেয়াল ও দরোজা জেগে থাকে, গাছ-পালা জেগে থাকে, পাথর জেগে থাকে। আর আমাদের এই বয়সে আমাদের এখানে আগমনের অবস্থাটা ধরা পরেছে কবির চোখে–

مدینہ کے دیوار و در جاگتے ہیں
[মদীনাহ কে দিওয়ার ও দর জাগতে হেঁ]

شجر جاگتے ہیں حجر جاگتے ہیں
[শাজার জাগতে হেঁ হাজার জাগতে হেঁ]

بایں پیری رہ یثرب گرفتم
[বঈঁ পিরী রাহে ইয়াসরিব গেরেফতাম]

نوا خواں از سرور عاشقانہ
[নাওয়া খাঁ আয সারওয়ারে আশেকানাহ]

چوں آں مرغے کہ در صحرا سر شام
[চোঁ আঁ মুরগে কেহ দর সেহেরা সারে শাম]

کشاید پر بفکر آشیانہ
[কুশায়াদ পর বফিকরে আশিয়ানা]
জেগে থাকে ওই মদিনার
দেয়াল ও প্রাচীর
জেগে থাকে ওই মদিনার
পাথর ও প্রাচীর।

এ জীবনের সন্ধ্যাবেলায়
পথ ধরেছি তায়
তাঁর নামেতে মন পাখিটা
হাজারো গীত গায়।

পাখি যেমন দিন ফুরালে
ফেরে আপন নীড়ে
তেমনি আমি চাই ফিরিতে
আমার আপন নীড়ে।

দয়ার প্রভু তোমার কাছে
একটি আরজ করি
পৌছে দিয়ো ওই মদিনায়
তুমি দয়া করি।

আমাদের আগেররা এই শহরের দেখা পেতে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন।

دل میں بسا ہے شوق رہ یار کا حفیظ
[দিল মেঁ বসা হায় শওকে রাহে ইয়ার কা হাফীজ]

جائیں گے سر کے بل جو کبھی واں طلب ہوئے
[জায়েঁ গে সার কে বাল জো কভী ওয়াঁ তলব হোয়ে]
রওজাপাকের প্রেমের আগুন
আজ উঠেছে জ্বলে
উল্টো হয়ে যেতে হলেও
যাবো সেথায় চলে।

পির মেহের আলি শাহ মদিনাশরিফ জেয়ারতে যাওয়ার পথে স্বপ্নে রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সাথে সাক্ষাত হয়, তখন তিনি আবেগ

তাড়িত হয়ে বলেন–

اج سک متراں دی و دھیری اے
[আজ সাক মিতরাঁ দী ও ধীরী আয়]

کیوں دلڑی اداس گھنیری اے
[কেয়োঁ দিলড়ী উদাস ঘনীরী আয়]

لوں لوں وچ شوق چنگیری اے
[লোঁ লোঁ ওচ শওকে চিঙ্গীরী আয়]

اج نیناں نے لائیاں کیوں جھڑیاں
[আজ নাইনাঁ নে লাইয়াঁ কেয়োঁ ঝড়িয়াঁ]

سُبْحَانَ اللهِ مَا اَجْمَلَكَ مَا اَحْسَنَكَ مَا اَكْمَلَكَ
[সুবহানাল্লাহি মা আজমালাকা মা আহসানাকা মা আকমালাকা]

کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا
[কাথে মহর আলী কাথে তেরী ছানা]

گستاخ انکھیاں کتھے جا لڑیاں
[গোস্তাখ আঁখিয়াঁ কাথে জা লড়িয়াঁ]

মেহের আলি কোথায় তুমি
কোথায় তোমার গাঁথা
কোথায় তোমার অবাধ্য চোখ
কোথায় যে প্রেমগাঁথা।

কার পেছনে করছো খরচ
তোমার সময়টাকে
সাক্ষী খোদা সাক্ষী কোরআন
দাও না সময় তাকে।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

"আর আমি আপনার আলোচনা সমুন্নত মহিমান্বিত করেছি।"
সেই গোটা জাহানের প্রিয়তমের সাথে গিয়ে তোমার দৃষ্টি জড়িয়ে গেছে। খাজা গোলাম ফরিদ নামে একবুজুর্গ তখন তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনিও কিন্তু মারেফাতি এবং আজব ধরনের কথা বলেন–
আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা–

اتے میں مٹھری نت جان بلب
اوتے خوش و سدا وچ ملک عرب

اتے دکڑے دھوڑے کھاند ڑیاں

تڈے نام تو مفت وی کاند ڑیاں

اتے دکڑے دہورے کہاند رایا

تڈے نام تو مفت وی کاند ڑیاں

تڈی باندیاں دی میں باند ڑیاں

میں آپ کی باندیوں کی بھی باندی

تڈے درد کتیاں نال ادب

আমি আপনার বাঁদিদেরও বাঁদি। আপনার দরোজার কুকুরের সাথেও আমি সম্মানজনক, সৌজন্যমূলক আচরণ করবো। এটি আল্লাহপাকের হাবিবের জায়গা।

ہے نظر میں جمال حبیب خدا

[হায় নজর মেঁ জামালে হাবীবে খোদা]

جس کی تصویر سینہ میں موجود ہے

[জিস কী তাসবীর সীনাহ মেঁ মওজুদ হায়]

جس نے لا کر کلام الہی دیا

[জিস নে লা কর কালামে ইলাহী দিয়া]

وہ محمد مدینہ میں موجود ہے

[ওহ মোহাম্মাদ মদীনাহ মেঁ মওজুদ হায়]

پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی

[ফূল খিলতে হেঁ পড়ৃহ পড়ৃহ কে সাল্লী আলা]

جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا

[ঝুম কর কাহ রাহী হায় এহ বাদে সবা]

ایسی خوشبو چمن کے گلو میں کہاں

[এ্যয়সী খোশবো চমন কে গুলো মেঁ কাহাঁ]

جو نبی کے پسینہ میں موجود ہے

[জো নবী কে পসীনাহ মেঁ মওজুদ হায়]

ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسیں

[হাম নে মানা কেহ জান্নাত বহুত হায় হাসী]

چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں

ছুড় কর হাম মদীনাহ না জায়েঁ কাহেঁ]

یوں تو جنت میں سب کچھ مدینہ نہیں
[ইয়োঁ তো জান্নাত মেঁ সব কুছ মদীনাহ নেহী]

پر مدینہ میں جنت بھی موجود ہے
[পর মদীনাহ মেঁ জান্নাত ভী মওজুদ হায়]

চোখে আমার ভেসে আছে
প্রিয়নবির রূপ
এ দু'চোখে যায় না দেখা
অন্যকোনো রূপ।

আল্লাহপাকের বার্তা নিয়ে
এলেন তিনি ভবে
তাঁর রূপেতে ধন্য হলো
এ দুনিয়ার সবে।

দয়ার নবি এলেন যখন
দূরের মদিনায়
ফুল-পাখিরা উঠলো গেয়ে
তাঁরি মহিমায়।

হয় মোহিত কুল কায়েনাত
ঘামের সুবাস মেখে
ফুল বাগানের সব ফুলেরা
ধন্য সুবাস মেখে।

আমরা জানি জান্নাতেতে
আছে হাজার কিছু
কিন্তু ছেড়ে ওই মদিনায়
যাবো না তার পিছু।

জান্নাতেতে সবি আছে
নেই তো মদিনা
জান্নাতেরই আরেকটি নাম
সোনার মদিনা।

অর্থাৎ, মসজিদেনববির পাশে রিয়াজুলজান্নাত (জান্নাতের বাগান) রয়েছে। যাকে আল্লাহপাক জান্নাতের টুকরা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এমন বরকতময় পবিত্রজায়গায় আমাদেরকে আল্লাহপাক নিয়ে এসেছেন। আল্লাহু আকবার!

بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینہ میں
[বানা লিয়া হায় বাহারোঁ নে ঘর মদীনাহ মেঁ]

مہک رہی ہے فضائے حرم مدینہ میں
[মেহেক রাহী হায় ফেজায়ে হরম মদীনাহ মেঁ]

حضور آپ کے قدموں پر مٹنے والوں کا
[হুজুর আপ কে কদমোঁ পর মিটনেওয়ালোঁ কা]

ہجوم رہتا ہے شام و سحر مدینہ میں
[হুজ্জুম রাহতা হায় শাম ও সেহের মদীনাহ মেঁ]

میں کیوں نہ منزل عقبی کی جستجو کر لوں
[ম্যাঁয় কেয়োঁ নাহ মানঝিলে উকবা কী জুসতুজোঁ কর লোঁ]

مجھے نصیب ہوا ہے سفر مدینہ میں
[মুঝে নসীব হোয়া হায় সফর মদীনাহ মেঁ]

یہ آرزو ہے میری اے حبیب رب جہاں
[এহ আরযো হায় মেরী আয় হাবীবে রব্বে জাহাঁ]

کہ میں جہاں بھی رہوں دل رہے مدینہ میں
[কেহ ম্যাঁয় জাহাঁ ভী রাহোঁ দিল রাহে মদীনাহ মেঁ]

بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینہ میں
[বানা লিয়া হায় বাহারোঁ নে ঘর মদীনাহ মেঁ]

বসন্তেরা ঘর বেঁধেছে
সোনার মদিনায়
হেরেমেরই পবিত্র সুর
বাজে মদিনায়।

নবির পরে মরবে এমন
বাড়ছে লোকের ভীড়
সন্ধ্যা, সকাল সেসব লোকের
বাড়ছে শুধু ভীড়।

তবে কেনো আমারই দোষ
ঘর বানালে তাতে
চায় যদি গো জীবন দিতে
এ অভাগা তাতে।

চোখ দেখেছে ওই মদিনা
মন কেড়েছে তা
জীবন দিয়েও করতে আপন

চাই যে আমি তা।

জগত স্বামীর বন্ধু ওগো
একটি কথা বলি
ওই মদিনা থাকে মনে
যে পথ ধরেই চলি।

বসন্তেরা ঘর বেঁধেছে
সোনার মদিনায়
হেরেমেরই পবিত্র সুর
বাজে মদিনায়।

তাই মদিনাশরিফের সফর সবাই প্রেমপূর্ণ আবেগ আর ভালোবাসা নিয়ে করে থাকে। এটি পৃথিবীর অন্যান্য সফর থেকে একেবারেই আলাদা। একদম ভিন্ন, স্বতন্ত্র।

বাইরের গোসলের সাথে আত্মিক গোসলও

আমাদের বড়োরা লিখেছেন, মদিনাতাইয়েবায় হাজির হওয়ার নিয়ত করলে প্রথমে নিষ্ঠার সাথে খাঁটি মনে পাকাপাকি তওবা করে নেবে। শরীরিক গোসলের পাশাপাশি অত্মিক গোসলও সেরে নেবে। খাঁটি তওবাই হচ্ছে আত্মিক গোসল। গোনাহ থেকে পুরোপুরি পাক হয়ে যাবে। একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কারণ, দুনিয়ারও নিয়ম হচ্ছে বন্ধু বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় পুরোপুরি প্রস্তুতি নেয়। সুন্দরভাবে গোসল করে ভালো রুচিসম্মত পোশাক পরে, আতর সুরমা লাগিয়ে (বডি স্প্রে করে) পরিচ্ছন্নভাবে বন্ধুর বাড়ি যায়। ওদিকে যদি মেজবান বন্ধু তখন ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে ঘুম থেকে ওঠে সরাসরি বন্ধুর সাথে দেখা করে না; বরং তাকে মেহমানখানায় (গেস্টরুমে) বসানোর ব্যবস্থা করতে বলে সে দ্রুতো ওয়াশরুমে চলে যায়; ভালোভাবে ওজু করে (হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে) পরিপাটি হয়ে এসে বন্ধুর সাথে দেখা করে। বড়ো কারো সাথে দেখা করার প্রয়োজন হলে তো অনেকে এই উপলক্ষে নতুন জামা কাপড় বা পোশাক তৈরি করে বা কেনে। তেমনি আল্লাহপাকের প্রিয়রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর জেয়ারতে যাওয়ার সময়ও পুরোপুরি প্রস্তুতি নেয়া দরকার। বাইরের পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি ভেতরের বা আত্মিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা আরও বেশি জরুরি। বাইরের গোসলের সাথে সাথে আত্মিক গোসলও সেরে নিতে হবে খাঁটি তওবা করার মাধ্যমে। এভাবে যখন নিজেকে পাপমুক্ত পবিত্র করে নিতে পারবো, তখন নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর রওজাশরিফের উপস্থিতি আল্লাহপাকের কাছে কবুল হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে এটিই প্রথম কাজ।

بلا لو اب تو اے آقا ٹھر جانا نہیں اچھا

[বুলা লো আব তো আয় আকা ঠেহের জানা নেহী আচ্ছা]

تڑپ کر یوں دل مضطر کا مرجانا نہیں اچھا

[তড়প কর ইয়োঁ দিলে মুযতর কা মরজানা নেহী আচ্ছা]

مدینہ کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر

[মদীনাহ কা এরাদাহ হো তো ইশ্‌কে নববী পয়দা কর]

تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا

[তাআল্লাক হো নাহ জিন সে উন কে ঘর জানা নেহী আচ্ছা]

নাও না ডেকে আমায় তুমি
ও মদিনার নবি
দাঁড়িয়ে আছি তোমার দ্বারে
ও মদিনার ছবি!

এসেও খানিক দাঁড়িয়ে থাকা
সহ্য করা দায়
এ দুঃখে মনটা আমার
মরে যেতে চায়।

ব্যাকুল মনে তাকিয়ে থাকা
দেখায় নাতো ভালো
বিরহ ব্যথা সওয়ার চেয়ে
মরে যাওয়াও ভালো।

তোমরা কভু ওই মদিনায়
যেতে যদি চাও
ওই মদিনার নবির সাথে
প্রেমটা গড়ে নাও।

কারণ শোভা পায় যাওয়া
যার সাথে নেই প্রেম
তাইতো যেতে গড়তে হবে
নবির সাথেই প্রেম।

এই জন্যে মদিনাশরিফে উপস্থিতির সময় খাঁটি নবিপ্রেম দিয়ে হৃদয় ভরে নেবে।

اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا

[আয় ইশকে নবী মেরে দিল মেঁ ভী সামা জানা]

مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا

[মুঝ কো ভী মোহাম্মদ কা দিওয়ানাহ বানা জানা]

جو رنگ کہ رومی پہ رازی پہ چڑھا یا تھا

[জো রঙ কেহ রুমী পেহ রাযী পেহ চড়হায়া থা]

اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا

[ইস রঙ কী কুছ রঙ্গত মুঝ পে ভী চড়হা জানা]

جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل

[জিস নীন্দ মেঁ হো জায়ে দীদারে নবী হাসেল]

اے عشق کبھی مجھ کو وہ نیند سلا جانا

[আয় ইশক কভী মুঝ কো ওহ নীন্দ সুলা জানা]

قدرت کی نگا ہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں

[কুদরত কী নিগাহেঁ ভী জিস হেচরে কো তাকতী থী]

اس چہرۂ انور کا دیدار کرا جانا

[উস চেহরায়ে আনওয়ার কা দীদার করা জানা]

মনে আমার দাও জাগিয়ে
মোহাম্মদের প্রেম
পেতে আমায় পাগল করো
মোহাম্মদের প্রেম।

যে রঙেতে রঙিন ছিলো
রুমি ও রাজি
সে রঙেতে দাও রাঙিয়ে
আমার মিয়াজি।

যে ঘুমেতে যায় গো দেখা
মোহাম্মদের মুখ
সে ঘুম দিয়ে আমার মনে
দাও গো প্রিয় সুখ।

যে চেহারায় তাকিয়ে অবাক
আল্লাহতায়ালা নিজে
ধন্য হতে চাই তা দেখে
এ অভাগা নিজে।

স্থানকাল মতো দোয়া

মদিনার হারামশরিফে (রওজামোবারকে) ঢুকার সময় এই দোয়া করবে, হে আল্লাহ! এটি সম্মানিত হারামশরিফ। এর বরকতে আমাকে সব রকমের হারাম কাজ থেকে বিরত রেখো।

আর মদিনাশরিফের সংশ্লিষ্টতা দিয়ে বলবে, হে আল্লাহ! এই মদিনাতাইয়েবায় আমাকে হায়াতেতাইয়েবা দান করো। যেহেতু আল্লাহপাক বলেছেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً

"নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে নেক আমল করবে ইমানদার হিসেবে, তাকে আমি হায়াতেতাইয়েবা (পবিত্র জীবন) দান করবো।"

তাই মদিনাতাইয়েবার সাথে সম্পৃক্ত করে হায়াতেতাইয়েবা কামনা করে দোয়া করাটা স্থানকাল মতো দোয়া করা হবে।

প্রিয়তমের উপহার

বেশি বেশি দরুদশরিফ পড়বো। বেশি বেশি কোরআনেকারিম পড়া। ইমাম শাফেয়ি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, একবার মক্কাশরিফ থেকে মদিনাশরিফ পর্যন্ত পৌঁছতে ষোলো দিন সময় লেগে যায়। সেই ষোলো দিনে আমি ষোলো খতম কোরআনশরিফ তেলাওয়াত করেছিলাম। যতোটুকু কোরআনশরিফ তেলাওয়াত করতে পারি, তার সবটুকু এখানে এসে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কাছে হাদিয়া (উপহার) হিসেবে উপস্থাপন করবো।

দুনিয়ার নিয়ম হচ্ছে, একে অন্যের বাড়ি যাওয়ার সময় নানান ধরনের উপহার সামগ্রী নিয়ে যায়। বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার সময় কখনও ফুলের ডালা (গুচ্ছ) নিয়ে যায়। আবার কখনো মিষ্টির হাঁড়ি (প্যাকেট) নিয়ে যায়। পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে সে মতো মানানসই উপহার-উপঢৌকন নিয়ে যায়; কিন্তু এখানে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর রওজামোবারকের প্রধান উপহার হচ্ছে দরুদশরিফ আর পবিত্রকোরআন তেলাওয়াত, যা আমরা আমাদের প্রিয়নবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর উদ্দেশ্যে অর্পণ করবো।

সাবধান!

এখানে আসার পর মদিনাশরিফের প্রতিটি বস্তুর প্রতিই হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে সম্মান প্রদর্শন করবো। হুজ্জাতুলইসলাম কাসেম নানুতভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] সম্পর্কে জানা যায়, হজের সফরে তিনি 'আলি কুপ' এলাকায় পৌঁছামাত্রই পায়ের জুতা খুলে ফেলেন। সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করে, হজরত এটিতো পাথুরে এলাকা, জুতা পায়ে চলাফেরা করাই কঠিন। সেখানে আপনি জুতা খুলে নিলেন কেনো? আপনার পা তো জখম হয়ে যাবে? নরম স্বরে তিনি বলেন, যে জায়গায় নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বরকতময় পা পড়েছে, পায়ের ছোঁয়া লেগেছে, সেই জায়গায় আমার মতো অধমের জুতা পায়ে হাঁটা কীভাবে শোভা পায়?!

ঠিক অবস্থা ছিলো ইমাম মালেক [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এরও। তিনি মদিনাশরিফে বাহনে চড়তেন না। যদিও তাঁর উট, ঘোড়া সবই ছিলো। তিনি বলতেন, যেসব জায়গায় আমার প্রিয়নবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর

পবিত্র পা লেগেছে, সেই জায়গায় আমার বাহনের পা লাগাটা পছন্দ করি না আর মালেকের জন্যে এটা শোভাও পায় না।

সোবহানাল্লাহ! তাঁরা মদিনাশরিফ তথা রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রতি এতোটাই সম্মান দেখাতেন!

ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر

[আদব গাহেস্ত যীরে আসমা আয আরশ নাযুক তর]

نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایں جا

[নফস গম করদাহ মী আয়াদ জুনাইদ ওয়া বায়েযীদ ঈঁ জা]

ওই আকাশে আরশ যেমন
সবকিছুরই সেরা
রওজাপাকের মাটিও তেমন
এই দুনিয়ার সেরা।

আদব রেখো রওজাপাকের
জায়গা দিয়ো মনে
নবির প্রেমে পাগল হয়ে
আসেন পাগলজনে।

এই রওজাশরিফ আকাশের নিচে এমন সম্মানিত জায়গা, যা আরশের চেয়েও স্পর্শকাতর। এখান এসে বিশ্ববিখ্যাত বুজুর্গ জোনায়েদ বাগদাদি আর বায়েজিদ বোস্তামিরও শ্বাস আটকে থাকে।

এটি এতোটাই সম্মানের জায়গা যে, এখানে এসে শ্বাস নেয়ার সময়ও খুব সতর্ক ও সাবধান থাকতে হয়। কোনোভাবে আবার বেয়াদবি হয়ে যায় কী-না নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর (রওজামোবারকের) সাথে!! কারণ, এখানে আল্লাহপাকের প্রিয়রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] শুয়ে আছেন। যার সম্মানার্থে স্বয়ং আল্লাহপাক মানবজাতিকে সতর্ক করে বলেছেন, যদি নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর শব্দের চেয়ে (কথার আওয়াজের ওপর) তোমাদের শব্দ বা কথার আওয়াজ জোড়ে হয়, তাহলে

اِذْ تَحْبَطُ اَعْمَالُكُمْ

"তোমাদের সব আমল বাতিল হয়ে যাবে।"

অথচো তোমরা তার টেরও পাবে না, উপলব্ধিও করতে পারবে না। যার কারণে সাহাবারা খুব আস্তে করে ক্ষীণস্বরে কথা বলতেন।

হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর খেলাফতকালে রওজাশরিফের দরোজা বানানোর প্রয়োজন হয়, তখন তিনি কাঠমিস্ত্রিকে নির্দেশ দেন, আস্তে করে (শব্দ ছাড়া) সেখানে গিয়ে দরোজার মাপ এনে তা বাইরে তৈরি করবে। এরপর কাজ শেষ হয়ে গেলে তা নিয়ে চুপচাপ সেখানে শুধু ফিট করে দেবে। কোনো

কথাবার্তা বলবে না। যাতে করে রওজাশরিফের (নবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর) সাথে কোনো ধরনের বেয়াদবি না হয়। কেউ কোথাও কোনো শোরগোল করলে তাকে সাবধান করাতে উম্মুলমোমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা [রদিয়াল্লাহু আনহা] আল্লাহপাকের এই বাণী–

لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ.

"তোমরা নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর স্বরের চেয়ে উঁচুস্বরে কথা বলো না।"

বার্তা পাঠিয়ে দিতেন।

আমরা আজ যেখানে হাজির হয়েছি, এটাই সেই জায়গা। তাই এখানকার পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করে চলতে পারলেই শুধু আমাদের হজের আমল কবুল হওয়ার আশা করা যায়।

آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست صدا ہو
[আহেস্তাহ কদম, নীচী নেগাহ, পুস্তে সদা হো]

خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے
[খাবীদাহ এহাঁ রুহে রসূলে আরাবী হায়]

اے زائر بیت نبی یاد رہے یہ
[আয় যায়েরে বাইতে নবী ইয়াদ রাহে এহ্]

بے قاعدہ جنبش لب یہاں بے ادبی ہے
[বে কায়েদাহ জাম্বাশ লব এহাঁ বে আদবী হায়]

আলতো পায়ে চলবে এথা
থাকবে নজর নিচে
এথায় শুয়ে দয়ার নবি
এই না মাটির নিচে।

আসবে যারা করতে দেখা
রাখবে সদা মনে
কায়দা ছাড়া বললে কথা
লাগবে ব্যথা মনে।

অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকবো

অনেকের স্বভাবই এমন থাকে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ। খুঁটিনাটি ছোটোখাটো বিষয়ও তার কাছ থেকে রেহায় পায় না, সুযোগ পেলেই কিছু না কিছু একটা অভিযোগ করেই বসবে। এখানে এসে (অন্যসময়েও) কোনো ব্যাপারেই কোনো অভিযোগ না করে নীরবতা অবলম্বন করা জরুরি। তা না হলে তো আমরা সেই মেথরের (সুইপারের) মতো হয়ে যাবো। যাকে সম্রাট করুণা করে

তার রাজপ্রাসাদে ডেকে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু সে প্রাসাদে ঢুকার পরই শুরু করে দেয় নানা অভিযোগ-অনুযোগ, ওজর-আপত্তি। এখানে লালবাতি কেনো? ওখানে নীল বাতি নেই কেনো? এখানে সাদা চাদর না বিছিয়ে লাল চাদর দেয়া ঠিক হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন সম্রাট তাকে এই বলে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন, তো কোন যোগ্যতা বলে এখানে এসেছিস? তোকে কৃপা দেখানো উচিত হয় নি, তোকে এতোসব কথা বলার অধিকার কে দিয়েছে! একমুহূর্ত দেরি না করে এখনই এখান থেকে বের হয়ে যা!

ঠিক তেমনি করুণাময় আল্লাহপাক তাঁর অপার কৃপায় এখানে আমাদেরকে নিয়ে এসেছেন। তাই কোনো ব্যাপারেই আমরা কোনো অভিযোগ অনুযোগ করবো না। আমাদের পির সাহেব এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বারোপ করতেন। সবাইকে চুপ থাকতে বলতেন এবং মাঝে মধ্যেই 'টক দই'-এর গল্প শুনিয়ে সতর্ক করতেন। ঘটনাটি ছিলো এমন, রওজাশরিফে জেয়ারত করতে আসা একলোক সকালে দোকানে যায় কেনাকাটা করতে। দোকান থেকে নানা ধরনের সওদা করে ফিরে আসার সময় দোকানি বলে, জনাব, এতোকিছু নিলেন, সাথে একটু দই নিলেন না? সাথে সাথে সে বিরক্ত তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞার স্বরে বলে, না মদিনার দই খুব টক, না এখানকার দই নেবো না! রাতের বেলায় স্বপ্নে দেখে রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে বলছেন, তুমি আমার শহরে এসে আমার শহরের জিনিসের বদনাম করে বলছো 'মদিনার দই টক? তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও!' সাথে সাথে তার ঘুম ভেগে গেলে সে সীমাহীন অস্থির, উদ্বিগ্ন ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পরে। গোটা রাত আর ঘুম হয় না। সকালবেলা সরাসরি চলে যান একবুজুর্গ আলেমের কাছে; তাঁকে সবকিছু খুলে বলার পর তিনি বলেন, এই প্রেক্ষিতে তোমার আপাতত মদিনা থেকে বের হয়ে যাওয়া জরুরি; কিন্তু তার মন মানে না। মনে মনে চিন্তা করে চলে, যাওয়ার আগে একটু চেষ্টা করে দেখি না কোনো উপায়ে মাফ পাওয়া যায় কী-না? উপায় হিসেবে বের করেন শহিদ সম্রাট হজরত হামজা [রদিয়াল্লাহু আনহু] নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর খুব প্রিয় এবং চাচা ছিলেন। তাঁর খাতিরে হয়তো হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ক্রোধ প্রশমিত হতে পারে।

তাঁর মাজারে গিয়ে দোয়া দরুদ পড়ে তাঁর কাছে ইসালেসোয়াব করিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁর উসিলা দিয়ে দোয়া করেন। এরপর বদরের শহিদদের কবরে গিয়েও একই আমল করেন। রাতে ঘুমিয়ে গেলে হজরত আমির হামজা [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর সাথে দেখা হয়। তিনি তাকে বলেন, যেহেতু নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলে দিয়েছেন এখান থেকে চলে যেতে, তাই আর দেরি না করে জলদি মদিনা থেকে চলে যাও, নইলে ইমান ছিনিয়ে নেয়ার আশঙ্কা রয়েছে!

এই ঘটনা আমাদের শুনিয়ে আমাদের শায়েখ কেঁদে জারজার হয়ে যেতেন।

মদিনাবাসীর দাওয়াত

আমাদের শায়েখ আরেকটি বিষয়ের ওপর খুব গুরুত্ব দিয়ে বলতেন, তেমনিভাবে মদিনাশরিফের কোনো মুসলমান যদি কোনো কিছু খাওয়ার জন্যে দাওয়াত দেয়, তাহলে শরয়ি কোনো ওজর (সমস্যা) বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো সমস্যা না থাকলে সেই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। কারণ, মদিনাবাসীদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে মনে করতে হবে তারা যেনো স্বয়ং নবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর তরফ থেকেই দাওয়াত দিচ্ছে।

একমোহাদ্দিস সাহেব বলতেন, আমি একবার একাধারে কয়েকদিন মসজিদেনববিতে অবস্থান করছিলাম। কাছে কোনো খাদ্যদ্রব্য না থাকায় খুব খিদের কষ্টে ভুগছিলাম। দু'দিন অনাহারে চলে যাওয়ার পর যখন আর পারছিলাম না, তখন কী করা যায় তা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হয় আমি তো নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর মেহমান। তার রওজামোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলে কেমন হয়। আমি নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর রওজাশরিফের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর ওপর দরুদ সালাম পাঠিয়ে আল্লাহপাকের কাছে মোনাজাত করে বলি, "হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রিয়নবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর মেহমান হিসেবে এখানে হাজির হয়েছি! তাঁর মেজবানি দ্বারা আমার প্রয়োজন মিটাও।" আমি মোনাজাত করে সেখান থেকে পেছনের দিকে আসতেই কানে ভেসে আসে কে যেনো আমার নাম ধরে ডাকছে! সেই লোকের দিকে এগিয়ে গিয়ে খেয়াল করি, তার মাথায় একটি পাতিল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আমাকে খোঁজ করার কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান, দুপুরবেলা গভীর ঘুমে নিমগ্ন ছিলাম, এমন অবস্থায় স্বপ্নে দেখি নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] আমাকে বলছেন, মসজিদেনববিতে এই নামের আমার একজন মেহমান আছে, দ্রুতো তার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করো। ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথে রান্না ঘরে ছুটে গিয়ে দেখি, আমার স্ত্রী রান্না করে কাজ শেষ করে ফেলেছে। সবকিছু তাকে খুলে বলে রান্না করা খাবারগুলো নিয়ে একটুও দেরি না করে এখানে চলে এসেছি। আসার সময় স্ত্রীকে বলে এসেছি, আমাদেরকে জন্যে নতুন করে খাবার তৈরি করতে। স্বপ্নে শোনা নাম ধরে ডেকে এই আপনাকে পেয়ে গেছি।

রওজাশরিফে উপস্থিতি

হজরত শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দিসে দেহলভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, আমি রওজাশরিফ এ গিয়ে খেয়াল করে দেখি, হাদিসশরিফ পঠন পাঠনের সাথে সম্পৃক্ত আলেমদের অন্তরে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর রওজামোবারক থেকে একধরনের নুর (জ্যোতি) বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁদের হৃদয়কে আলোকিত করে দিচ্ছে। তাই সেই জায়গায় খুব আদব কায়দা রক্ষা করে ভালোবাসার সাথে অবস্থান করবো। এজন্যে সেখানে প্রবেশের সময়ই এতেকাফের নিয়ত করে নেবো।

হজরত আল্লামা ইউসুফ বিননুরি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলতেন, আমার দৃষ্টিতে গোটা মসজিদেনববিই 'মোয়াজাহশরিফ'-এর মতো। তাই তিনি যেখানে নামাজ পড়তেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রতি ধ্যান করে তাঁর ওপর দরুদ সালাম পড়তেন; কিন্তু ওলামায়েকেরাম লিখেছেন, সাধারণ নামাজের বেলায় এমনই করবে; তবে মাঝে মধ্যে মোয়াজাহশরিফের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

উপস্থিতির আগে দান করা

রওজাশরিফে জেয়ারতের নিয়ত করার পর দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে তওবা শেষে কিছু দান-খয়রাত করা দরকার। আমাদের আগের বুজুর্গানেকেরাম এই আমল করতেন। পবিত্রকোরআনের এক আয়াতে আল্লাহপাক বলেছিলেন, "তোমরা আমার প্রিয় নবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সাথে কথা বলতে চাইলে কিছু দান-খয়রাত করো।" তারপর হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] এই আয়াত নামার পর তার ওপর আমল করেন; কিন্তু মানুষের ওপর এটি কষ্টকর হয়ে যেতে পারে আশঙ্কায় আল্লাহপাক এই আয়াত মানসুখ (রহিত) করে দেন।

কিন্তু তারপরও আমাদের বড়োরা এর ওপর আমল করে দান-সদকা করতেন। তবে দান-খয়রাত করার অর্থ এই নয়, হাজার হাজার টাকা দান করতে হবে; বরং সবাই নিজ নিজ সামর্থ্যমতো দান করবে। সোওয়াবের মাত্রা বাড়তে থাকবে তার নিয়ত ও নিষ্ঠার ওপর ভয় করে। কেউ যদি একমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশি করার নিয়তে নিষ্ঠার সাথে সামান্য খেজুরের সিলকা পরিমাণ কিছু দান করে, তাহলে সে পাহাড় পরিমাণ সোয়াব পাবে। তাই খাঁটি নিয়তে অল্প দানই যথেষ্ট। তবে বেশি করলে আরও ভালো।

শায়খুলহাদিস হজরত জাকারিয়া [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর ব্যাপারে শুনেছি, তিনি যখনই রওজাশরিফ জেয়ারতে যেতেন, তখন কিছু না কিছু অবশ্যই দান-খয়রাত করতেন। কিছু দান না করে তিনি সেখানে হাজির হতেন না। একবার তিনি অন্যএকদেশ হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন, তখনও তিনি জেয়ারতের আগে দান-সদকা করে তারপর জেয়ারত করেন। হিসাব করে দেখা যায়, সেদিন তাঁর দানের পরিমাণ ছিলো দশ হাজার রিয়াল!

এই দান-খয়রাত করার পেছনে আরেকটি কারণ বা রহস্য হলো, দান-সদকা বালা-মসিবত দূর করে দেয় আর নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর অসন্তুষ্টির চেয়ে বড়ো বালা-মসিবত অন্যকিছু হতে পারে না। তাই সদকা করার এও একটি উদ্দেশ্য যে, আল্লাহপাক এর মাধ্যমে অসন্তুষ্টিজনিত সব বালা-মসিবত থেকে হেফাজত করবেন।

তারপর দরুদশরিফ পড়তে পড়তে মোয়াজাহশরিফের দিকে এগিয়ে যাবে। ফেকাহবিদরা লিখেছেন, রওজাশরিফে উপস্থিত হওয়ার আগে আপাতত সত্তরবার দরুদশরিফ পড়া বেশি ভালো। যদি রিয়াজুলজান্নাতে যাওয়ার সুযোগ

হয়, তাহলে খুব ভালোকথা, সেখানে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করে এই বলে দোয়া করবে, "হে খোদা! আপনার প্রিয়রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, কাউকে একবার জান্নাতে প্রবেশ করালে তাকে আর কোনো দিন বঞ্চিত করা হয় না। জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয় না। হে আল্লাহ! যেহেতু আপনি আজ আমাকে দুনিয়ার একটি জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, তখন আমাকে আর আখেরাতের জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন না।" এভাবে দোয়া করতে করতে এগিয়ে যাবে।

সেখানে পৌঁছার পর মাথায় রাখবে। আল্লাহপাক বলেছেন–

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

"আর যদি তারা যখন তাদের নিজেদের প্রতি জুলম করে আপনার কাছে আসে, এরপর তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আর তাদের জন্যে এস্তেগফার করে রাসুল (আপনি), তাহলে তারা অবশ্যই পাবে আল্লাহতায়ালাকে তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

এর অর্থ এই দাঁড়ায়, আমাদেরকেও গোনাহ থেকে তওবা করা জরুরি এবং দোয়া করবে, হে আল্লাহপাকের প্রিয়বন্ধু, আমাদেরকেও সুপারিশ করুন। যাতে করে আল্লাহপাক আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেন। মোয়াজাহশরিফে হাজির হয়ে দরুদ ও সালাম পেশ করবে। এজন্যেই হক্কানি আলেমদের লেখা বহু সুন্দর সুন্দর দরুদ ও সালাম রয়েছে, তার ফায়দাও লেখা আছে। তবে দরুদ সালাম পাঠাতে মনপ্রাণকে হাজির করে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে। কিছু কিছুলোক সেখানে গিয়ে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকাকে ভালো মনে করেন।

সেখানে কতোক্ষণ দাঁড়াবে?

আমাদের মুর্শিদ বা পির সাহেব বলতেন, যে নাগাদ মনপ্রাণ আগ্রহের সাথে সেখানে হাজির থাকবে, সে নাগাদ সেখানে দাঁড়াবে। চাই তা সামান্য সময়ই হোক না কেনো? আর যখন এদিক ওদিকের খেয়াল আসতে শুরু করে, তখন দ্রুতো সেখান থেকে সরে দাঁড়াবে। কারণ, সেখানে গিয়ে অন্যকিছু ধান্দা করা থেকে এদিক সেদিক মনোনিবেশ করে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে সেখান থেকে সরে আসাটাই ভালো। কারণ, তেমনটি করা নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সাথে চরম বেয়াদবির সামিল। প্রবাদ আছে, 'বেয়াদবি করার চয়ে দূরে থাকা ভালো।' বেশি বেশি সালাম পড়ার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে দোয়াও করবে।

একটি সূক্ষ্মবিষয়

আমাদের মুরব্বি হাকিমুলউম্মত শাহ আশরাফ আলি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলতেন, অনেক চেষ্টা প্রচেষ্টার পর কিতাব থেকে এই সূক্ষ্মবিষয়টি উদ্ধার

করেছি, যে দূর থেকে দরুদশরিফ পড়ে, তার দরুদ ফেরেশতা এনে পৌছিয়ে দেয় আর যে রওজাশরিফের কাছে এসে দরুদ পড়ে, তা আমি নিজে শুনি। এটি হাদিসশরিফের ভাষ্য। অর্থাৎ, কেউ কাছে এসে দরুদ পড়লে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] নিজে শুনেন। তাই সবার উচিত, রওজাশরিফের পাশে দাঁড়িয়ে কালেমাতাইয়্যেবা ও শাহাদতও পড়া দরকার। এরপর এই আবেদন করবে, হে আল্লাহপাকের প্রিয়রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]! আমি আপনার সামনে কালেমা পড়েছি, ইমান নবায়ন করছি, কেরামতের দিন দয়া করে আল্লাহপাকের সামনে আমার এই ইমানের সাক্ষী প্রদান করবেন। আর সেদিন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] কারো ইমানের সাফাই গাইলে তার বেড়া পার হতে আর লাগে কী? তাই এই বিষয়টি ভোলা যাবে না।

হুজ্জাতুলইসলাম কাসেম নানুতভির উপস্থিতি

হুজ্জাতুলইসলাম কাসেম নানুতভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] রওজাশরিফ জেয়ারত করে খুব হাসিখুশি ও উৎফুল্য মনে সতেজ বদনে বের হয়ে আসেন। কেউ একজন তা খেয়াল করে বলেন, আজ আপনাকে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত দেখা যাচ্ছে যে? তখন নিচের পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করেন–

میرے آقا کا مجھ پر تو ایسا کرم تھا
[মেরে আকা কা মুঝ পর তূ এইসা করম থা]

بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے
[ভর দিয়া মেরা দামান ফয়লানে সে পহলে]

یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے
[এহ এতনা করম কা আজব সিলসিলাহ হায়]

نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے
[নিশায়ে রঙ লায়া পিলানে সে পহলে]

তোমার তরে আমার মনিব
কতোই মেহেরবান
চাওয়ার আগেই আঁচলভরে
দিলেন দয়ার দান।

তাই তো ভাবি কোন কারণে
দিলেন এমন দান
লাগলো মনে সুরার নেশা
করার আগেই পান।

এরপর রওজার জালির দিকে তাকিয়ে আবৃত্তি করলেন–

چمکتی رہے تیرے روضے کا جالی

[চমকতী রাহে তেরে রওজে কা জালী]

سلامت رہے تیرے روضے کا منظر

[সালামত রাহে তেরে রওজে কা মানজার]

ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر

[হামেঁ ভী আতা হো ওহ শওকে আবূজর]

ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی

[হামেঁ ভী আতা হো ওহ রূহে বেলালী]

আলোর ধারায় ভাসুক সদা
তোমার মাজারখানি
বিপদ কোনো না পাক ছুঁতে
তোমার কবরখানি।

মোদের তরে দাওগো প্রিয়
আবুজরের ব্যথা
ওই বেলালের সুর লহরী
মহব্বতের গাঁথা।

মদিনাতাইয়েবা থেকে বের হওয়ার সময় কেমন প্রেম নিয়ে বললেন–

ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا

[হাযারোঁ বার তুঝ পর আয় মদীনাহয় ম্যাঁয় ফিদা হোতা]

جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا

[জো বস চলতা তো মর কর ভী নাহ ম্যাঁয় তুঝ সে জুদা হোতা]

ও মদিনা তোমার কাছে
একটি জিনিস চাই
হাজারবার এ জীবন নিয়ে
দেবে খানিক ঠাঁই!

বারেক যদি তোমার শীতল
পরশ আমার মিলে
মরেও তোমায় ছাড়ার কথা
আসবে নাকো দিলে।

নানুতুভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর এই কবিতাগুলোও খুবই প্রসিদ্ধ–

امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ

[ইমিদী লাখোঁ হেঁ লেকীন বড়ী উমীদ হায় ইয়েহ্]

کہ ہو سگان مدینہ میں نام میرا شمار

[কেহ হো সেগানে মদীনাহ মেঁ নাম মেরা শুমার]

جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں
[জিয়োঁ তু সাত সেগানে হারাম কে তেরে ফেরোঁ]
مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مور و مار
[মুরোঁ তু খায়েঁ মদীনাহ কে মুঝ কো মূর ও মার]
اڑا کے باد مری مشت خاک کو پس مرگ
[উড়া কে বাদ মেরী মুশতে খাম কো পছ মুরগ]
کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار
[উরে হুযূর কে রওজাহ কে আস পাস নেছার]

সবার মনে কতো আশা
একটি আশা মোর
ওই মদিনার মাটির কোলে
কাটবে আমার ভোর।

থাকলে জীবন ওই মদিনার
হাঁটবো কুকুর হয়ে
সাপ-বিচ্ছুর খোরাক হবো
মাটির নিচে শুয়ে।

ধূলো জ্ঞানে বাতাস তুমি
যাও মদিনা নিয়ে
প্রাণ হাদিয়া দেবে সেথা
এ অভাগা গিয়ে।

আল্লাহু আকবার! কেমন ছিলো তাঁদের হৃদয়ের বাসনা। মনের আকাঙ্খা!?

অন্তর কেমন হবে?

আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে সেখানে সবকিছু থেকে মুক্ত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হৃদয় নিয়ে হাজির হওয়ার সুযোগ দিন। দেখুন, আপনার কাছে যদি কেউ কোনো ময়লা মেশানো নাপাক অরুচিকর পাত্র এনে বলে, এতে দুধ ভরে দিন, তাহলে কিন্তু আপনি তাতে দুধ দিতে প্রস্তুত হবেন না। ঠিক তেমনি আমরাও যদি এমন গান্ধা, ময়লাযুক্ত অপবিত্র হৃদয় নিয়ে সেখানে যাই, তাহলে তাতে কোনো ধরনের নুর ঝরবে? কেমন রহমত ঝরবে? তাই হৃদয়-অন্তর পাক-পরিচ্ছন্ন করে সেখানে হাজির হলে তা ভরে নিয়ে সেখান থেকে ফিরতে পারবো। নিজেকে সেখানে পেশ করে বলবো, হে আল্লাহপাকের প্রিয়বন্ধু, এটিই সেই পবিত্র জায়গা, যেখান থেকে দীন-ইসলাম গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পরেছে। আপনি আপনার সাহাবাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশ্বময় পাঠিয়ে দিয়েছেন। হজরত মাআজ বিন জাবাল

[রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে পাঠিয়েছিলেন ইয়েমেনে। অমুককে অমুক দেশে, অমুককে অমুক অঞ্চলে, আমিও আজ সেই বরকতময় জায়গায় হাজির হয়েছি। আমাকেও কবুল করে নাও এবং দীনের সৈনিক হিসেবে আমাকে বিদায় জানাও। যাতে করে আমিও গিয়ে যেনো দীনের কাজ করতে পারি।

তারপর দেখতে পাবেন, আল্লাহপাকের তরফ থেকে কীভাবে রহমতের ফল্গুধারা ঝরতে থাকে? কেমন করুণা ঝরতে থাকে। এককবি এখানে হাজির হয়ে যেভাবে বলেছেন–

سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا

[সুচতা হোঁ ম্যাঁয় তব জনম লেতা]

جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا

[জানে ফের কিয়া সে কিয়া হোয়া হোতা]

چاند ہوتا تیرے زمانے کا

[চান্দ হোতা তেরে যমানে কা]

تیرے ہاتھوں سے میں بٹا ہوتا

[তেরে হাথোঁ সে ম্যাঁয় বাটা হোতা]

چاند ہوتا تیرے زمانے کا

[চান্দ হোতা তেরে যমানে কা]

حکم سے تیرے میں بٹا ہوتا

[হুকুম সে তেরে ম্যাঁয় বাটা হোতা]

پانی ہوتا وہاں کے چشموں کا

[পানী হোতা অহাঁ কে চশমোঁ কা]

تیرے قدموں پہ بہ گیا ہوتا

[তেরে কদমোঁ পেহ বেহ গিয়া হোতা]

ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا

[টুকড়া হোতা ম্যাঁয় এক বাদেল কা]

ساتھ تیرے میں گھومتا ہوتا

[সাথ তেরে ম্যাঁয় ঘুমতা হোতা]

پیڑ ہوتا کھجور کا کوئی

[পেড় হোতা খেজুর কা কোয়ী]

جس کا پھل تونے کھا لیا ہوتا

[জিস কা ফল তুনে খা লিয়া হোতা]

تیرے حجرے کے آس پاس کہیں
[তেরে হুজরে কে আস পাস কাহেঁ]

میں کوئی کچا راستہ ہوتا
[ম্যাঁয় কোয়ী কাচ্চা রাস্তাহ হোতা]

خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی
[খাক হোতা ম্যাঁয় তেরী গালিয়োঁ কী]

تیرے پاؤں کو چومتا ہوتا
[তেরে পাউঁ কো চুমতা হোতা]

আমার যদি জন্ম হতো
দূরের মদিনায়
মন খুশিতে উঠতো নেচে
কী জানি কী চায়!

কিংবা যদি চাঁদ হতাম
দূরের আকাশটায়
টুকরো হতাম ওই দু'হাতের
নুরের ইশারায়।

কিংবা যদি ঝর্ণা হতাম
সোনার মদিনায়
পানি হয়ে ভিজিয়ে দিতাম
নবির দু'টি পায়।

কিংবা যদি মেঘ হতাম
দূরের আকাশটায়
ছাতা হয়ে ছায়া দিতাম
দয়াল নবির গায়।

কিংবা যদি হতাম আমি
ওই খেজুরের বাঁধা
নবির হাতের ছোঁয়া পেয়ে
ভাঙতো আমার বাধা।

কিংবা যদি রাস্তা হতাম
নবির ঘরের পাশে
ধূলো হয়ে দিতাম চুমু

মুক্তি পাবার আশে।

আল্লাহু আকবার! এ কেমন আবেগ? কেমন আকাঙ্ক্ষা? কেমন প্রেম? কেমন ভালোবাসা? আমাদের তেমনি প্রেম আর আবেগ নিয়ে সেখানে হাজির হওয়ার সুযোগ দিন!

وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی
[ওহ জো শীরী সুখনী হায় মেরে মাক্কী মাদানী]

تیرے ہونٹوں کی چھنی ہے میرے مکی مدنی
[তেরে হোঁটো কী ছানী হায় মেরে মাক্কী মাদানী]

تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند
[তেরা ফয়লাউ বহুত হায় তেরা কামাত হায় বুলন্দ]

تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی
[তেরী ছাউঁ ভী খনী হায় মেরে মাক্কী মাদানী]

دست قدرت نے ترے بعد پھر ایسی تصویر
[দস্তে কুদরত নে তেরে বা'দ ফের এইসী তাসবীর]]

نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی
[নাহ বানায়ী নাহ্ বনী হায় মেরে মাক্কী মাদানী]

نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم
[নসল দর নসল তেরী যাত কে মাকরূয হেঁ হাম]

تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی
[তু গনী ইবনে গনী হায় মেরে মক্কী মাদানী]

তোমার কথার মিষ্টতাতে
ভরে আমার মন
ওই ঠোঁটেরই খানিক নড়ন
আমার প্রিয় ধন।

তোমার খ্যাতি ছাড়িয়ে জানি
আরব আজমজুড়ে
তোমার ছায়া পড়ছে আজো
সব অচিনপুরে।

কুদরতেরই হাতে আঁকা
তোমার নিখুঁত ছবি

মুছবে না তো কোনো দিনো
তোমার নিখুঁত ছবি।

মোদের প্রতি তোমার আছে
বিশাল বড়ো ঋণ
জীবন দিলেও হবে কী শোধ
তোমার প্রেমের ঋণ?

আমারা নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর রওজার পাশে গিয়ে বেশি বেশি দরুদ ও সালাম পাঠাবো। আশা করি আল্লাহপাক আমাদের এই উপস্থিতিকে কবুল করে নেবেন।

اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا
[আপনে দামানে শাফাআত মেঁ ছুপায়ে রাখনা]

میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا
[মেরে সরকার মেরী বাত বানায়ে রাখনা]

میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں
[ম্যাঁয় নে মানা কেহ্ গুনাহ্গার হো পর আপ কা হোঁ]

اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا
[ইস গুনাহ্গার সে সরকার নিভায়ে রাখনা]

ذرہٗ خاک کو خورشید بنانے والے
[যুরায়ে খাক কো খুরশীদ বানানে ওয়ালে]

خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا
[খাক হোঁ ম্যাঁয় মুঝে কদমোঁ সে লাগায়ে রাখনা]

লুকিয়ে রেখো আমায় তুমি
ক্ষমার চাদর দিয়ে
উতরে নিয়ো আমায় তুমি
নুরের নজর দিয়ে।

পাপী-তাপী হলেও আমি
তোমায় মানি নেতা
এ উসিলায় মুক্তি আমি
চাই যে পেতে হেথা।

তোমার ছোঁয়ায় পায় যে মাটি
পায় যে সোনা রূপ
চাই জড়াতে তোমার পায়ে
হয়ে ধূলোর রূপ।

লাজবাব মনোনয়ন

تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے
[থকী হায় ফিকরে রাসাঁ আওর মদাহ বাকী হায়]
قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے
[কলম হায় আবলাহ পা আওর মদাহ বাকী হায়]
ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے
[অরক তামাম হোয়া আওর মদাহ বাকী হায়]
تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے
[তামাম উমর লেক্‌খা আওর মদাহ বাকী হায়]

ফুরিয়ে গেছে শক্তি যতো
চিন্তা করার মতো
কিন্তু আজো রইলো বাকি
গাঁথা তোমার শতো।

লিখে লিখে ওই কলমের
কালী হলো শেষ
কিন্তু তোমার প্রশংসাগীত
হবে নাতো শেষ।

তোমার কথা লিখে লিখে
জীবন হবে শেষ
কিন্তু তোমার প্রশংসাগীত
হবে নাতো শেষ।

মানুষকে অনুগ্রহ দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন

মহান আল্লাহপাক মানুষজাতিকে বেশুমার অনুগহ দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন। তার দেহের দিকে তাকালেই দেখা যাবে আল্লাহপাক তাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, বাকশক্তি দিয়েছেন, শ্রবণশক্তি দিয়েছেন, হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়েছেন, জ্ঞান বিবেক বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন; কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এসবকিছু দেয়ার পরও দয়াময় আল্লাহপাক সামান্যতম তুলনা দেননি, খোঁটা দেননি। এরপর আল্লাহতায়ালা মানুষের জীবন ধারণের জন্যে খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে দিয়েছেন। রবিশস্যের দিকে তাকালে, তার রকমারি শ্রেণী-জাতের দিকে তাকালে হয়রান হয়ে যেতে হয়। নানা রঙ-আকৃতি ও স্বাদের ফলমূল দিয়েছেন। বিচিত্র বর্ণ, গন্ধ, ও স্বাদের পানীয় দিয়েছেন। পর্যাপ্ত পরিমাণ; কিন্তু এতোসব অনুগ্রহ দেয়ার পরও আল্লাহপাক একটিবারের জন্যেও ন্যূনতম তুলনা দিতে যাননি। খোঁটা দেননি। এরপর মানুষের বসবাসের জন্যে জমিন দিয়েছেন। মাটি দিয়েছেন। এই মাটির নিচে পানির নিচে নানা ধরনের খনিজসম্পদ রেখে দিয়েছেন। ধনভাণ্ডার তৈরি

করে রেখেছেন। লৌহজাতদ্রব্য এই জমিন বা ভূমি থেকে আহরণ করা হয়। যেসব গাছপালা থেকে কাঠ খড়ি জ্বালানী পেয়ে থাকি, এগুলো এই মাটি থেকে উৎপন্ন। মার্বেল ভূমি থেকে আহরিত। কাচের উপাদান ভূমি থেকে বের হয়। আমাদের বসবাস আর জীবন ধারণের জন্যে যাকিছু প্রয়োজন, তার সবকিছুই এই মাটি বা ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত; কিন্তু মহান আল্লাহপাক এসবের কোনো কিছুর জন্যেই কোনো ধরনের খোঁটা দেননি, তুলনা করেননি। এসব কিছু ছাড়াও আল্লাহপাক মানুষের জন্যে বায়ু তৈরি করেছেন, পানি সৃষ্টি করেছেন। চাঁদ-সূর্য সৃষ্টি এবং তাদের সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিচালিত করছেন। শুধু তাই নয়, গোটা সৃষ্টিজগতকেই আল্লাহপাক মানুষের জন্যে সাজিয়েছেন। এসব অনুগ্রহের কোনোটির জন্যেই আল্লাহপাক কোনো তুলনা দেননি। তাঁর অনুগ্রহের প্রতি খোঁটা দেননি।

মহাঅনুগ্রহ

আল্লাহপাক এসবকিছু ছাড়াও তাঁর বান্দাদের এক মহাঅনুগ্রহ দান করেছেন, যে অনুগ্রহ দিয়েও (দাতা) খুশি, আমরা পেয়েও খুশি। দেয়ার মাঝে সুখ, আবার পাওয়ার মাঝেও সুখ। সেই সুখানুভূতিতে আবেগাপ্লুত হয়ে তাঁর মহান দাতা তা দিয়ে অন্যদের কাছে বলেও বেড়িয়েছেন। খোঁটা দিয়েছেন। তুলনা দিয়ে বলেছেন–

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا .

"নিশ্চয়ই আল্লাহপাক মোমিনদের প্রতি দয়া আর কৃপা করেছেন, তাদের মাঝে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন।"

এটি এতো বড় বিশাল অনুগ্রহ, মহাঅনুদান। মহান আল্লাহপাক তাঁর পবিত্রকোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় তা আলোচনা করে সে জন্যে খোঁটা দিয়েছেন। সেই মহান অনুদানের কথা বলে তাঁর কৃপার তুলনা দিয়েছেন। কারণ, সেই অনুগ্রহটি একটি স্পেশাল বা বিশেষ অনুগ্রহ। সোবহানাল্লাহ! সত্যি সত্যিই আমরা এর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো না। আমাদের সেই নবির প্রশংসা করে ফুরাতে পারবো না। কারণ, তাঁর প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহপাক তাঁর পবিত্রকোরআনে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

"(আর হে রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]!) আমি আপনার আলোচনা (মর্যাদাকে) সমুন্নত ও মহিমান্বিত এবং উঁচু করেছি।"

তাহলে সেখানে তাঁর আলোচনা সাধারণ মানুষ আর কতোই উন্নত করতে পারবে? আমাদের ভাষা তাঁর প্রশংসা বর্ণনায় অক্ষম। আমরা কোমড়ে গামছা বেঁধে তাঁর প্রশংসায় লেগে গেলেও তা ঠিকঠিক আদায় করতে পারবো না।

এজন্যেই তো এক আরব কবি নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রশংসায় চল্লিশ হাজার পঙক্তি রচনার পরও সব শেষে বলেছেন–

تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے
[থকী হায় ফিকরে রাসাঁ আওর মদাহ বাকী হায়]

قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے
[কলম হায় আবলাহ পা আওর মদাহ বাকী হায়]

ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے
[অরক তামাম হোয়া আওর মদাহ বাকী হায়]

تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے
[তামাম উমর লেক্‌খা আওর মদাহ বাকী হায়]

ফুরিয়ে গেছে শক্তি যতো
চিন্তা করার মতো
কিন্তু আজো রইলো বাকি
গাঁথা তোমার শতো।

লিখে লিখে ওই কলমের
কালী হলো শেষ
কিন্তু তোমার প্রশংসাগীত
হবে নাতো শেষ।

তোমার কথা লিখে লিখে
জীবন হবে শেষ
কিন্তু তোমার প্রশংসাগীত
হবে নাতো শেষ।

যেমনটি আরেকজন বলেছেন–

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَ يَا سَيِّدَ الْبَشَرِ
[ইয়া স-হিবাল জামালি ওয়া ইয়া সাইয়িদাল বাশার]

مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيْرِ لِقَاءَ نُوْرِ الْقَمَرِ
[মিওঁ অজহিকাল মুনীরি লিকা-উ নূরিল কমার]

لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءَ كَمَا كَانَ حَقُّهُ
[লা য়ুমকিনুস্‌ সানা-উ কামা কানা হক্কুহূ]

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
[বাদ আয খোদা বুযুরগ্‌ তুয়ী কিচ্ছাহ মুখতাসার]

সুন্দরেরই আঁধার তুমি
মানব জাতির সেরা
চাঁদমাখা ওই মুখটি তোমার
সদাই নুরে ঘেরা।

খোদার পরে সেরা তুমি
নেই তুলনা যার
বলবো কি আর গল্প তোমার
কিসসা মোখতাসার।

وہ ہیں بیشک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں
[ওহ হেঁ বেশক বাশার লেকীন তাশাহুদ মেঁ আযানোঁ মেঁ]
جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد انکا نام آئے
[জাহাঁ দেখো খোদা কে নাম কে বা'দ উনকা নাম আয়ে]
মানুষ হলেও এ দুনিয়ায়
শ্রেষ্ঠ তাঁরি শান
তাশাহুদ আর ওই আজানে
বাড়লো আরো শান।

খুঁজলে কভু ব্যাকুল হিয়া
নবির মধুর নাম
দেখতে যে পাই খোদার পরেই
আছে নবির নাম।

আল্লাহু আকবার! এভাবে মাওলানা মানাজির আহসান গিলানি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] 'আন্নাবিউল খাতিম' নামে একটি কিতাব লিখেছেন, যাতে চারশো পঞ্চাশটি বিষয় জায়গা পেয়েছে। সেখানে তিনি নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, দুনিয়ার বুকে যারা এসেছেন, তারা চলে যাওয়ার জন্যেই এসেছেন এবং চলে গেছেনও বটে; কিন্তু এমন এক মহান ব্যক্তি এসেছেন, তিনি এসেছেন যেনো এসেছেনই–

لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں
[লাখ সিতারে হার তরফ জুলমতে শব জাহাঁ জাহাঁ]

ایک طلوع افتاب دشت و نگر بحر و بر
[এক তুলুয়ে আফতাব দাশ্‌ত ওয়া নেগার বাহরো বর]
লক্ষ তারার মিছিল যখন
চলছে আকাশজুড়ে চলে
আঁধারঘেরা এই পৃথিবীর

যায় কি আঁধার চলে?

কিন্তু যখন প্রভাতরবি
হাসলো আকাশকোণে
আর পাবে কি আঁধারছায়া
এই পৃথিবীর কোণে।

কবি ইকবাল সোহেল লিখেছেন–

کتاب فطرت کے ہر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا
[কিতাবে ফিতরত কে হার ওয়ারক পেহ জো নাম আহমদ রকম নাহ হোতা]

تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجد لوح و قلم نہ ہوتا
[তো নকশে হাস্তী উভর নাহ সেকতা উজূদে লওহ ওয়া কলম নাহ হোতা]

تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا
[তেরে গোলামোঁ মেঁ ভী নুমায়াঁ জো তেরা আকস্ করম নাহ হোতা]

تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا
[তো বারগাহে আযল সে তেরা খেতাব খয়রুল উমাম নাহ হোতা]

نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا
[নাহ রুয়ে হক সে নেকাব উঠতা নাহ জুলমতোঁ কা হিজাব উঠতা]

فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا
[ফুরুগে বখশে নেগাহ উরফাঁ আগার চেরাগে হেরেম নাহ হোতা]

জন্মখাতার পাতায় পাতায়
নাম যদি না হতো
আঁধারঘেরা এই পৃথিবী
আলোর দেখা পেতো?

সৃষ্টি হতো লওহ-কলম
সৃষ্টি হতো নদী
সাগর পানে ছুটতো কিরে
বইতো কিরে নদী?

তোমার নামের গোলাম যারা
ধন্য হলো তারা
মুক্তি পেলো নামের গুণে
পাপী-তাপী সারা।

তোমার নামের সুর লহরি
শুনি সকাল সাঝে

তাইতো মনের গহীনকোণে
সদাই এ সুর বাজে।

মুক্তি পেলো জগতবাসী
মোহাম্মদের নামে
ধন্য জীবন যায় যদি প্রাণ
দয়াল নবির প্রেমে।

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর স্তুতি বর্ণনা করতে গিয়ে হুজ্জাতুলইসলাম কাসেম নানুতভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] লিখেছেন–

سب سے پہلے مشیت کے انوار سے
[সব সে পহলে মাশয়াত কে আনওয়ার সে]
نقش روئے محمد بنایا گیا
[নকশে রুয়ে মোহাম্মদ বানায়া গায়া]
پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی
[ফের উসী নকশ সে মাঙ্গকর রোশনী]
بزم کونین و مکاں کو سجایا گیا
[বযমে কাউনাইন ও মাকাঁ কো সাজায়া গায়া]
وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی
[ওহ মোহাম্মদ ভী আহমদ ভী মাহমূদ ভী]
حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی
[হুসনে মুতলাক কা শাহেদ ভী মাশহুদ ভী]
علم حکمت میں وہ غیر محدود بھی
[এলমে হিকমত মেঁ ওহ গায়রে মাহদূদ ভী]
ظاہرا امیوں میں اٹھایا گیا
[যাহেরান উম্মিয়োঁ মেঁ উঠায়া গিয়া]

খোদার চাওয়ায় প্রথম এলো
মোহাম্মদের নুর
সে নুরেতেই সৃষ্টি হলো
সন্ধ্যা, দুপুর, ভোর।

প্রশংসারই সব নামে
ডাকে সবাই তাঁকে
জ্ঞান ও গুণে সবার সেরা
মানে সবাই তাঁকে।

জগত মাঝে তিনিই সেরা
জানেন সবার বেশি
তবুও তিনি থাকেন সদা
অজানাদের বেশী।

অন্যএককবি বলেছেন–

لوح بھی تو قلم بھی تو ترا وجود الکتاب
[লোহ ভী তো কলম ভী তো তেরা উজূদ আল কিতাব]

گنبد آب گیناں رنگ تیرے محیط میں حباب
[গুম্বদে আবেগীনা রং তেরে মহীত মে হুবাব]

شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود
[শওকতে সাঞ্জার ও সালীম তেরে জালাল কী নমূদ]

فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب
[ফখরে জুনাইদ ও বায়জীদ তেরা জামাল বে নেকাব]

شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام
[শওক আগার তেরা না হো মেরী নামায কা ইমাম]

میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب
[মেরা কিয়াম ভী হেজাব মেরা সুজূদ ভী হেজাব]

تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے
[তেরী নেগাহে নাজ ছে দোনু মুরাদ পা গ্যায়ে]

علم غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب
[ইলম গিয়াব ও জস্তোজু এশক হুজুর ও এজতেরাব]

লওহ তুমি কলম তুমি
তুমি কিতাব যেনো
তুমি ছাড়া এ দুনিয়া
লাগে আমার হেনো।

ওই মিনারের রঙ যে সবুজ
তাইতো প্রিয় তা
আমার কাছে ওটাই প্রিয়
তোমার প্রিয় যা।

শাহজাদাদের রাজত্ব শান
তোমার দেয়া দান
দরিদ্রদের করুণ মুখে

দেখি রাজার শান।

প্রেমটা ইমাম না হয় যদি
কি বা হবে মোর
সেজদা-রুকু সবই বৃথা
কাটবে না তো ঘোর।

তোমার নজর পেয়েই আমার
হয়েছে পাওয়া সব
তুমিই আমার হাজার চাওয়া
তুমিই আমার রব।

বুদ্ধি যখন প্রেমের দেশে
মরছে খুঁজে পথ
প্রেমটা পেয়ে মুচকি হাসে
প্রেমনগরের রথ।

নিকট অতীতে হজরত নাফিস শাহ নামে একবুজুর্গ গিয়েছেন। রসুলপ্রেমে তিনিও পাগল ছিলেন। নবিকে নিয়ে তিনি একটি দারুণ কবিতা লিখেছেন–

اے رسول امیں خاتم المرسلیں
[আয় রাসুলে উম্মী খাতামুল মুরসালীন]
تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں
[তুঝ সা কোয়ী নেহী তুঝ সা কোয়ী নেহী]
ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقیں
[হায় আকীদাহ এহ আপনা বসিদক ও একীন]
تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں
[তুঝ সা কোয়ী নেহী তুঝ সা কোয়ী নেহী]
بزم کونین پہلے سجائی گئی
[বযমে কাউনাইন পহলে সাজায়ী]
پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی
[ফের তেরী যাতে মুনাযযার পেহ লায়ী গায়ী]
سید الاولین سید الاخرین
[সাইয়েদুল আওয়ালীন সাইয়েদুল আখেরীন]
تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں
[তুঝ সা কোয়ী নেহী তুঝ সা কোয়ী নেহী]

دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے
[দস্তে কুদরত নে এ্যয়সা বানায়া তুঝে]

جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے
[জুমলাহ আওসাফ সে খোদ সাজায়া তুঝে]

اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین
[আয় আযাল কে হাসীন আয় আবাদ কে হাসীন]

تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں
[তুঝ সা কোয়ী নেহী তুঝ সা কোয়ী নেহী]

مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا
[মোস্তফা মোজতাবা তেরী মাদাহও ছানা]

میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں
[মেরে বস মেঁ নেহী দসতরস মেঁ নেহী]

دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں
[দিল কো হিম্মত নেহী লব কো ইয়ার নেহী]

تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں
[তুঝ সা কোয়ী নেহী তুঝ সা কোয়ী নেহী]

کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں
[কোয়ী বাতলায়ে কেয়সে সারাপা লিকখোঁ]

کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں
[কোয়ী হায় ওহ্ কেহ্ মাঁয় জিস কো তুঝ সা কাহোঁ]

توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں
[তওবাহ তওবাহ নেহী কোয়ী তুঝ সা নেহী]

تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں
[তুঝ সা কোয়ী নেহী তুঝ সা কোয়ী নেহী]

اے سراپا نفیس انفس دو جہاں
[আয় সারাপা নফসুন নাফীসে দো জাহাঁ]

سرورِ دلبراں دلبرِ عاشقاں
[সারেসে দিলবরাঁ দিলবর আশেকাঁ]

ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزیں
[ঢুন্ডতী হায় তুজে মেরী জান হাযী]

تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں

[তুঝ সা কোয়ী নেহী তুঝ সা কোয়ী নেহী]

উম্মি নবি শ্রেষ্ঠ ও শেষ
নেই তুলনা যাঁর
জগত মাঝে নবির মতো
নেই তো কেহ আর।

বিশ্বাসেতে পূর্ণ হৃদয়
বলছে বারংবার
জগত মাঝে নবির মতো
নেই তো কেহ আর।

আপন হাতে গড়লো
তোমায় দয়ারও মালিক
তাই তো হলে তুমি নবি
গুণেরও মালিক।

সুন্দরেতে শ্রেষ্ঠ তুমি
নেই তুলনা যার
জগত মাঝে নবির মতো
নেই তো কেহ আর।

দুনিয়াটা সাজিয়ে দিয়ে
পাঠালেন তোমায়
রহমতের কাণ্ডারী
করলেন তোমায়।

সব নবির প্রথম তুমি
তুমি সবার শেষ
পাইনি খুঁজে তোমার মতন
করে জগত শেষ।

সর্ব গুণে গুণী তুমি
নির্বাচিত তুমি
কাটলে পাবে দেখতে মনে
শুধুই তুমি তুমি!

মনের মাঝে নেই তো সাহস

মুখেতে নেই কথা
এ জীবনে তুমি ছাড়া
বলবো কী আর কথা।

বলবে কী কেউ কেমন করে
লিখবো নবির কথা
কে বা আছে যেজন বলে
নবির মতন কথা।

তওবা তওবা বলছো মন
নেই তুলনা যার
জগত মাঝে নবির মতো
নেই তো কেহ আর।

দু'জাহানের মহান নেতা
প্রেমিককুলের মন
তোমার প্রেমে কাঁদছে সবে
কাঁদছে সবার মন।

তোমায় খুঁজে করছি যে সার
জীবনও আমার
জগত মাঝে নবির মতো
নেই তো কেহ আর।

কোনো এককবি শেষ পর্যন্ত এসে এভাবে বলেন–

هزار بار بشویم دهن زمشک وگلاب
[হাজার বার বশুয়েম দাহান যেমেশ্‌ক ও গোলাব]

هنوز نام تو گفتان کمال بے ادبی است
[হুনোয নাম তো গুফতান কামাল বে আদবী আস্ত]

হাজারবার এ মুখ ধুয়েছি
মেশ্‌ক-গোলাপ জলে
তাও কি পোড়া এই মুখেতে
নামটি নেয়া চলে?

আমার মুখ মেশক আম্বর আর গোলাবজল দিয়ে হাজারবার ধোয়ার পরও তোমার নাম (এই মুখে) উচ্চারণ করা পুরোপুরি বেয়াদবি।

একটি সূক্ষ্মবিষয়

সাধারণ নিয়ম হলো, দুনিয়ার যেকেউই তার একান্ত প্রিয়ব্যক্তির জন্যে সবসময় তার সামর্থ্যের সবোর্চ্চটা দিয়ে সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে পছন্দনীয় আর সবচেয়ে

উন্নত মানের সামগ্রীটাই পছন্দ ও নির্বাচন করে। যেমন একজন মমতাময়ী ধানাঢ্য মা তার একমাত্র আদরের মেয়ের বিয়ের সময় তার জন্যে যেসব জিনিসপত্র গয়নাগাটি কিনবে, তা অবশ্যই হবে বাজারের সেরা সবচেয়ে উন্নত মানসম্মত। কারণ, সেই মেয়েটির জন্যেই তার সংসারের সবকিছু। সে-ই একমাত্র তার উত্তরাধিকারী। আবার একমাত্র সন্তান হওয়ায় হৃদয়ের সব ভালোবাসা শুধু তার জন্যেই। এককথায় সবাই তার সবচেয়ে প্রিয়মানুষের জন্যে সবচেয়ে প্রিয়জিনিস পছন্দ ও চয়ন করে। ঠিক তেমনি আল্লাহতায়ালাও তার সবচেয়ে প্রিয়রাসুল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সবার সেরা সবচেয়ে উন্নত বস্তুগুলোই মনোনীত করেছেন। নির্বাচন করেছেন। যার সাথে অন্যকিছুরই তুলনা হয় না। যাকে বলে, লাজবাব মনোনয়ন। যে নির্বাচন ও চয়নের কোনো বিকল্প হয় না। জবাব থাকে না।

যেমন সাধারণত কারো আবেদনের প্রেক্ষিত কোনো কিছু দেয়া হয়। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ব্যাপারেও আবেদন করা হয়েছিলো। সেই আবেদনকারী হিসেবে যাঁকে আল্লাহপাক মনোয়ন দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন (নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর পরই) বিশ্বের সেরা মানুষ হজরত ইবরাহিম, যিনি ছিলেন খলিলুল্লাহ তথা আল্লাহপাকের একান্ত বন্ধু, সেই সাথে আবুল আম্বিয়া বা নবিদের জনক।

নবিদের জনকের পরীক্ষা

আবুল আম্বিয়া হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-কে নানানভাবে কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয় এবং সব পরীক্ষাতেই তিনি খুব কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। সেসব পরীক্ষার মধ্যে চারটি পরীক্ষার কথা এখানে আলোচনা করছি–

১. তাঁকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ছোড়া হয়; ২. তাঁর স্ত্রী-সন্তানকে

بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

"জনমানবশূন্য ধুধু মরুভূমির মাঝে সহায় সম্বলহীনভাবে ফেলে আসতে হয়।"

৩. আপন কলিজার টুকরা আদরের সন্তানকে নিজ হাতে আল্লাহর নামে জবাই করতে হয়। আর ৪. নিজ হাতে বায়তুল্লাহশরিফ নির্মাণ করতে হয়। এসব পরীক্ষার ব্যাপারে আল্লাহপাক নিজেই বলেছেন–

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

"হে রাসুল, আর স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন আমি ইবরাহিমকে বেশ কিছু জটিল কঠিন পরীক্ষায় ফেলি। অবশ্য সে খুব ভালোভাবে (গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে) উৎরে যায়, উত্তীর্ণ হয়।

আমি তাঁকে আরও বলি–

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানুষের প্রধান নেতা (ইমাম) বানাবো।"

মুখেতে নেই কথা
এ জীবনে তুমি ছাড়া
বলবো কী আর কথা।

বলবে কী কেউ কেমন করে
লিখবো নবির কথা
কে বা আছে যেজন বলে
নবির মতন কথা।

তওবা তওবা বলছো মন
নেই তুলনা যার
জগত মাঝে নবির মতো
নেই তো কেহ আর।

দু'জাহানের মহান নেতা
প্রেমিককুলের মন
তোমার প্রেমে কাঁদছে সবে
কাঁদছে সবার মন।

তোমায় খুঁজে করছি যে সার
জীবনও আমার
জগত মাঝে নবির মতো
নেই তো কেহ আর।

কোনো এককবি শেষ পর্যন্ত এসে এভাবে বলেন–

ہزار بار بشویم دہن زمشک وگلاب
[হাজার বার বশুয়েম দাহান যেমেশ্‌ক ও গোলাব]

ہنوز نام تو گفتان کمال بے ادبی است
[হুনোয নাম তো গুফতান কামাল বে আদবী আস্ত]

হাজারবার এ মুখ ধুয়েছি
মেশ্‌ক-গোলাপ জলে
তাও কি পোড়া এই মুখেতে
নামটি নেয়া চলে?

আমার মুখ মেশক আম্বর আর গোলাবজল দিয়ে হাজারবার ধোয়ার পরও তোমার নাম (এই মুখে) উচ্চারণ করা পুরোপুরি বেয়াদবি।

একটি সূক্ষ্মবিষয়

সাধারণ নিয়ম হলো, দুনিয়ার যেকেউই তার একান্ত প্রিয়ব্যক্তির জন্যে সবসময় তার সামর্থ্যের সবোর্চ্চটা দিয়ে সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে পছন্দনীয় আর সবচেয়ে

উন্নত মানের সামগ্রীটাই পছন্দ ও নির্বাচন করে। যেমন একজন মমতাময়ী ধানাঢ্য মা তার একমাত্র আদরের মেয়ের বিয়ের সময় তার জন্যে যেসব জিনিসপত্র গয়নাগাটি কিনবে, তা অবশ্যই হবে বাজারের সেরা সবচেয়ে উন্নত মানসম্মত। কারণ, সেই মেয়েটির জন্যেই তার সংসারের সবকিছু। সে-ই একমাত্র তার উত্তরাধিকারী। আবার একমাত্র সন্তান হওয়ায় হৃদয়ের সব ভালোবাসা শুধু তার জন্যেই। এককথায় সবাই তার সবচেয়ে প্রিয়মানুষের জন্যে সবচেয়ে প্রিয়জিনিস পছন্দ ও চয়ন করে। ঠিক তেমনি আল্লাহতায়ালাও তার সবচেয়ে প্রিয়রাসুল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সবার সেরা সবচেয়ে উন্নত বস্তুগুলোই মনোনীত করেছেন। নির্বাচন করেছেন। যার সাথে অন্যকিছুরই তুলনা হয় না। যাকে বলে, লাজবাব মনোনয়ন। যে নির্বাচন ও চয়নের কোনো বিকল্প হয় না। জবাব থাকে না।

যেমন সাধারণত কারো আবেদনের প্রেক্ষিত কোনো কিছু দেয়া হয়। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ব্যাপারেও আবেদন করা হয়েছিলো। সেই আবেদনকারী হিসেবে যাঁকে আল্লাহপাক মনোয়ন দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন (নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর পরই) বিশ্বের সেরা মানুষ হজরত ইবরাহিম, যিনি ছিলেন খলিলুল্লাহ তথা আল্লাহপাকের একান্ত বন্ধু, সেই সাথে আবুল আম্বিয়া বা নবিদের জনক।

নবিদের জনকের পরীক্ষা

আবুল আম্বিয়া হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-কে নানানভাবে কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয় এবং সব পরীক্ষাতেই তিনি খুব কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। সেসব পরীক্ষার মধ্যে চারটি পরীক্ষার কথা এখানে আলোচনা করছি–

১. তাঁকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ছোড়া হয়; ২. তাঁর স্ত্রী-সন্তানকে

بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

“জনমানবশূন্য ধুধু মরুভূমির মাঝে সহায় সম্বলহীনভাবে ফেলে আসতে হয়।”

৩. আপন কলিজার টুকরা আদরের সন্তানকে নিজ হাতে আল্লাহর নামে জবাই করতে হয়। আর ৪. নিজ হাতে বায়তুল্লাহশরিফ নির্মাণ করতে হয়। এসব পরীক্ষার ব্যাপারে আল্লাহপাক নিজেই বলেছেন–

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ

“হে রাসুল, আর স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন আমি ইবরাহিমকে বেশ কিছু জটিল কঠিন পরীক্ষায় ফেলি। অবশ্য সে খুব ভালোভাবে (গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে) উৎরে যায়, উত্তীর্ণ হয়।

আমি তাঁকে আরও বলি–

قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

“নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানুষের প্রধান নেতা (ইমাম) বানাবো।”

সোবহানাল্লাহ! ইমামতির পদটা আল্লাহপাকই নির্বাচন করে দান করেছেন। এরপর আল্লাহপাকের ঘর (কাবাশরিফ) নির্মাণ শেষ হলে আল্লাহপাক বলেন, হে ইবরাহিম, আপনি আমার কাছে দোয়া করুন, আবেদন জানান। আমি সবার যথার্থ প্রাপ্য দিয়ে থাকি। আপনার দোয়াও কবুল করে নেবো।

ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর দোয়া

হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] আল্লাহর কাছে মোনাজাত ধরে বলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়ার মালসম্পদ কিছুই চাই না। আল্লাহ বলেন, তাহলে চাওটা কী? যা চাও, বলো, দিয়ে দেবো। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এমন জিনিস চাই, যা আর কোথাও নেই, শুধু আপনার কাছে এবং মাত্র একপিসই আছে। সেই অনুগ্রহ আপনার কাছে চাই। যার কোনো বিকল্প নেই, যার কপিটি নেই। আর তা হচ্ছে বিবি আমেনার চোখের মণি, আখেরিনবি হজরত মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]। তাঁকে আমার বংশে রাসুল বানিয়ে পাঠাবেন।

সোবহানাল্লাহ! হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর দুই দোয়ার প্রেক্ষিত প্রথমত হজরত ইসমাইল [আলায়হিসসালাম]-কে দান করেন এবং দ্বিতীয় হজরত মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে দান করেন। প্রথমজন ছিলেন জমজমঅলা আর দ্বিতীয়জন ছিলেন কাউসারঅলা। জমজমঅলাকে বাল্যকালে তাঁর বাবা জিজ্ঞেস করেন, হে ছেলে! আমি স্বপ্নে দেখলাম তোমাকে জবাই করছি। আল্লাহর তরফ থেকে তোমাকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করার নির্দেশ এসেছে। এ ব্যাপার তোমার মতামত কী? সাথে সাথে ছোট্টশিশু বলে ওঠেন–

يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ

"আপনি যে ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করে ফেলুন, আমাকে ইনশাআল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।"

সোবহানাল্লাহ! একেই বলে বাপ কা বেটা। ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর দোয়ার ফসল একজন জাবিহুল্লাহ, অন্যজন হাবিবুল্লাহ। ইবরাহিম শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিমহৎ, মর্যাদাবান, বুজুর্গ। আল্লাহপাক এমন মহান-সম্মানী লোককে নির্বাচন করেছেন তাঁর প্রিয়রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কামনা করে দোয়া করার জন্যে। আখেরিনবির জন্যে আবেদনকারী হিসেবে। মহান আল্লাহর কাছে আবেদন করে তিনি বলেন–

رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا

"হে আমার আল্লাহ! এই উম্মতের মাঝে (আমার বংশে) একজন রাসুল পাঠান।"

এ ব্যাপারে খোদ নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, আমি হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর দোয়ার ফসল হিসেবে দুনিয়ায় আগমন করেছি।

এরপর সময় ঘনিয়ে আসার প্রাক্কালে তাঁর আগমনীবার্তা শুনিয়ে দেয়ার জন্যে জনগণের মাঝে তা ঘোষণা করার ব্যবস্থা করেন মহান আল্লাহ। যেমন, নামাজের সময় হলে একজন আজান দিয়ে বলেন নামাজের প্রস্তুতি নিতে, এরপর জামাতের সময় হয়ে গেলে আবার ঘোষণা করে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতে। তেমনি হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]-এর মাধ্যমে আবেদন জানানোর পর তাঁর আগমনের সময় এগিয়ে এলে তার ঘোষণা করিয়ে নেয়া হয় হজরত ইসা [আলায়হিসসালাম]-এর মাধ্যমে, তিনি ঘোষণা করেন–

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

"আমার পরে একজন রাসুল আসবেন, যার নাম হবে আহমাদ।"

সাধারণত কোনো অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আগমনী ঘোষণাদানকারী বলে থাকেন আমি প্রধান অতিথি আর আপনাদের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকতে চাই না, তাই তিনি দ্রুতো মঞ্চ ত্যাগ করেন। তেমনি হজরত ইসা [আলায়হিসসালাম]ও আখেরিনবি আর উম্মতের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি না করে দ্রুতো সেই নবুয়তের মঞ্চ থেকে নেমে পরেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্তও আর অপেক্ষা না করে সরাসরি (দায়িত্বে ইস্তফা নিয়ে) আকাশে চলে যান এবং শেষ মুহূর্তে এই আখেরি নবির উম্মত হিসেবে সেখান থেকে আবার দুনিয়ার চলে আসবেন। যার জন্যে দোয়া করা হয়, তিনি হাবিবুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম], আবেদন/দোয়াকারী খলিলুল্লাহ [আলায়হিসসালাম], ঘোষণাকারী ছিলেন রুহুল্লাহ [আলায়হিসসালাম]।

ভাষা মনোনয়ন

এরপর নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে দুনিয়ায় পাঠানো হয়। আগেই বলেছি, আল্লাহপাক তাঁর প্রিয়রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্যে সবকিছুই সেরা সেরা মনোনীত করেছিলেন। সে হিসেবে তাঁকে বিশ্বের সেরা ভাষা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তখনও পৃথিবীতে হাজার হাজার ভাষা চালু ছিলো। ইবরানি ভাষা ছিলো, সুরিয়ানি ভাষা ছিলো, আরও সব ভাষাই ছিলো; কিন্তু তারপরও আল্লাহপাক তাঁকে একনম্বর আরবি ভাষা দান করেন। আরবি ভাষা সেরা কেনো? সে আলোচনায় এখন যাবো না, তবে সে ভাষা যে অন্যযেকোনো ভাষার চেয়ে প্রাঞ্জল, অল্প শব্দে বেশি অর্থ প্রদান করে, তার শুধু একটি উদাহরণ দেবো। যেমন ধরুন, আল্লাহপাক নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ভাষায় আমাদের নামাজ পড়ার আদেশ দেবেন, সেটি যদি বাংলা ভাষায় দিতে যান, তাহলে বলতে হবে, তোমরা নামাজ পড়ো! ইংরেজিতে Offer Your prayer (অফার ইউর প্রেয়ার) আর উর্দুতে যা আরবির কাছাকাছি ভাষা 'তুম নামাজ পড়হো;' কিন্তু সেই নির্দেশটি আরবি ভাষায় দেয়া হয়েছে। صَلُّوْا (সল্লু) একটি শব্দের মাধ্যমেই। তাই অল্পশব্দের বেশি অর্থ প্রকাশ

করা আর ফাসাহাত বালাগাতের ক্ষেত্রে (সাহিত্য ও অলঙ্কারিত্বে) আরবি ভাষার কোনো জুড়ি বা তুলনা নেই।

سمجھ میں صاف آجائے فصاحت اسکو کہتے ہیں

[সামঝ মেঁ সফ আজায়ে ফাসাহাত উসকো কাহতে হেঁ]

اثر ہو سننے والے پر بلاغت اسکو کہتے ہیں

[আছর হো সুননে ওয়ালে পর বালাগাত উসকো কাহতে হেঁ]

স্পষ্ট করে হয় যে কথা
'ফাসাহাত' তার নাম
মনে কাঁপন দেয় যে কথা
'বালাগাত' তার নাম।

তাই এককথায় সর্বধিক দিয়েই সেরা ভাষা (আরবি ভাষা) নির্বাচন করা হয়েছিলো আমাদের প্রিয়রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্যে। শুধু তা-ই নয়, আরবি ভাষা সেরা হওয়ার কারণে এই ভাষাতেই পবিত্রকোরআন নেমেছে; আবার এই ভাষাতেই সবাই জান্নাতে কথা বলবে। এককবি বলেন–

سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی

[সুনা হায় ওহাঁ হোগী বূলী আরব কী]

مگر ہم نے سیکھی ہے انگش غضب کی

[মাগার হাম নে সীখি হায় ইংলিশ গজব কী]

শুনি সেথায় হবে না-কি
আরবি কথা বুলি
আমরা ভুলে আজ শিখেছি
ইংরজিরই বুলি!

আরবি ভাষা সেরা বলে আরবরা তো শুধু তাদেরকেই বাকশক্তিসম্পন্ন মনে করে, অন্যদের বলতো 'আজমি' বাকহীন বা বোবা!

শহর নির্বাচন

এবার নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে পাঠানোর জায়গাটার দিকে একটু খেয়াল করুন, আল্লাহপাক চাইলে তো তাকে পৃথিবীর যেকোনো দেশে, যেকোনো প্রান্তে পাঠাতে পারতেন। ফ্রান্স, রাশিয়া, ইরাক, মিশর বা অন্যকোনো দেশে। কিন্তু না, তিনি যেহেতু সৃষ্টির কেন্দ্রীয় চরিত্রে, তাই তাঁকে পাঠানো হয়েছে বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রের একদম মধ্যভাগে। যাকে বলা হয় পৃথিবীর নাভী। সেই মক্কা নগরীতে। যেখানে আল্লাহপাক সর্বপ্রথম (এবাদতের জন্যে) ঘর তৈরি করেছেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেছেন, তোমরা সবাই পৃথিবীর একদম মধ্যভাগে অবস্থান করছো (মক্কাতে)। বিশ্বমানচিত্র সামনে

রাখলে দেখা যায়, সত্যি সত্যি মক্কানগরী (সৌদিআরব) পৃথিবীর একদম মধ্যখানে অবস্থিত।
হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] যেমন সৃষ্টির মধ্যমণি, তাই তাঁকে পাঠানো হয়েছে পৃথিবীর মধ্যভাগে, সেরা জায়গায়। উদ্দেশ্য, পানিতে ভারি কিছু ছোড়ার পর যেমন সেখান থেকে ঢেউ ওঠে চারদিকে ছড়িয়ে পরে, তেমনি যেনো নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]–এর দাওয়াতের কাজ (দীন-ইসলাম) পৃথিবীর মাঝখান থেকে গোটা বিশ্বে সমান্তরালে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ কারণেই তাঁকে পৃথিবীর মধ্যভাগে সেরা জায়গায় আল্লাহপাকের ঘরের পাশে পাঠিয়েছিলেন।

বংশ নির্বাচন

এরপর নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বংশ বা গোত্রের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন। অনেক সময় বহুলোক বড়ো কোনো পদ পেলেও তার গোত্র বা বংশ নিচু হলে তাকে মানুষ সেভাবে মূল্যায়ন করে না। এজন্যে সম্ভ্রান্ত বংশ বা গোত্রের একটা আলাদা ইমেজ, ভিন্ন মর্যাদা আর স্বতন্ত্র মূল্যায়ন রয়েছে। তাই মহান আল্লাহপাক তাঁর প্রিয়নবি হজরত মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে বিশ্বের সেরা ও সম্ভ্রান্ত গোত্রে পাঠিয়েছিলেন। হজরত ইসমাইল [আলায়হিসসালাম]-এর গোত্র বনিইসরাইল পৃথিবীর প্রাচীন সম্ভ্রান্ত গোত্র হিসেবে আখ্যায়িত, তারই ভেতর আবার সেরাদের সেরা রয়েছে। সেই বনিইসরাইলের ভেতর ছিলো চুয়াল্লিশটি গোত্র, যেমন বনুসাকিফ, বনুনাজির, বনুখাজরাজ প্রভৃতি; কিন্তু সেই সেরাদের সেরা বিচারে সবার ওপরে ছিলো কোরাইশগোত্র, যা শত্রু-মিত্র ভেদে সর্বজন স্বীকৃত। কোরাইশ শব্দের একটি অর্থ দৃঢ়তা, স্থিরমনা, যার কোনো নড়চড় হয় না। সর্বক্ষেত্রেই এই গোত্রের লোকের নামের সাথে কামের পুরোপুরি মিল বিদ্যমান ছিলো। এই কোরাইশবংশেরই একটি উপশাখা ছিলো বনুহাশেম, যা ছিলো এই কোরাইশ গোত্রেরও সেরা শাখা। এই বনুহাশেমেই আল্লাহর প্রিয়রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] পৃথিবীতে আগমন করেন। এই শাখার একটি বিশ্বস্বীকৃত ও প্রশংসিত দিক বা গুণ ছিলো মেহমানদারী বা আতিথেয়তা। এদের আতিথেয়তা শুধু মানুষের মাঝেই সীমিত ছিলো না, তা ছিলো আকাশদারী পাখীদের মাঝেও বিস্তৃত। তাদের শিশু-কিশোররা যেনো সবসময় আকাশের পাখিদের মাঝে খাবার বিলাতে মত্ত থাকতো। এতেই তারা আনন্দ পেতো, বিনোদিত হতো। এমন অতিথিপরায়ণ গরিব নেওয়াজ বংশে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] জন্ম নেন।

অন্যএক অনুদান

এরপর খেয়াল করুন, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর দাদা ছিলেন আব্দুল মোত্তালিব। তাঁর আসল নাম ছিলো শাইবা। খুবই সুদর্শন ছিলেন;

কিন্তু জন্মগতোভাবে তাঁর একগুচ্ছ চুল সাদা ছিলো। যেহেতু বুড়ো হয়ে গেলে চুল পেকে সাদা হয়ে যায়, আর আরবিতে পাকা চুলো লোকদের বলে শাইবা, তাই তাঁকে সবাই (আদর করে) শাইবা বলে ডাকতে থাকে। একপর্যায়ে সেটিই তাঁর নামে পরিণত হয়ে যায়।

তিনি শৈশবেই এতিম হয়ে যান। ফলে মায়ের সাথে নানির বাড়ি মদিনায় চলে যেতে বাধ্য হন এবং খুবই দুঃখে-কষ্টে সেখানেই বেড়ে উঠতে থাকেন।

মক্কার হারেসি গোত্রের একভদ্রলোক মদিনায় যান। সেখানে দেখতে পান বেশ কিছু কিশোর তীরন্দাজির অনুশীলন করছে। তাদের মধ্যকার মলিন বসনে কমনীয় ও কান্তিময় চেহারার এককিশোরের তীর একবারও লক্ষচ্যুত হচ্ছে না। আর সে লক্ষ্যে আঘাত হানার সাথে সাথে সে আনন্দে উল্লাস প্রকাশ করে বলছে, দেখতে হবে না? তীরটা ছুড়ছে কে? আমি কোরাইশ বংশের সন্তান, তাই আমার তীর কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না! কোরাইশের নাম শুনে তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। এরপর সেই কিশোরটির ব্যাপারে জানতে চাইলে একজন বলে ওঠেন, সে অমুক গোত্রের অমুকের সন্তান। বাবা মারা যাওয়ার পর এতিম হয়ে মায়ের সাথে এখানে নানীর বাড়ি চলে আসে; কিন্তু এদের আর্থিক অবস্থা এখন খারাপ হয়ে যাওয়ায় সে খুবই কষ্টে অনেকটা মানবেতর জীবনযাপন করছে; কিন্তু ছেলেটি খুবই প্রতিভাবান। একে নিয়ে এর মা ভীষণ বিপাকে পরে আছে।

তিনি ছিলেন আব্দুল মোত্তালিবের ঘনিষ্ট বন্ধু। মক্কায় ফিরে এসেই সরাসরি চলে যান তাঁর কাছে। তুমি এলাকার সর্দার। সম্ভ্রান্ত নামি দামি মানুষ; ব্যাপক প্রভাব নিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছো। অথচো তোমার আপন ভাতিজাটির কোনো খোঁজ খবর রাখো? তোমার ভাই মারা যাওয়ার পর সেই এতিম ছেলেটি এখন মায়ের সাথে মামার বাড়ি করুণ জীবনযাপন করছে, আমি নিজ চোখে যা দেখে এসেছি, তাতে আমার চোখের পানি এসে গিয়েছিলো, তোমার ভেতর মানবতা বলতে কি কিছু নেই? এরপর হারেসি তাকে সবকিছু খুলে বলেন। তার কথাগুলো আব্দুল মোত্তালিবের হৃদয়ে ভীষণভাবে আঘাত করে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাস্তবতার ধূলোবালিতে ঢাকতে বসা অতীতের ধূসর স্মৃতিগুলো, নাড়া দিয়ে ওঠে তার ঘুমন্ত বিবেক, সাথে সাথে প্রতিজ্ঞা করে বসেন, আমার এতিম ভাতিজাটি ফিরে না আনা পর্যন্ত আমি স্থির হয়ে বসবো না।

এরপর আর দেরি না করে তখনই ছুটে চলেন মদিনার উদ্দেশ্যে। ভাবিকে (শাইবার মাকে) তার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলে তিনি প্রথমে অস্বীকৃতি জানান যেমনটি জানিয়ে থাকে পৃথিবীর প্রতিটি মা-ই। যতো কষ্ট আর ঝড়-ঝাপটাই আসুক না কেনো। আপন কলিজার টুকরাকে কখনোই বুক ছাড়া করতে চান না; কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরা যখন খুব করে বুঝাতে থাকেন, তখন ধীরে ধীরে নরম হতে থাকেন। একপর্যায়ে যখন সবাই বলে শাইবার মতো সুন্দর, সাহসী, মেধাবী ও প্রতিভাবান কিশোর এ তল্লাটে একটিও নেই। এভাবে

এই পরিবেশে থাকলে তার মেধা, প্রতিভা আর যোগ্যতার কোনো রকম বিকাশ তো ঘটবেই না, বরং আরও ওগুলোর অপমৃত্যু ঘটবে। আর যদি সে কোরাইশদের মাঝে নিজ বংশে ফিরে যায়, তাহলে উন্নত পরিবেশে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে নিজেকে সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসনে নিয়ে যেতে পারবে। তাতে আপনিও ধন্য হবেন, গর্ব করতে পারবেন এবং আপনার চোখ শীতল হবে। তখন ছেলের উন্নতি ও মঙলের কথা চিন্তা করে মা রাজি হয়ে যায় এবং প্রাণ খুলে দোয়া দিয়ে তাকে তার চাচার সাথে নিজ বংশে পাঠিয়ে দেন। আব্দুল মোত্তালিব তাকে নিজ বাহনের পেছনে বসিয়ে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা করেন।

একে তো পুরনো পোশাক, তার ওপর পেছনে বসার কারণে ধূলোবালিতে তা আরও জীর্নশীর্ণ অবস্থা, সেই সাথে আদরের মাকে ছেড়ে হঠাৎ করে (বহুদিন পর অনেকটা) নতুন জায়গায় চলে আসা, সব মিলিয়ে তাকে যে অবস্থায় দেখা যাচ্ছিলো, তাছাড়া আরবের নিয়ম মতো কৃতদাসদের এভাবেই নিয়ে আসতে দেখে অভ্যস্ত মক্কাবাসী স্বাভাবিক কারণেই মনে করে আব্দুল মোত্তালিব একটি গোলাম কিনে আনছেন অবশ্যই। তাই তারা বলে ওঠে, 'হে আবদুল মোত্তালিব (মোত্তালিবের গোলাম)!' তার পর থেকে প্রায় সবাই তাকে আব্দুল মোত্তালিব বলে সম্বোধন করতে থাকে। বুড়ো (শাইবা) হয়ে ওঠে ভাগ্যের পরিহাসে মোত্তালিবের গোলাম আর কালের পরিক্রমায় সেটি তাঁর নামে পরিণত হয়ে যায়।

সে চাচার কাছে মক্কাতেই বাস করতে থাকে। আল্লাহপাক তাঁকে জন্মগতোভাবে অসামান্য যোগ্যতা ও প্রতিভা দিয়েছিলেন। যাকে বলা হয় খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা, দ্রুতো পরিস্থিতি অনুধাবন, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, সহমর্মিতা, কল্যাণকামিতা এসব গুণের সমাহার ছিলো তার ভেতর পুরোপুরিভাবে। যার কারণে যৌবনকালেই গোত্রের সবাই মিলে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাঁকে তাদের নেতা মনোনীত করে নেয় এবং বায়তুল্লাহশরিফের চাবি তাঁর হাতে তুলে দেয়। ধীরে ধীরে বয়সের সাথে সবকিছুতেই পরিণত ঘটায় তিনি পরিণত হয়ে যান মক্কার অবিসংবাদিত নেতা আর কাবাশরিফের সর্বজনগ্রাহ্য মোতাওয়াল্লি হিসেবে।

আল্লাহপাক নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর দাদা হিসেবে তাঁকে নির্বাচন করেছিলো, যিনি ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাবান পদের অধিকারী, পবিত্র কাবাঘরের অভিভাবক আর তার চাবি রক্ষণাবেক্ষণকারী। সোবহানাল্লাহ! এই চাবি যদি অন্যকারও দায়িত্বে থাকতো, তাহলে তাদের বলার সুযোগ থাকতো নবিপরিবারের চেয়ে আমাদের পরিবারের মর্যাদা অনেক বেশি; কিন্তু আল্লাহপাক সেই দরোজা বন্ধ করে দিয়েছেন। কেউ-ই আর বংশের দিক থেকে তাঁর চেয়ে সেরা ও সম্ভ্রান্ত বলে দাবি করার সুযোগ পাবে না।

সম্মানিত বাবা নির্বাচন

বারোটি যোগ্য ছেলে। যাকে বলে, 'বাপকা বেটা সেপাইকা ঘোড়া!' আল্লাহপাক ইচ্ছে করলে এই বারো ভাইয়ের যেকোনো কাউকে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সম্মানিত বাবা হিসেবে নির্বাচন করতে পারতেন। তার ঔরসেই জন্ম নিতেন আখেরিনবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]; কিন্তু এই যোগ্যদের ভেতরও ছিলেন যোগ্যতম যোগ্যতর।

আল্লাহপাক এক্ষেত্রে যে শুধু যোগ্যতার বিবেচনাই সামনে রেখেছেন তা কিন্তু নয়। যোগ্যতা সততার পাশাপাশি তাদের নামের দিকটাকেও অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, তাদের অনেকের নামই ছিলো সে যুগের প্রথা মতো মূর্তি বা প্রতিমার নামানুসারে, যা ছিলো শিরকের পর্যায়ের। যেমন একজনের নাম ছিলো আব্দুলউজ্জা, আরেকজনের আব্দুশশামস ইত্যাদি। এর বাইরেও কিছু নাম ছিলো; কিন্তু সেগুলোও অর্থের বিবেচনায় সুন্দর ও কোমল ছিলো না। এদের কারও ঔরসে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] জন্ম নিলে অনেকে বাবার নাম নিয়েও প্রশ্ন তুলতে পারতো; কিন্তু আল্লাহ সে সুযোগ না দিয়ে যাঁর নাম পৃথিবীর ভেতর সর্বশ্রেষ্ঠ (হাদিসের ভাষায়), সেই আব্দুল্লাহর ঔরসেই তাঁর জন্ম দিয়েছেন, আব্দুল্লাহ অর্থ আল্লাহর বান্দা। সেই সাথে তিনি ছিলেন বাবার মতোই আরবের সেরা সুন্দর।

তাঁর কপালে একটি নুর চমকাতো। যার তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে আরবের একখ্রিস্টান তরুণী তাঁকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে। এতে [হয]রত আব্দুল্লাহ অস্বীকৃতি জানালে সেই তরুণী কোনোধরনের রাখঢাক না রেখে [বি]য়ে না করলেও আপাতত) তার সাথে যৌনোসম্পর্ক গড়ার আবেদন জানায়। [হয]রত আব্দুল্লাহ সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমি কখনই এমন [কো]নো অশ্লীল ও গর্হিত কাজ করতে পারবো না। যার জন্যে আমাকে সমাজের কাছে লজ্জা পেতে হবে। এমন সুন্দর নামের পুতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী একজন মহৎপুরুষকে আল্লাহপাক নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সম্মানিত বাবা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন।

সৃষ্টিগতোভাবে সৎচরিত্র

নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, আমি এমন পবিত্র ও চরিত্রবান বংশে জন্ম নিয়েছি, যে বংশধারায় হজরত আদম [আলায়হিসসালাম] পর্যন্ত কোথাও কোনো চরিত্রহীন বাবা-মা ছিলো না। তাঁদের কেউই জেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হননি। আল্লাহু আকবার! সৃষ্টিগতোভাবেই চরিত্রবান বংশধারায় তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর সম্মানিত বাবার নাম ছিলো আব্দুল্লাহ, তাঁকে জাবিহুল্লাহও (আল্লাহর পক্ষে জবাইকৃত) বলা হতো। এর কারণ হচ্ছে, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর দাদা মান্নত করেছিলেন, আমার

যদি বারোটি সন্তান হয়, তাহলে একজনকে আল্লাহর নামে কোরবানি দেবো। আল্লাহপাক তাঁকে বারোজন সন্তান দান করেন। ফলে মান্নত পুরো করতে গিয়ে কাকে কোরবানি দেবেন তা নির্ধারণ করার জন্যে লটারি করেন; কিন্তু তাতে বার বার হজরত আব্দুল্লাহর নামই শুধু ওঠে। তখন লোকজন আর মুরব্বিরা বলে, এমন চাঁদের মতো ফুটফুটে সন্তানকে কীভাবে কোরবানি করবে? কিন্তু মান্নত যে পুরো করতেই হবে? অবশেষে সবাই পরামর্শ দেয় সন্তানের বদলে উট কোরবানি দিতে। তারপর তা-ই করার উদ্দেশ্যে একদিকে বিশ উট, অন্যদিকে আব্দুল্লাহর নাম লিখে লটারী করেন, তাতেও সেই আব্দুল্লারই নাম ওঠে। তারপর প্রতিবার উটের সংখ্যা বিশটি বাড়িয়ে লটারী চালাতে থাকে; কিন্তু সেই একই ফলাফল। অবশেষে একশো উট লিখে লটারী করলে এবার ওঠে আসে উটের নাম। আব্দুল মোত্তালিব একশো উট কোরবানি করে দেন। এরপর তাঁর উপাধী হয়ে যায় 'জাবিহুল্লাহ'

একবার একগেঁয়ো লোক নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে দুই জাবিহুল্লাহর ছেলে বলে সম্বোধন করেন। এতে তিনি মুচকি হেসে বলেন, হ্যাঁ, সে ঠিকই বলেছে। কারণ, আমার পূর্বপুরুষ হজরত ইসমাইল [আলায়হিসসালাম] যেমন জাবিহুল্লাহ ছিলেন, তেমনি আমার আপন বাবা হজরত আব্দুল্লাহও ছিলেন জাবিহুল্লাহ।

প্রিয়সুধী, যেমন ছিলেন দাদা, তেমন ছিলেন তাঁর সম্মানিত বাবাও সে যুগের সেরা মানুষ।

মা নির্বাচন

আল্লাহতায়ালা নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর মা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বহু সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। আব্দুল্লাহর সাথে মেয়ে বিয়ে দেয়ার জন্যে আরবের (মেয়ের) বাবারা লাইন ধরে থাকতো। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহপাক তাঁর স্ত্রীর ক্ষেত্রে শুধু রূপ-গুণই দেখেননি। নামের দিকটাও বিবেচনায় রেখেছিলেন। তাঁর সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া মেয়েদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজনের নাম ছিলো খানসা। খানসা অর্থ স্থূলকায় নারী। আরেকজনের নাম ছিলো হরবা। অর্থ যুদ্ধবাজ, ঝগড়াটে, ডাকিনি; কিন্তু আল্লাহতায়ালা এদের বাদ রেখে যাঁকে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর মা হিসেবে নির্বাচন করেন, তাঁর নাম ছিলো আমেনা, অর্থ, আমানতদার। নিরাপদ। যাঁর কোলে আল্লাহপাক আখেরিনবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর আমানত দেবেন, তাঁকে তো আমানতদার হতেই হবে!

সোবহানাল্লাহ! কতোসুন্দর নাম! শুধু নামেই নয়; বরং কাজেও ছিলেন তিনি অদ্বিতীয়া। সবধরনের গুণের সমাহার ছিলো তাঁর মাঝে। সবাই তাঁর প্রশংসা করতো। তাঁর নামের ভেতরই ছিলো বিশেষ ধরনের বরকত আর রহমত। বলা আছে, হজরত ইসমাইল [আলায়হিসসালাম] একমহিলাকে বিয়ে করেন। কিছুদিন পর হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] দেশ থেকে ছেলের বাড়ি বেড়াতে

আসেন। হজরত ইসমাইল [আলায়হিসসালাম] তখন বাড়ি ছিলেন না। হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, সবাই কেমন আছে? দিন পথ কীভাবে চলছে? তিনি বলেন, চলছে কোনো মতে। তবে অভাব অনটন লেগেই আছে। একবেলা খেলে আরেক বেলা না খেয়ে থাকতে হয়। তাঁর কথার ভেতর পরিষ্কার আল্লাহপাকের প্রতি অসন্তুষ্টি আর অকৃজ্ঞতা ফুটে ওঠে। হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] চলে যাওয়ার সময় বলে যান, আমি যাচ্ছি, তবে ইসমাইল বাড়ি এলে তাঁকে বলো, একজন এধরনের মানুষ এসেছিলেন। যাওয়ার সময় তিনি ঘরের চৌকাট বদলানোর কথা বলে গেছেন। তারপর হজরত ইসমাইল [আলায়হিসসালাম] বাসায় এলে স্ত্রী তাকে ঘটে যাওয়া সবকিছু খুলে বলেন। তখন তিনি বলেন, উনি তো ছিলেন আমার আব্বা হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] আর ঘরের চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলার অর্থ হলো তোমাকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দেয়া।

হজরত ইসমাইল [আলায়হিসসালাম] তাকে তালাক দিয়ে আরেকটি বিয়ে করেন। ঘটনাক্রমে আবার একদিন বাসায় আসেন হজরত ইবরাহিম। এদিনও হজরত ইসমাইল [আলায়হিসসালাম] বাসায় ছিলেন না। তিনি নতুন বৌমাকে জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছে তারা? এবং তাদের সংসার চলছে কীভাবে। জবাবে তিনি জানান, খুব ভালো আছি, খুবই সুখ-শান্তিতে কাটছে আমাদের জীবন। কোনো ধরনের সমস্যা নেই। এজন্যে আল্লাহপাকের লাখো শুকরিয়া।

হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম] ফিরে যাওয়ার সময় বলে যান, তোমার স্বামী ফিরে এলে বলবে, তিনি যেনো ঘরের চৌকাঠ ভালোভাবে যত্ন করে রাখেন।

হজরত ইসমাইল [আলায়হিসসালাম] ফিরে এলে স্ত্রী তাকে সবকিছু খুলে বলেন। শুনে তিনি বলেন, উনি ছিলেন আমার আব্বাজান হজরত ইবরাহিম [আলায়হিসসালাম]। তাঁর সেই কথার অর্থ হচ্ছে, তুমি খুব ভালো মানুষ। দীনদার পরহেজগার। আমি যেনো সবসময় তোমার খোঁজ-খবর রাখি। ঠিকমতো যত্ন নিই।

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, যেহেতু হজরত ইসমাইল [আলায়হিসসালাম]-এর বংশে আখেরিনবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] জন্ম নেবেন আর ইসমাইল [আলায়হিসসালাম]-এর প্রথম স্ত্রী ছিলো আল্লাহপাকের প্রতি অকৃতজ্ঞ; কিন্তু আল্লাহপাক চাননি এমন রক্তধারায় নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর আগমন ঘটুক, তার কোথাও কোনো কমতি থাক। কোনো অকৃতজ্ঞ মানুষের রক্ত তাঁর রক্তের সাথে মিশে থাকুক। আল্লাহু আকবার! বলা যায় নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর মাও ছিলেন একজন সতী আমানতদার নারী। হিজরতের সময় এই আমানতের দায়িত্ব পালন করেছেন দু'জন দু'ভাবে। একজন হজরত আলি, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি

ওয়াসাল্লাম] তাঁর কাছে কাফেরদের যেসব সম্পদ আমানত ছিলো, সেগুলো সবার কাছে ঠিকমতো পৌছে দেয়ার আমানত দিয়েছিলেন তাঁর ওপর। আর দ্বিতীয়জন হজরত আবুবকর [রদিয়াল্লাহু আনহু]। তিনি স্বয়ং নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে মদিনায় পৌছে দেয়ার আমানত পালন করেছিলেন। আল্লাহপাক এই আমানত পালনকারী আমেনাকে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর মা হিসেবে নির্বাচন করেন।

নাম নির্বাচন

আর একটু সামনে এগুলে দেখা যাবে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সম্মানিত নাম নির্বাচন ছিলো কী চমৎকার! পবিত্রকোরআনে তাঁর একটি নাম উল্লেখ হয়েছে 'আহমাদ' (বেশি প্রশংসাকারী), তার অর্থ হচ্ছে, যিনি আল্লাহপাকের এ পরিমাণ প্রশংসা করেছেন, সৃষ্টিজগতের মাঝে আর কেউ-ই সে পরিমাণ প্রশংসা করেনি। করতে পারবেও না। যা একমাত্র নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর পক্ষেই সম্ভব। এটি ছিলো তাঁর একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য। তাঁর আরেক নাম পবিত্রকোরআনে উল্লেখ আছে, মোহাম্মদ (বেশি প্রশংসিত), তার অর্থ হচ্ছে, যার এতো বেশি প্রশংসা করা হয়েছে, সৃষ্টিজগতে সে পরিমাণ প্রশংসা আর অন্যকারো করা হয়নি। তিনি আহমাদও, মোহাম্মাদও। বাস্তবেও সব দিক থেকে এই নামদুটি শুধু তাঁর সাথেই যায়। সেই সাথে আরেকটি বিষয় হলো, ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আর কারো এই নাম রাখা হয়নি।

একনজরে দেখতে গেলে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ভাষা সেরা আরবি ভাষা। তাঁর জন্মস্থানও সেরা স্থান পবিত্র মক্কাতে। তাঁর গোত্রও সেরা, সে গোত্রের শাখাও সেরা। সে গোত্রের শাখাও সেরা। তাঁর দাদা সেরা। বাবা সেরা, মাও সেরা আর তার নামও সেরা। সেই সাথে তাঁর গোত্রের শাখাও সেরা, তার অর্থও সুন্দর।

যদি অন্যসব সেরা নাম তথা নবিদের নামের সাথেও যদি তুলনা করা যায়, তাহলেও তাঁর নাম থাকবে সেরাদের সেরা কাতারে। যেমন আদি পিতার নাম হজরত আদম [আলায়হিসসালাম]। আদম অর্থ হচ্ছে, গধুম বর্ণ বা গমের রঙ। নুহ অর্থ, বিলাপকারী। জাকারিয়া অর্থ, স্মরণকারী, ইদ্রিস অর্থ, পাঠদানকারী, ইউসূফ অর্থ, আফসোসকারী, ইয়াকুব অর্থ, পরে আগমনকারী, মুসা অর্থ, পানি থেকে নির্গত আর ইসা শব্দের অর্থ হচ্ছে, পর্যটক বা ভ্রমণকারী। নবিদের এসব অবশ্যই সুন্দর, ভালো নাম, তবে হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর নাম আরও সুন্দর, সব নামের চেয়ে সেরা। শুনতে, বলতে, অর্থের দিক থেকেও। তথা আহমাদ ও মোহাম্মাদ!

দুধ মা নির্বাচন

শিশুনবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর দুধ মাকেও নির্বাচন করা হয়েছে নামে গুণে সেরা। তাঁর নাম ছিলো হালিমা সাদিয়া। কী চমৎকার নাম? হালিমা

অর্থ হচ্ছে, বেশি সহনশীলা, ধৈর্যশীলা। আর সাদিয়া অর্থ সৌভাগ্যবতী। তাঁর গোত্রের নামও বনুসাদ। অর্থ, ভাগ্যবান গোত্র। তাঁর ভেতর নামের অর্থের ব্যাপক প্রভাব ছিলো।

শিশু প্রতিপালনের জন্যে মায়ের ভেতর সবচেয়ে বড়ো যে গুণটি থাকতে হয়, তা হলো ধৈর্য, সহনশীলতা। কারণ, শিশুরা নানাভাবে বিরক্ত করে থাকে। মা যদি সহনশীলা না হন, তাহলে শিশু একটু কান্না করলেই তাকে ধমক দিয়ে বসেন। থাপ্পড় কষে দেন। টেনে হেঁচড়ে উঠান, একহাত ধরে ছেঁচড়ে নিয়ে যান। ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দেন। নিচে ফেলে দেন অথবা অন্যকোনো না কোনো উপায়ে রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। কারণ, ওই একটাই, সহনশীলতা ও ধৈর্যের অভাব।

যেখানে দু'জাহানের সর্দার আল্লাহপাকের প্রিয়রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রতিপালনের ব্যাপার, সেখানে অবশ্যই বিশাল হৃদয়ের অধিকারী উদার মনের মায়ের দরকার। ছোটো, সংকীর্ণমনা ধৈর্যহীন মানুষ দিয়ে কাজ হবে না। কারণ, শিশুরা অনেক সময় অভিমান করে বসে, কোনো সময় মায়ের ওপর চটেও যায়, তারপরও মায়েরা তাকে বশ করে বা মানিয়ে নিতে হয়। এসব বিরক্তি ও ঝামেলা শুধু তারাই সইতে পারেন, যাদের কলিজা বড়ো। হৃদয় বিশাল, ধৈর্য প্রচুর, সহনশীলতা অসামান্য। মহান আল্লাহপাক তাঁর প্রিয়নবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রতিপালনের জন্যে এসব গুণের অধিকারী মাকেই নির্বাচন করেছিলেন। যিনি ছিলেন হজরত হালিমা সাদিয়া [রদিয়াল্লাহু আনহা]।

স্ত্রীদের নির্বাচন

এরপর আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয়নবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্যে স্ত্রীদের নির্বাচন করেন। এটি একটি স্বতন্ত্র ও লম্বা বিষয়। তাঁর এক একজন স্ত্রী ছিলেন সব গুণের আঁধার। বংশমর্যাদায় সম্ভ্রান্ত, শান্তিপরায়ণা, উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের শুধু নামের অর্থের দিকে তাকালেই অনেক কিছু অনুমান করা যায়। যেমন হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রথম স্ত্রী ছিলেন হজরত খাদিজা [রদিয়াল্লাহু আনহা]। যার অর্থ, হাজিদের সেবাকারী। হজরত সাওদা- প্রশান্তিদায়িনী; ৩. আয়েশা–সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপনকারিনী; ৪. হাফসা (এবাদতে) রাতজাগরিনী; ৫. মাইমুনা-ভাগ্যবতী; ৬. সাফিয়া-নির্বাচিতা, মনোনিতা; ৭. জয়নব-এস্তেগফারকারিনী; ৮. উম্মেসালমা-শান্তির জননী আর ৯. উম্মেহাবিবা-প্রেয়সী।

আল্লাহপাক হুজুর [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর জীবনের বাঁকে বাঁকে যেসব স্ত্রী দিয়েছিলেন, নামে গুণে তাঁরা অতুলনীয়া। যেমন নাম, তেমন কাম এবং সবদিকে থেকেই পৃথিবীর অন্যসব নারী থেকে তাঁরা ছিলেন একদম

আলাদা। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে কথা আল্লাহপাক পবিত্রকোরআনে নিজেই বলেছেন–

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ۔

“হে নবির সহধর্মিনীরা! তোমরা কিন্তু অন্যনারীদের মতো নও।” তোমরা একদম যাচাই বাছাই করা নির্বাচিত রমনী।
এই কোরআনের আয়াত বলছে, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর স্ত্রীরাও বিশেষভাবে নির্বাচিত। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর জন্যে তো স্বয়ং জিবরাইল [আলায়হিসসালাম] আগমন করেছিলেন এবং এসে তাঁর ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, এঁকে আল্লাহপাক আপনার জন্যে চয়ন করেছে!

চারিত্রিক সনদপত্র

দেখুন, পৃথিবীর বুকে অপবাদের সীমা নেই। চরিত্রবতীদের ওপরও অনেক সময় অপবাদ লাগানো হয় এবং হয়েছেও। যেমন, হজরত ইসা [আলায়হিসসালাম]-এর মা হজরত মরিয়ম [আলায়হাসসালাম]-এর ওপর অপবাদ আরোপ করা হলে কোলের শিশু হজরত ইসা [আলায়হিসসালাম] নিজেই দোলনা থেকে সাক্ষ্য দেন। হজরত ইউসুফ [আলায়হিসসালাম]-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا (একদুধের শিশু তাঁর পক্ষে সাক্ষী হয়ে সাক্ষ্য দেয়)। আর হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর পবিত্র স্ত্রী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিরুদ্ধে মুনাফেকরা দুর্নাম রটিয়ে অপবাদ দেয়, সেখানে আল্লাহপাক কোনো শিশু দিয়েও সাক্ষ্য দেয়াতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা না করে আল্লাহপাক বলেন, না, তা হবে না হে আমার প্রিয়বন্ধু, শত্রুরা আপনার ইজ্জত-সম্মানের ব্যাপারে কথা বলছে, আমি সবার মনের ভেদ জানি। আমি নিজেই তাঁর চারিত্রিক সনদপত্র প্রদান করছি, পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

পবিত্র সন্তান

এরপর আরও একটু সামনের দিকে তাকালে দেখা যাবে আল্লাহপাক নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্যে সন্তান হিসেবে যাঁদের নির্বাচন করেছিলেন, তাঁরাও ছিলেন পুতঃপবিত্র, খুবই ভালো। মেয়েদের প্রসঙ্গে তো কিছুই বলার সুযোগ রাখে না। ক্ষণকালের মেহমান হয়ে আসা ছেলেসন্তানের নামগুলোও ছিলো কতো সুন্দর! কী চমৎকার! একজনের নাম ‘কাসেম।’ অর্থ, বণ্টনকারী, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন–

اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِيْ

“আল্লাহপাক দান করেন আর আমি তার বণ্টনকারী।”

এই নামের কারণে হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে বলা হতো আবুল কাসেম। অন্যছেলেদের নাম ছিলো তাহের/তাইয়েব (পবিত্র, সুন্দর)। আরেকজনের নাম ছিলো ইবরাহিম, অর্থ বুজুর্গি, মর্যাদাবান, সম্ভ্রান্ত। আহ্! কী সুন্দর নাম!

মেয়েদের একজনের নাম ছিলো, জয়নব-বেশি বেশি এস্তেগফারকারীনী, দ্বিতীয়জনের নাম রুকাইয়া, অর্থ, পতিপরায়ণা, তৃতীয়জন উম্মেকলসুম, অর্থ, সন্তান প্রতিপালনকারীনী আর চতুর্থজনের কথা আর কী বলবো? তাঁর উপমা শুধু তিনি নিজেই। হজরত ফাতেমা দোজখের আগুন থেকে মুক্ত। জান্নাতি নারীকুল সম্রাজ্ঞী।

মানুষের পরিবারের পরে গণ্ডিটাই বন্ধুমহল। দেখুন, আল্লাহপাক নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বন্ধুমহলকেও নির্বাচন করে দিয়েছিলেন (নবিদের পরে) বিশ্বের সেরা মানুষদের। যেমন হজরত আবুবকর সিদ্দিক [রদিয়াল্লাহু আনহু], হজরত ওমর ফারুক [রদিয়াল্লাহু আনহু], হজরত ওসমান গনি [রদিয়াল্লাহু আনহু], হজরত আলি মোর্তাজা [রদিয়াল্লাহু আনহু] এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবারা। যাঁদের সম্পর্কে নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন–

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُوْلٌ

"আমার সাহাবা সবাই ন্যায়পরায়ণ। ইনসাফগার।"

তিনি আরও বলেছেন–

اَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

"আমার সাহাবারা আকাশের তারার মতো, তাঁদের যাঁকেই অনুসরণ করবে, হেদায়াত পাবে (সুপথ পাবে)।"

এমন কোয়ালিটির মানুষদেরকে মহান আল্লাহপাক নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর একান্ত বন্ধু মহল হিসেবে নির্বাচন করে দিয়েছিলেন।

কোরআন নির্বাচন

প্রজ্ঞাময় আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয়বন্ধু হজরত মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্যে পবিত্র (আসমানি) কিতাবও মনোনীত করেছেন। কেমন সেই কিতাব বা বই? সেটি হচ্ছে 'পবিত্রকোরআন।' এর আগের যুগের নবিদের ওপর যেসব আসমানি কিতাব নেমেছে, সেগুলো ছিলো শুধু (লিখিতাকারে), আল্লাহর কিতাব (বই) বা সহিফা; কিন্তু মহানবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ওপর যে কিতাব নেমেছিলো, তা শুধুই একটি আসমানি কিতাব ছিলো না, সেটি ছিলো দয়াময় আল্লাহপাকের কুদরতি মুখ নিসৃত বাণী বা কথা, যাকে বলা হয় 'কালামুল্লাহশরিফ।' নবিকারিম

[সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, তোমরা এই কোরআনশরিফ থেকে বরকত গ্রহণ করো, কারণ, এটি সরাসরি আল্লাহপাকের বাণী বা কালামুল্লাহ। একটু খেয়াল করুন, 'আল্লাহ' হচ্ছেন রব্বুল আলামিন আর নবি হচ্ছেন রহমাতুল্লিল আলামিন। আর কোরআনকে বলা হয়েছে 'জিকরুল লিল আলামিন (আল্লাহপাকের নসিহত বা উপদেশ)' আর বায়তুল্লাহ হচ্ছে 'হুদাললিল আলামিন (গোটা বিশ্বের হেদায়েতের প্রাণকেন্দ্র)।'

আল্লাহু আকবার! আপনি আপনার প্রিয়রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে কী সম্মানই না দিয়েছেন?

দীন মনোনয়ন

আল্লাহপাক হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে যে দীন ইসলাম দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা ইন্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিক।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আগের যুগের নবিদের জন্যে যেসব দীন মনোনয়ন দেয়া হতো, তা ছিলো আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ের আর সেসব দীনের নামকরণও করা হতো কোনো ব্যক্তি বা গোত্র কেন্দ্রিক। যেমন হজরত ইসা [আলায়হিসসালাম]-এর সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁর দীন বা ধর্মকে বলা হয় ইসায়িধর্ম। আর কবিলায়ে ইয়াহুদা বা ইয়াহুদ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত করে রাখা হয়েছে ইয়াহুদি বা ইহুদিধর্মের নাম; কিন্তু হুজুরপাক [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] কর্তৃক আনিত ধর্মের নাম কোনো কিছু কেন্দ্রিকই নয়; বরং তা হচ্ছে শান্তি কেন্দ্রিক, যা সব দেশের, সব মানুষ কামনা করে। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক। দীনে ইসলাম বা ইসলাম ধর্ম। আল্লাহপাকের এটি সীমাহীন দয়া ও কৃপার ফসল। খুব ভালোবেসে, কৃপা-অনুগ্রহ করে তিনি আমাদেরকে এই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামধর্ম দান করেছেন। তাঁর ধারকবাহকের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুধু শ্রেষ্ঠত্যের কাহিনী। আমরা যদি আবার একটু পেছন ফিরে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্যে আবেদনকারী ছিলেন শ্রেষ্ঠ, যে বংশধারায় তিনি এসেছেন সেই ধারার প্রধান হজরত ইসমাইল [আলায়হিসসালাম]-ও সেরা। তাঁর আগমনের ঘোষক হজরত ইসা [আলায়হিসসালাম] সেরা, এছাড়া তাঁর দাদা সেরা, বাবা সেরা, তাঁর ভাষা সেরা, বংশ সেরা, বংশের শাখা সেরা, তাঁর জন্মস্থান সেরা। পবিত্রকোরআন সেরা কিতাব, সর্বোপরি তাঁকে আল্লাহপাক যে রূপ-সৌন্দর্য দান করেছেন, তাও একদম অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, অনুপম। সোবহানাল্লাহ! হজরত হাসসান বিন সাবিত [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর ভাষায়–

وَ اَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِيْ

[ওয়া আহসানা মিনকা লাম তারা কত্তু আইনী]

وَ اَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَآءُ

[ওয়া আজমালু মিনকা লাম তালিদিন নিসা-উ]

خُلِقْتَ مُبَرَّاً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ

[খুলিকতা মুবার্‌রাআন মিন কুল্লি আইবিন]

كَاَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَآءُ

[কাআন্নাকা কদ খুলিকতা কামা তাশা-উ]

চোখ দেখেনি রূপ যে এমন
তুমি পেলে যা
হয়নি ছেলে কোনো মায়ের
তুমি হলে যা।

সব দোষে মুক্ত হয়ে
জন্ম নিলে তুমি
যেমন ছিলো তোমার চাওয়া
তেমন হলে তুমি।

অন্যলেখকের ভাষায়, রাতের শপথ কালো জুলফির, দিনের শপথ তার চেহারা, গোটা পৃথিবীর প্রিয়পাত্র আপনি। আপনার প্রেমিক স্বয়ং আল্লাহতায়ালা, আল্লাহপাক আপনাকে যখন নিজে তৈরি করেন, তখন আপনি নিজে বলেছিলেন সোবহানাল্লাহ!

আল্লাহপাক তাঁর প্রিয়বন্ধুকে এমন সৌন্দর্য দিয়েছিলেন। অন্যএকজনের ভাষায়, পৃথিবীটা ঝিনুকতুল্য আর মোহাম্মদ মোস্তফা [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তার মোতি।

তিনি বিনে কীভাবে দুনিয়া অস্তিত্ব লাভ করতো? যদি আমেনা জননী উম্মতের দুঃখে দুঃখী না হতেন, সব সৃষ্টিজগৎ মিষ্টি ঘুমে ঘুমাতে পারতো না। সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

আল্লাহপাকের প্রিয়বন্ধু, যাঁকে তিনি শুধু ভালো ভালো এবং সেরা সবকিছু দান করেছিলেন। সেই রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর দরোজায় আমরা এখন হাজির। তাঁর পবিত্র আবাসভূমিতে হাজির। আল্লাহপাক তাঁকে বসবাসের জন্যে যে শহর দান করেছিলেন, তা ছিলো এই মদিনাতাইয়েবা। পবিত্র ও সেরা নগরী। সবকিছু বলে তো আর শেষ করা যাবে না। তবে শুধু এতোটুকু বলতে পারি–

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ

[বালাগাল উলা বিকামালিহী]

كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ

[কাশাফাদ দোজা বিজামালিহী]

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ

[হাসুনাত জামীউ খিস-ালিহী]

صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ

[সল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী]

গুণ বিচারে সবার সেরা
হেদায়াতের আলো
আঁধার যতো হয় উজালা
কাটে মনের কালো।

পূর্ণ তোমার চরিত্র গুণ
পূর্ণ দানে তুমি
দরুদ পড়ো নবির পরে
শান্তি পাবে তুমি।

হজরত জুফার আলি খানের ভাষায়–

دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں

[দিয়ারে ইয়াসরিব মেঁ ঘুমতা হোঁ নবী কী দেহলীয চুমতা হোঁ]

شراب عشق نبی کو پی کر مزے مزے سے میں جھومتا ہوں

[শরাবে ইশকে নবী কো পী কর মযে মযে সে ম্যাঁয় ঝুমতা হোঁ]

ইয়াসবিরের ওই অলি-গলি
বেড়াই আমি ঘুরে
উঠোনটাকে চুমুই আমি
সেথায় ঘুরে ঘুরে।

নবির প্রেমের শরাব আমি
পান করে যাই বেশ
ঘুমের তালে হালকা স্বপন
লাগছে আমার বেশ।

আল্লাহপাক আমাদেরকেও তার প্রিয়নবি [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর খাঁটি প্রেম দান করুন। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আমাদেরকে সুন্নত দিয়ে সুসজ্জিত করে দিন। তাহলে মালাকুলমউত হাজির হয়ে যেনো আমাদের বাইরের অঙ্গ সুন্নত দিয়ে ঢাকা এবং ভেতরের হৃদয় বিদীর্ণ করে তা নবিপ্রেমে পরিপূর্ণ পান।

হে মোহাম্মদ!
আমি কখনও মিথ্যা শপথ করি না

جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے
[জো ইয়াদে মোস্তফা সে দিল কো বেহলায়া নেহী করতে]
حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے
[হাকীকত মেঁ ওহ লুফতে যিন্দেগী পায়া নেহী করতে]
زباں پر شکوۂ رنج و الم لایا نہیں کرتے
যবাঁ পর শিকওয়ায়ে রঞ্জ ও আলাম লায়া নেহী করতে]
نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے
[নবী কে নাম লেওয়া গম সে ঘাবরায়া নেহী করতে]
یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے
[এহ দরবারে মোহাম্মদ হায় এহাঁ মিলতা হায় বিন মাঙ্গে]
ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے
[আরে নাদাঁ এহাঁ দামান কো ফ্যায়লায়া নেহী করতে]
یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا
[এহ দরবারে মোহাম্মদ হায় এহাঁ আপনোঁ কা কিয়া কেহনা]
یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے
[এহাঁ সে হাথ খালী গায়ের ভী জায়া নেহী করতে]
محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا
[মোহাম্মদ আরশ পর পঁহচে তো খোদ খালেক নে ফরমায়া]
یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے
[এহ আপনা ঘর হায় আপনে ঘর মেঁ শরমায়া নেহী করতে]
گنہگاروں کو ہم بخشے گیں تم سے وعدہ کرتے ہیں
[গুনাহগাঁরোঁ কো হাম বখশে গেঁ তুম সে ওয়াদাহ করতে হেঁ]
محمد! ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے
[মোহাম্মদ! হাম কভী ঝুটি কসম খায়া নেহী করতে]

মোহাম্মদের প্রেমে যেজন
ভাসায় নাতো মন
জীবনেরই আসল মজা
পাবে না সেজন।

মুখে যেনো না শোনা যায়
দুঃখ-বিয়োগ ব্যথা
মোহাম্মদি ভয় করে না
দেখে হাজার ব্যথা।

মোহাম্মদের দরবারে ভাই
চাওয়ার আগেই মিলে
খোদার কাছে চাইতে হবে
বিনয়মাখা দিলে।

আপন যারা তাদের কথা
বলবো কী আর ভাই
পরও কভু যায় ফেরত
এখান থেকে ভাই।

নবি যখন খোদার ডাকে
গেলেন আরশ পরে
বলেন খোদা, নিজের ঘরে
কেউ কখনো ডরে!

করবো ক্ষমা সব পাপীকে
করছি আমি পণ
ভয় পেয়ো না ভাঙ্গি না তো
আমি কোনো পণ।

একনজরে
হজ-ওমরা

ওমরার নিয়ম

এহরামের প্রস্তুতি
মাথার চুল পরিপাটি করবে, সিঁথি কাটবে, গোঁফ ছোটো করবে। বগল ও নাভির নিচের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করবে।

গোসল
এহরামের নিয়তে গোসল করবে। তা সম্ভব না হলে ওজু করবে।

এহরামের চাদর
পুরুষেরা একটি সাদা চাদর পরবে, আরেকটি শরীরে জড়িয়ে নেবে। জুতা খুলে হাওয়াই চপ্পল তথা স্যান্ডেল পায়ে দেবে। নারীদের এহরাম তাদের স্থানীয় পোশাক, যা দিয়ে শরিয়তের (পর্দার) চাহিদা পুরো হয়।

নফল নামাজ
মাথা ঢেকে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে।

পরামর্শ
উড়োজাহাজে যাওয়ার সময় নিয়ত এবং তালবিয়া ছাড়া বাকি সব কাজ বাড়িতেই সেরে নেবেন অথবা বিমানবন্দরে সেরে ফেলবেন আর প্লেন আকাশে উড্ডয়নকালে নিয়ত করে তালবিয়া পড়ে নেবেন।

নিয়ত
মাথা খুলে এভাবে নিয়ত করবে–হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ওমরার নিয়ত করছি, আপনি এই ওমরাকে আমার জন্যে সহজ বানিয়ে দিন এবং কবুল করে নিন।

তালবিয়া
নিয়ত করামাত্রই তিনবার–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

শব্দ করে বলবে।

দোয়া

এরপর দরুদশরিফ পড়ে দোয়া করবে—হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টি আর জান্নাত কামনা করছি। আর আপনার অসন্তুষ্টি এবং দোজখ থেকে মুক্তি চাচ্ছি। সেই সাথে ওইসব আবেদন আর প্রার্থনা করছি, যা এমন মুহূর্তে আপনার নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] আপনার কাছে কামনা করেছিলেন এবং শিখিয়ে গেছেন। তার সবকিছুই আমার তরফ থেকে কবুল করে নিন।

এহরামের বিধি-বিষেধ

এহরামের নিয়ত করার পর সুগন্ধি লাগানো, গা-পা ভালো করে কচলিয়ে কচলিয়ে গোসল করা, সুগন্ধিযুক্ত সাবান ব্যবহার করা, হাত-পায়ের নখ কাটা, স্বামী-স্ত্রীর মাঝ বিশেষ সম্পর্ক গড়া, চুমু দেয়া, ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ধরা, পরস্পর যৌনাত্তজক আলাপ করা, গালিগালজ করা, মুখমণ্ডলের সাথে কাপড় লাগানো (জড়িয়ে দেয়া), পুরুষের মাথা ঢাকা এসব কাজ (এহরাম অবস্থায়) নিষিদ্ধ, এগুলো বর্জন করা জরুরি।

াবাশরিফ প্রথম দেখা

রামশরিফে ঢুকার পর দোয়া পড়বে এবং এতেকাফের নিয়ত করবে, সেই থে কোনো (তুলনামূলক) নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়িয়ে ইচ্ছেমতো দোয়া করবে। া করা যায় আল্লাহপাক তা কবুল করে নেবেন।

য়াফের প্রস্তুতি

ষেরা তাদের চাদর ডান বগল থেকে বের করে বাঁ কাঁধের ওপর তুলে দেবে বং ডান কাঁধ খোলা রাখবে। ওজুসহ তাওয়াফ করা জরুরি।

তাওয়াফের নিয়ত

কাবাশরিফের সামনে হাজরে আসওয়াদের পাশে এভাবে দাঁড়াবে, যেনো সেটি ডান দিকে থাকে। হাত না উঠিয়েই তাওয়াফের নিয়ত করবে—"হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্যে ওমরার তাওয়াফ করছি, আপনি এটিকে আমার জন্যে সহজ করে দিন এবং কবুল করে নিন। এরপর কেবলা বজায় রেখেই ডান দিকে মোড় নিয়ে সোজা হাজরে আসওয়াদের সামনে এসে দাঁড়াবে, দু'হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তার তালু হাজরে আসওয়াদমুখী করে বলবে—

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

এরপর হাত ছেড়ে দেবে।

এস্তেলাম

এরপর এস্তেলাম করবে। এস্তেলাম বলা হয়, হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া। সরাসরি চুমু দিতে না পারলে উড়ন্ত চুমু দেবে এবং পড়বে—

তারপর দু'হাতে চুমু খাবে।

তাওয়াফ শুরু করবে
তারপর (এস্তেলামের পর) ডান দিকে মোড় নিয়ে তাওয়াফ শুরু করবে।

নির্দেশনা
হাজরে আসওয়াদ, রুকনে ইয়ামানি ও মুলতাজামে বেশিরভাগ সময় খোশবু লাগানো থাকে। তাই এহরাম অবস্থায় সেগুলোতে হাত লাগাবে না, ছোঁবে না। কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখবে। না হয় ক্ষতিপূরণ আরোপিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সতর্কতা
হাজরে আসওয়াদ চুমু দেয়া বা উড়ন্ত চুমু দেয়ার সময় ছাড়া কাবাশরিফের দিকে মুখ করা বা পিঠ করা জায়েজ নেই। সবসময় তা পাশে রাখতে হবে। এদিকে বিশেষভাবে যত্ন নেয়া এবং খেয়াল রাখা জরুরি।

রমল
বুক চেতিয়ে সিনা দুলিয়ে ছোটো ছোটো পায়ে একটু দ্রুতো গতিতে এগিয়ে যাবে এবং শুধু প্রথম তিন চক্কর এমন করবে, বাকিগুলো সাধারণ নিয়মে সম্পন্ন করবে।

এস্তেলাম
যদি সহজে সম্ভব হয়, তাহলে প্রত্যেক চক্করের শুরুতে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে। আর সম্ভব না হলে শুধু উড়ন্ত চুমুতেই কাজ সারবে। অর্থাৎ, হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত বাড়িয়ে সেদিকে উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দেবে, হাতে চুমু খাবে।

তাওয়াফ সমাপ্তি
পরপর সাতবার কাবাশরিফ প্রদক্ষিণ করার পর অষ্টমবার হাজরে আসওয়াদ চুমু সরাসরি বা ইশারায় দেয়ার মাধ্যমে তাওয়াফ শেষ করবে এবং দু'কাঁধ ঢেকে নেবে।

ওয়াজিবুত তাওয়াফ
তারপর হারামশরিফের যেখানেই সুযোগ পাওয়া যায় ওয়াজিবুত তাওয়াফ দু'রাকাত নামাজ আদায় করবে।

জমজম

এরপর পরিতৃপ্ত হয়ে জমজম পান করবে এবং প্রাণ খুলে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করবে।

সায়ি

সায়ি করার জন্যে ৯মবার (সরাসরি বা ইশারায়) হাজরে আসওয়াদ চুমু দেবে এবং সাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে। ওজু অবস্থায় সায়ি করা সুন্নত। সেই সাথে সায়ির নিয়ত করা জরুরি। নিয়ত করে বলবে–"হে আল্লাহ! আমি আপনাকে রাজি-খুশি করার উদ্দেশ্যে সাফা-মারোয়ার মাঝে সায়ি করছি এ কাজ আমার জন্যে সহজ করে দিন এবং কবুল করে নিন।" এরপর আল্লাহর প্রশংসা ও নবির ওপর দরুদ পাঠিয়ে বিশেষ মোনাজাত (দোয়া) করবে।

মারোয়ার দিকে রওয়ানা

সাফা থেকে ঘুরে মারোয়ার দিকে রওয়ানা করবে। সবুজ বাতির কাছে এলে পুরুষরা দৌড়াতে থাকবে। তবে মহিলারা স্বাভাবিক গতিতেই চলতে থাকবে এবং এই দোয়া করবে–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

মারোয়ায় পৌঁছে

মারোয়ায় পৌঁছার পর কেবলামুখী হয়ে দোয়া করবে, এতেই একচক্কর পূর্ণ হয়ে যাবে। সেখান থেকে সাফায় ফিরে এলে আরেক চক্কর হয়ে যাবে। এভাবে মারোয়ায় ফিরে এলে ৩য় চক্কর পূর্ণ হয়ে যাবে।

সায়ি সমাপ্তি

এভাবে সপ্তমবার মারোয়ায় পৌঁছার পর সাত চক্কর সম্পন্ন হয়ে যাবে। প্রতি চক্করে পুরুষেরা সবুজ খুঁটির (বাতির) মাঝে দৌড়াবে, তবে মহিলারা স্বাভাবিকভাবেই চলবে।

নফল শুকরানা

মাকরুহ সময় না হলে হারামশরিফে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করে নেবে।

হলক বা কসর

সায়ি শেষে পুরুষরা গোটা মাথার সব চুল ফেলে দেবে আর নারী শুধু এক আঙুল পরিমাণ চুল (চুলের মাথা) কেটে নেবে আর মনে করবে সে মাথার চুলের চার ভাগের একভাগ কেটে নিয়েছে।

ওমরার পূর্ণতা

হলক বা কসরের (চুল কাটার) পর ওমরা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এহরাম বাঁধার পর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। এরপর ভালোভাবে গোসল সেরে পোশাক পাল্টিয়ে নেবে এবং বাসা-বাড়িতে যেভাবে থাকতো সেভাবে স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারবে। মনপ্রাণ থেকে মহান আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করবে। তিনি সঠিকভাবে ওমরা পালনের সুযোগ দিয়েছেন বলে।

একনজরে হজের পাঁচদিন

হজের প্রথম দিন

৮ জিলহজ হজের প্রথম দিন। এদিনের কাজ হলো, ফজর নামাজের পর মক্কামোকাররমা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা এবং মিনায় জোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং পরের দিনে (৯ জিলহজ) ফজর নামাজ আদায় করা।

হজের ২য় দিন

হজের ২য় দিন হলো ৯ জিলহজ। এ দিনে সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে। আরাফার ময়দানের বিশেষ আমল সম্পর্কে 'তাফসিরে দুররে মানসুর'-এ ইমাম বায়হাকির সূত্রে একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, নবিকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, যে মুসলমান আরাফার দিন বেলা গড়ে যাওয়ার পর আরাফার ময়দানে কেবলামুখী হয়ে

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

একশোবার। সুরা এখলাস একশোবার আর

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ

حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ.

একশোবার পড়বে। আল্লাহপাক (তার দিকে ইঙ্গিত করে) ফেরেশতাদের বলবেন, এই বান্দাকে কী বদলা দেয়া হবে, যে আমার তাসবি-তাহলিল, তাকবির-তাজিম-তাহমিদ-সানা বর্ণনা করেছে এবং আমার রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ওপর দরুদ পাঠিয়েছে? তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তার সুপারিশ গ্রহণ করেছি। সে যদি আরাফাবাসীর (স্থানীয়দের) জন্যে সুপারিশ করতো, তাহলে আমি তাও কবুল করে নিতাম। এছাড়া আরাফার ময়দানে জোহর ও আসর নামাজ একসাথে জোহরের (শেষ সময়ে) একসাথে (পরপর) আদায় করার এবং আরাফার কাজ সম্পন্ন করে সূর্যাস্তের পর মোজদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। মাগরিব নামাজ মোজদালিফার পথে আদায় না করে সেখানে গিয়ে তা এশার নামাজের সাথে এশার সময় আদায় করবে। এরপর মোজদালিফাতেই রাত কাটাবে।

হজের ৩য় দিন

হজের ৩য় দিন হচ্ছে ১০ জিলহজ। এ দিনে অনেক কাজ করতে হয় এবং সেদিন হজের কাজগুলো থেকে চারটি ওয়াজিব ও একটি ফরজ আদায় করতে হয়। যেমন ১. মোজদালিফায় ফজর নামাজ আদায়ের পর সূর্যোদয়ের আগে

আগেই উকুফ করে আবার সূর্যোদয়ের আগেই মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করতে হয়।

২. মিনায় এসে সর্বপ্রথম জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর ছুড়তে হয় আর ১০ জিলহজ সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য ঢলে যাওয়ার আগ নাগাদ জামারায় আকাবায় কঙ্কর ছুড়বে উত্তম সময়। তবে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে পরের রাত সোবহেসাদেক পর্যন্তও জায়েজ আছে।

৩. তবে তামাত্তু বা কেরান হজ সম্পাদনকারী কঙ্কর ছোড়ার পরই কোরবানিও করতে হবে।

৪. তামাত্তু বা কেরান হজ পালনকারী না হলে তাকে জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর ছোড়ার পর মাথার চুল ফেলে দিতে হবে। আর যদি কেরান অথবা তামাত্তু হজ পালনকারী হয়, তাহলে কোরবানির পর তাকে মাথার চুল ফেলতে হবে।

৫. হজের গুরুত্বপূর্ণ রোকন এবং ফরজ হলো তাওয়াফেজেয়ারত। যদি ১০ জিলহজ তারিখে সম্ভব হয়, তাহলে তাওয়াফেজেয়ারত সেরে ফেলতে হবে। আর যদি সেদিন সম্ভব না হয়, তাহলে এগারো এমনকি বারো জিলহজ পর্যন্ত দেরি করার সুযোগ আছে তাওয়াফেজেয়ারত সম্পন্ন করার। তবে ১২ জিলহজ সূর্যাস্তের আগেই সেরে ফেলা ওয়াজিব এবং ১০ জিলহজ অবস্থানের পর দু'রাত মিনায় কাটানো সুন্নত।

হজের ৪র্থ দিন

হজের ৪র্থ দিন হচ্ছে জিলহজ মাসের এগারো তারিখ। এ দিনের দায়িত্ব বা করণীয় শুধু একটাই আর সেটি হচ্ছে, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর ৩টি জামরাতেই কঙ্কর ছুড়তে হবে। তবে সেদিন সূর্য ঢলে যাওয়ার আগেই কঙ্কর ছোড়া জায়েজ নেই; বরং বেলা পড়ে যাওয়ার পর সূর্যাস্তের আগেই তা সম্পন্ন করা জরুরি। কারণ, সূর্যাস্তের পর থেকে মাকরুহ সময় শুরু হয়ে যায়। তবে যদি প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে রমি জেমার করা সম্ভব না হয়, তাহলে সূর্যাস্তের পরও (পরদিন) সোবহেসাদিক পর্যন্ত কঙ্কর ছোড়া জায়েজ আছে এবং তা মাকরুহও হবে না। আর যদি ২য় দিন সোবহেসাদিক পর্যন্ত রমি জেমার (কঙ্কর ছোড়া) না করে থাকে, তাহলে এজন্যে তাকে দম (ক্ষতিপূরণ) দিতে হবে। ওয়াজিব হিসেবে এবং সে রাতও মিনাতে কাটাবে।

হজের ৫ম দিন

হজের ৫ম দিন হলো ১২ জিলহজ। এগারো তারিখের মতো ১২ তারিখেও তিনটি জামরাতেই কঙ্কর মারতে হবে। তবে এদিন সূর্যাস্তের আগেই তা শেষ করতে হবে। তবে যদি প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে দিনে সম্পন্ন করতে না পারে, তাহলে রাতেও তা করার সুযোগ রয়েছে। এই বারো তারিখ কঙ্কর ছোড়ায় যাত্রা

করার এখতিয়ার রয়েছে। তবে যাত্রা করার আগেই যদি সূর্য ডুবে যায়, তাহলে অন্যহিসাব। এ অবস্থায় তেরো তারিখও মিনাতেই রয়ে যাবে। তবে যদি রাতের বেলায়ই মিনা থেকে রওয়ানা করতে চায়, তাহলে সেটিও জায়েজ আছে। তবে তা মাকরুহ হবে। আর যদি ১৩ তারিখের সোবহেসাদিক হয়ে যায়, তাহলে এ অবস্থায় তেরো তারিখে পাথর ছোড়া ছাড়া রওয়ানা করা জায়েজ নেই। এরপরও যদি রওয়ানা করেই বসে, তাহলে তার ওপর দম (ক্ষতিপূরণ) দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর তেরো তারিখেও বেলা গড়ার পরই কঙ্কর ছোড়া জরুরি এবং সূর্যাস্তের আগেই তা সম্পন্ন করা ওয়াজিব। এ দিন সূর্যাস্তের পর আর তা জায়েজ নেই। সূর্যাস্তের সাথে সাথে পাথর ছোড়ার সময় শেষ হয়ে যায়। এ অবস্থায় দম দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।
এখন মিনায় (হজসংক্রান্ত) সব কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর হাজিদের ওপর হজের আর কোনো কাজ এবং দায়িত্বই অবশিষ্ট থাকে না। এ অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসার সময় বহিরাগতদের জন্যে তাওয়াফেবিদা পালন করা ওয়াজিব। মক্কাবাসীদের জন্যে ওয়াজিব নয়।

হজ এবং ওমরার কাজগুলোর বিস্তারিত নকশা বা ছক

ওমরা এবং অন্যতিন প্রকার হজের করণীয় তথা ফরজ ওয়াজিব ও সুন্নতগুলো একটি ছকাকারে তুলে ধরা হলো। যাতে হাজি সাহেবরা একনজরে হজের করণীয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারে।

হজ্জেএফরাদ ও কেরানের আমল

	হজ্জেএফরাদের			হজ্জেকেরান	
১	এহরাম	শর্ত	১	এহরাম (হজ-ওমরা দু'টির)	শর্ত
২	রমলের সাথে তাওয়াফে কুদুম	সুন্নত	২	ওমরার তাওয়াফ	রুকন
৩	সাফা-মারওয়ার সায়ি	ওয়াজিব	৩	রমলের সাথে ওমরার তাওয়াফ	সুন্নত
৪	আরাফায় অবস্থান	রুকন	৪	ওমরার সায়ি	ওয়াজিব
৫	মোজদালিফায় অবস্থান	ওয়াজিব	৫	রমলের সাথে তাওয়াফে কুদুম	সুন্নত
৬	কোরবানির দিন জামারায়েউকবাতে	ওয়াজিব	৬	হজের সায়ি	ওয়াজিব

	পাথর ছোড়া				
৭	মাথা মুণ্ডানো	ওয়াজিব	৭	আরাফায় অবস্থান	রুকন
৮	তাওয়াফেজেয়ারত	রুকন	৮	মোজদালিফায় অবস্থান	ওয়াজিব
৯	১১-১২ তারিখের পাথর ছোড়া	ওয়াজিব	৯	কোরবানির দিন জামারায়ে উকবাতে পাথর ছোড়া	ওয়াজিব
১০	মিনাতে রাত কাটানো	সুন্নত	১০	কোরবানি	ওয়াজিব
১১	বিদায়ী তাওয়াফ	ওয়াজিব	১১	মাথা মুণ্ডানো	ওয়াজিব
			১২	জামারায়ে উকবায় পাথর ছোড়া, কোরবানি ও মাথা মুণ্ডানো	ওয়াজিব
			১৩	তাওয়াফে জেয়ারত	রুকন
			১৪	১১-১২ তারিখের পাথর ছোড়া	
			১৫	মিনাতে রাত কাটানো	সুন্নত
			১৬	তাওয়াফেবিদা	ওয়াজিব

হজ্জেতামাত্তু ও ওমরার আমল

	ওমরার আমল			হজ্জেতামাত্তুর আমল	
১	এহরাম	শর্ত	১	এহরাম (ওমরা)	শর্ত
২	ওমরার তাওয়াফ	সুন্নত	২	ওমরার তাওয়াফ	রুকন
৩	সাফা-মারওয়ার সায়ি	ওয়াজিব	৩	রমলের সাথে ওমরার তাওয়াফ	সুন্নত
৪	মাথা মুণ্ডানো	রুকন	৪	ওমরার সায়ি	ওয়াজিব
৫	তাওয়াফেবিদা	ওয়াজিব -ও নয়, সুন্নতও নয়	৫	ওমরার রুকন পালনের পর মাথা মুণ্ডানো	ওয়াজিব
			৬	জিলহজের ৮ তারিখ হজের এহরাম বাঁধা	শর্ত
			৭	আরাফায় অবস্থান	রুকন
			৮	মোজদালিফায় অবস্থান	ওয়াজিব
			৯	কোরবানির দিন জামারায়ে উকবাতে পাথর ছোড়া	ওয়াজিব
			১০	কোরবানি	ওয়াজিব
			১১	মাথা মুণ্ডানো	ওয়াজিব
			১২	জামারায়ে উকবায় পাথর ছোড়া, কোরবানি ও মাথা মুণ্ডানো	ওয়াজিব
			১৩	তাওয়াফে	রুকন

				জেয়ারত	
			১৪	১১-১২ তারিখের পথর ছোড়া	ওয়াজিব
			১৫	মিনাতে রাত কাটানো	সুন্নত
			১৬	বিদায়ী তাওয়াফ	ওয়াজিব

ক বি তা

আমি এর যোগ্য ছিলাম না

شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا
[শুকর হায় তেরা খোদায়া ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا
[তুনে আপনে ঘর বুলায়া ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[আপনা দীওয়ানাহ বানায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

گرد کعبہ کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[গেরদে কা'বাহ কে ফেরায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کردیا
[মুদ্দতোঁ কী পিয়াস কো সায়রাব তুনে করদিয়া]

جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[জামে যমযম কা পিলায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

ڈال دی ٹھنڈک مرے سینے میں تو ساقیا
[ডাল দী ঢান্ডাক মেরে সীনে মেঁ তু সাকিয়া]

اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[আপনে সীনে সে লাগায়, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

بھا گیا میری زبان کو ذکر الااللہ کا
[ভা গিয়া মেরী যবান কো যিকরু ইল্লাল্লাহ কা]

یہ سبق کس نے پڑ ھایا میں تو اس قابل نہ تھا
[এহ সবক কিস নে পড় হায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

خاص اپنے درکا رکھا تو نے اے مولی مجھے
[খাস আপনে দরকা রাক্‌খা তুনে আয় মাওলা মুঝে]

یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[য়োঁ নেহী দর দর ফেরায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا
[মেরী কোতাহী কেহ তেরী ইয়াদ সে গাফেল রাহা]
پر نہیں تونے بھلایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[পর নেহী তুনে ভুলায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]
میں کہ تھا بے راہ تونے دستگیری آپ کی
[ম্যায় কেহ থা বে রাহ তুনে দস্তগীরী আপ কী]
توہی مجھ کو رہ پہ لایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[তুহী মুঝ কো রাহ পে লায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]
عہد جو روز ازل تجھ سے کیا تھا یاد ہے
[আহদ জো রুযে আযাল তুঝ সে কিয়া থা ইয়াদ হায়]
عہد وہ کس نے نبھایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[আহদ ওহ কিস নে নিভায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]
تیری رحمت، تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب
[তেরী রহমত, তেরী শফকাত সে হোয়া মুঝ কো নসীব]
گنبد خضراء کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا
[গাম্বাদে খাযরা কা সায়াহ মেঁ ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]
میں نے جو دیکھا سو دیکھا جلوہ گاہ قدس میں
[ম্যাঁয় নে জো দেখা সো দেখা জালওয়াহ গাহে কুদস মেঁ]
میں نے جو پایا سو پایا، میں تو اس قابل نہ تھا
[ম্যাঁয়নে জো পায়া সো পায়া, ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]
بارگاہ سید الکونین میں آکر نفیس
[বার গাহে সাইয়েদুল কাওনাইন মেঁ আকার নফীস]
سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا
[সোচতা হোঁ ক্যয়সে আয়া ম্যায় তো ইস কাবেল নাহ থা]

করছি শোকর তোমার খোদা
যোগ্য জানি নই
ডাকলে আমায় তোমার ঘরে
যোগ্য যেনো হই।

করলে আমার তোমার পাগল
যোগ্য জানি নই
তোমার ঘরে ঘুরে খানিক
যোগ্য যোগ্য হই।

তৃষ্ণা মনের মিটিয়ে দিলে
যোগ্য জানি নই
জমজমের ওই অমৃত পিয়ে
যোগ্য যেনো হই।

শান্তি দিলে মনে আমার
যোগ্য জানি নই
বুকের সাথে বুক মেশালে
যোগ্য যেনো হই।

থাকবে মনে তোমার জিকির
যোগ্য জানি নই
সত্য সবক শিখিয়ে দিলে
যোগ্য যেনো হই।

ছাড়লে নাতো হাজার দ্বারে
যোগ্য জানি নই
রাখলে আমায় তোমার দ্বারেই
যোগ্য যেনো হই।

তোমায় সদা রাখবো মনে
যোগ্য জানি নই
তোমার কথাই গাঁথলে মনে
যোগ্য যেনো হই।

ধরলে তুমি হাতটি আমার
যোগ্য জানি নই
আনলে আমায় সরল পথে
যোগ্য যেনো হই।

করবো পূরণ সব ওয়াদা
যোগ্য জানি নই

করলে পূরণ সেই ওয়াদা
যোগ্য যেনো হই।

দিলে আমায় তোমার দয়া
যোগ্য জানি নই
রাখলে আমায় সবুজ ছায়ে
যোগ্য যেনো হই।

যা দেখেছি বেশ দেখেছি
যোগ্য জানি নই
যা পেয়েছি বেশ পেয়েছি
যোগ্য যেনো হই।

বিশ্বনবির দ্বারে এখন
যোগ্য জানি নই
ভাবছি সবি তোমার দয়া
যোগ্য যেনো হই।

নাতে রসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]

হাকিমুলইসলাম কারি মোহাম্মদ তৈয়্যব

نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو
[নবীয়ে আকরাম শফীয়ে আ'জম দুখে দিলোঁ কা পয়গাম লে লো[

تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو
[তামাম দুনইয়া কে হাম সাতায়ে খাড়ে হোয়ে হেঁ সালাম লে লো]

شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر روپوش ہے کنارا
[শিকাস্তাহ কাশতী হায় তেয ধারা নজর রুপোশ হায় কিনারা]

نہیں کوئی نا خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو
[নেহী কোয়ী না খোদা হামারা খবর তো আলী মাকাম লে লো]

عجیب مشکل میں کارواں ہے نہ کوئی جاہ کوئی پاسباں ہے
[আজীব মুশকিল মেঁ কারওয়াঁ হায় নাহ কোয়ী জাহ কোয়ী পাসে বাঁ হায়]

بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن اٹھو ذرا انتقام لے لو
[বশাকলে রহবর ছুপে হেঁ রাহযান উঠো যরা এনতেকাম লে লো]

قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمیں بھی فلک بھی دشمن
[কদম কদম পেহ হায় খওফে রাহযান যমী ভী ফলক ভী দুশমন]

زمانہ ہم سے ہوا ہے بد ظن تمہیں محبت سے کام لے لو
[যমানাহ হাম সে হোয়া হায় বদযন তুমহী মোহাব্বত সে কাম লে লো]

کبھی تقاضا وفاکا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے
[কভী তাকাযা ওফা কা হাম সে কভী মজাক জাফা হায় হাম সে]

تمام دنیا خفا ہے ہم سے خبر تو خیر الانام لے لو
[তামাম দুনইয়া খফা হায় হাম সে খবর তু খাইরুল আনাম লে লো]

یہ کیسی منزل پہ آگئے ہیں نہ کوئی اپنانہ ہم کسی سے
[এহ ক্যায়সী মানযিল পেহ আ-গায়ে হেঁ নাহ কোয়ী আপনা নাহ হাম কেসী সে]

تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو
[তুম আপনে দামান মেঁ আজ আকা তামাম আপনে গোলাম লে লো]

یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جہ کے اک دن

[এহ দিল মেঁ আরমাঁ হায় আপনে তাইয়্যিব মাযারে আকদাস পেহ্ জা কে একদিন]

سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو

[সুনাউঁ উনকো ম্যাঁয় হাল দিল কা কাহোঁ ম্যাঁয় উন সে সালাম লে লো]

দয়ার নবি মহান নবি
শুনো দুখের কথা
তোমায় ছাড়া বলবো কাকে
মনের যতো ব্যথা।

এ দুনিয়ার সবি ছেড়ে
দাঁড়িয়ে তোমার দ্বারে
বলছি সালাম ওগো নবি
আমি তোমার দ্বারে।

নৌকা আমার ভাঙা আবার
সামনে বিশাল ঢেউ
তোমার নুরের দিশা ছাড়া
কূল পাবে না কেউ।

তুমি যদি না হও আমার
কেউ হবে না জানি
তোমায় ছাড়া আল্লাহকে
পাবো না তাও মানি।

কষ্টে বিশাল আজ পড়েছি
করবে কে যে পাড়
ঢেউ কাটিয়ে কে যে তরী
নেবে আমার পাড়।

পথিক সেজে কতো ডাকাত
লুকিয়ে পথের মাঝে
কেড়ে নিয়ে আমার সহায়
ফেলবে পথের মাঝে।

পদে পদে এ পথেতে
ভয় যে লুটেরাদের
আকাশ-মাটি শত্রু সবাই

রুখবো আমি কাদের!

এ জমানা আমার তরে
ভাবছে কিছু ভুল
প্রেমের পথেই কাটবে আমার
আছে যতো ভুল।

কেউ বা বাসে ভালো আবার
কেউ বা হাসে হাসি
কেউ বুঝে না তোমায় আমি
সত্যি ভালোবাসি।

এ দুনিয়া থাকুক বিমুখ
তোমার কাছেই বলি
এ জীবনে আমি সদা
তোমার পথেই চলি।

কোন বিপথে এলাম এবার
কেউ চেনে না মোরে
মনটা আমার এতিমসম
এদিক ওদিক ঘুরে।

দয়ার নবি আমায় তুমি
নাও না গোলাম করে
এ অভাগার আঁচলটাকে
দাও না তুমি ভরে।

রওজাপাকে যাবো আমি
এটাই আমার চাওয়া
সত্যি হলে এ চাওয়াটি
সত্যি হবে পাওয়া।

বলবো আমার মনের কথা
উজার করে মন
সালাম দিয়ে ধন্য হবো
শান্তি পাবে মন।

শেষ

জুলফিকার রচনাবলি ১-৩৫

১: সংসার সুখের হয় দু'জনের গুণে/কারাগার নয় শান্তিময় পরিবার
২: যৌবনের মৌবনে
৩: নারী ঘরের রানী
৪: দুনিয়ায় জান্নাতি ঘর সাজাবেন কী করে/মুসলিম নারীদের কীর্তিগাঁথা
৫: নামাজ কবুলের অজানা রহস্য
৬: আমল করি জীবন গড়ি
৭: আদব শেখার পাঠশালা
৮: একটু পরেই কেয়ামত/ওপারের ডাক এসেছে
৯: রমজানুলমোবারক
১০: কোন নামে ডাকি তাঁরে
১১: মনোরোগের চিকিৎসা
১২: সুফিতত্ত্ব
১৩: প্রেমদরিয়ায় ডুব দিয়ে যাই
১৪: ওলি হওয়ার সহজ উপায়/পির-মুরিদির প্রিয়কথা
১৫: প্রিয়নবিজির প্রিয়দোয়া/দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ/মোনাজাতে
১৬: মানবতার নবি
১৭: আল্লাহর প্রিয় হওয়ার ১০ উপায়
১৮: আমার ঘর আমার বেহেশত
১৯: আত্মার খোরাক
২০: ধ্বংসাত্মক আত্মিক রোগের প্রতিকার
২১: ক্ষমা যদি পেতে চাও
২২: তাঁর করুণার নেই সীমানা
২৩: ভ্রমণকাহিনী-১: লাহোর থেকে বোখারা সমরকন্দ
২৪: হজ সফরনামা: কাবার পথে
২৫: আশ্চর্য কোরআন
২৬: কোরআনে কী লুকিয়ে আছে?
২৭: বিস্ময়কর হাদিস
২৮: ইমান জাগানিয়া গল্প: হিরে মোতি পান্না-১
২৯: ইমান জাগানিয়া গল্প: হিরে মোতি পান্না-২
৩০: ইমান জাগানিয়া গল্প: হিরে মোতি পান্না-৩
৩১: ইমান জাগানিয়া গল্প: হিরে মোতি পান্না-৪
৩২: ইমান জাগানিয়া গল্প: হিরে মোতি পান্না-৫
৩৩: ইমান জাগানিয়া গল্প: হিরে মোতি পান্না-৬
৩৪: ইমান জাগানিয়া গল্প: হিরে মোতি পান্না-৭
৩৫: ইমান জাগানিয়া গল্প: হিরে মোতি পান্না-৮

আরো আসবে-ইনশাআল্লাহ!

KABAR PATHE
By : Maulana Zulfikar Ahmad Naqshabandi
Price : 330.00
US $: 30.00
mahfilprokashon@gmail.com
cover design :: creativity

মাহফিল
লেখক সমাবেশ পাঠক সমাবেশ

ISBN 978-984-90094-5-0
978-984-90094-5-0

৩৩০ টাকা

ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার-এর প্রকাশনা উদ্যোগ

www.mahfilprakashon.com